ত্রয়ী

বাল্মীকি ও কালিদাস
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

৯৮।৪ রসা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৫৩
মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর—শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সেন
সবিতা প্রেস্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই—

বাঙলা-সাহিত্যের নবযুগ
বাঙলা-সাহিত্যের একদিক
সাহিত্যের স্বরূপ
উপমা কালিদাসস্য
ভারতীয় সাধনার ঐক্য
বিদ্রোহিণী (উপন্যাস)
এপারে-ওপারে (কবিতা)
সীতা (কবিতা)
রাজকন্যার ঝাঁপি (সাঙ্কেতিক নাটক)

নিবেদন

পালি 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' বইখানির ভিতরে ভারি সুন্দর ছোট একটি উপাখ্যানে দেখিতে পাই, মানুষের মৃত্যুর পরে যে আবার পুনর্জন্ম হয় সে সম্বন্ধে রাজা মিলিন্দ ভদন্ত নাগসেনকে প্রশ্ন করিয়াছেন, 'যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে সে কি যে মরিয়া যায় সে, না অন্য?' নাগসেন উত্তর করিলেন,—'একেবারে সে-ই নয়, আবার অন্যও নয়।' এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের ব্যাখ্যায় তিনি আরও অনেক উপমা দিয়াছেন। যেমন, আমরা একটি আম মাটিতে পুঁতি, তাহা হইতে নূতন গাছ হয়, সেই গাছ হইতে কালে আবার নূতন আম হয়। এই আমগুলি যে আমটি বপন করা হইয়াছিল ঠিক সেই আমই নয়, আবার একেবারে সম্পূর্ণ পৃথকও নয়, এই উভয়ের ভিতরে একটা আশ্চর্য যোগ আছে। ছ'মাসের শিশু কন্যা যখন আঠার বছরের যুবতী হইয়া ওঠে তখন তাহারা দুইজনে সম্পূর্ণ একও নয়, সম্পূর্ণ পৃথকও নয়।

মানুষের সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও দেখিতে পাই এই একই সত্য। অতীত যে একেবারে নিঃশেষে চলিয়া যায় তাহা নয়, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আবার আছে তাহার পুনর্জন্ম বর্তমানের রূপে। বর্তমান অতীতের সহিত একেবারে একও নয়, আবার অতীত হইতে সে সম্পূর্ণ পৃথকও নয়; একেরই কর্মানুযায়ী রূপান্তরিত পুনর্জন্ম হইতেছে অপর। ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টি ও কবি-প্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়া এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করিতেই গ্রন্থখানি

লিখিত। আশা করি এই আলোচনার ভিতর দিয়া বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের কতগুলি মূল-ধারারও সন্ধান পাওয়া যাইবে, আবার বাল্মীকি, কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভাকেও পূর্ববর্তিগণের সহিত তুলনায় স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার সুবিধা হইবে।

গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রাচীন যুগের কবি বাল্মীকির সহিত তাঁহার যোগ দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই যোগের সন্ধান না পাইলে কালিদাসের কবি-প্রতিভাকে কখনও সম্পূর্ণ বোঝা হয় না।

আবার ভারতের বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট্ কবি-প্রতিভাকেও ভাল করিয়া বোঝা হয় না যদি সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত—বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগকে আমরা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে না পারি। গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে সেই যোগটিকেই স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এক কবির সহিত অন্য কবির যোগের প্রকার এবং পরিমাণ বিচার করিতে গিয়া বহুস্থানেই উভয় কবির কাব্য পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিতে হইয়াছে, এবং এ-জন্য উভয় কবিরই কাব্যাংশ বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। আশা করি উদ্ধৃতির এই ‘বহুলতা’ ‘বাহুল্য’ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

গ্রন্থের পূর্বভাগটি ‘মাসিক বসুমতী’র কয়েকটি ক্রমিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্র-

নাথ মিত্র, এম্, এ, শ্রীযুত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্, এ, শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন, এম্, এ, শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, এম্, এ, শ্রীযুত জনার্দন চক্রবর্ত্তী, এম্, এ, কবিশেখর শ্রীযুত কালিদাস রায়, এবং অধ্যাপক শ্রীযুত বিশ্বপতি চৌধুরী, এম্, এ, মহাশয়গণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া ও তাঁহাদের মতামত ও উপদেশ দান করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন, ইঁহাদের সকলের নিকটেই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সবিতা-প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত দিগিন্দ্রলাল সরকার, এম্, এ, বি, এল্, মহাশয়ের অকৃত্রিম প্রীতি ও উৎসাহ ব্যতীত গ্রন্থখানি এই সময়ে এতশীঘ্র প্রকাশিত হইতে পারিত না, এ-জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। মুদ্রণ-পরীক্ষাকার্যে শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্, এ-র নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। ইতি—

বিনীত
গ্রন্থকার

বাল্মীকি ও কালিদাস

যে যুগে রামায়ণ মহাভারতের মত কাব্য রচিত হইত সে যুগের কাব্যও যেমন ছিল বিপুলায়তন, সে যুগের কবিগণও ছিলেন তেমনই বিপুলায়তন। একটি দানাকে কেন্দ্র করিয়া যেমন স্ফটিকের সকল দানা একত্রে বাঁধিয়া উঠে, অথবা একটি জীবকোশকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য কোশের সমবায়ে যেমন একটি জীবদেহ গড়িয়া ওঠে, সে-যুগে তেমনই একটি বিশেষ প্রতিভাকে কেন্দ্র করিয়া সে যুগের ছোট বড় সকল প্রতিভা একত্রে দানা বাঁধিয়া উঠিত। বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ বা ব্যাস-রচিত মহাভারত পাঠ করিলে মনে হয়, কয়েক দিনে বা কয়েক বৎসরে কোনও বিশেষ কবি এই বিপুলায়তন কাব্যগুলি রচিত করেন নাই; তাহারা বহন করিতেছে একটি বিপুল যুগের জীবন-ইতিহাস,—তাহারা রচিতও হইয়াছে একটি বৃহৎ যুগ ব্যাপিয়া। নলের পূর্ত-প্রতিভাকে কেন্দ্র করিয়া বিপুল বানরবাহিনীর কর্মতৎপরতা যেমন দক্ষিণ সাগরের উপরে বিরাট্ সেতুবন্ধ নির্মাণে সক্ষম হইয়াছিল, তেমনি করিয়াই বাল্মীকি এবং ব্যাসের প্রতিভাকে কেন্দ্র করিয়া সে-যুগের অসংখ্য কবির ছোট বড় বহু সাহিত্য-সাধনার সমবায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে রামায়ণ ও মহাভারতের কাব্য-পরিধি। এইরূপ ছোট বড় বহু কবিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই বিপুলায়তন রামায়ণ ও মহাভারতের কবিরাও বিপুলায়তন।

যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন পর্যন্তও মানুষের সমাজ-বিবর্তন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদগ্রতাকে প্রসব করে নাই; সমাজ ব্যবস্থায় তখন

পর্যন্ত চলিতেছিল যৌথ-কারবারের লেন-দেন। কাব্যের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই সেই যৌথ-ব্যবস্থা। বড় বড় মহাজনের বিপুলায়তন বাণিজ্য-পোতের সহিত নিজেদের ভরা বাঁধিয়া দিয়া ছোট ছোট মহাজনেরা নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীতে ভাসিয়া পড়িতেন; এবং তাহা করিয়াছেন বলিয়াই এখন পর্যন্ত তাঁহাদের ভরা ডুবি হয় নাই; হাজার হাজার বৎসরের ঝড়-ঝঞ্ঝাকে অতিক্রম করিয়াও রামায়ণ মহাভারতের ভিতর দিয়া সে ভরা আসিয়া আমাদের বিংশ শতাব্দীর ঘাটে ভিড়িয়াছে।

কালিদাস এবং বাল্মীকির ভিতরকার যথার্থ সম্বন্ধ নির্ধারণ করিতে হইলে কবিগুরু বাল্মীকির কবি-পুরুষটিকে এমনি ভাবে বিশ্লেষ করিয়া দেখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ, একান্ত সংশয়াতীত না হইলেও কালিদাস যেমন করিয়া ঐতিহাসিক পুরুষ, বাল্মীকি আমাদের নিকটে তেমনতর ঐতিহাসিক নন। লৌকিক এবং অলৌকিক বহুবিধ কাহিনী এবং কিংবদন্তীর কুজ্ঝটিকার অন্তরাল হইতে বাল্মীকির যথার্থ কবি-সত্তাটিকে আজ আর খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। সুতরাং প্রথমেই সংশয় আসে, কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ নির্ধারণ করিতে বসিয়াছি। আমরা তাই যখনই কবি বাল্মীকির কথা বলি তখন বাল্মীকির কবি-সত্তা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা কি বুঝি সে প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাল্মীকি আমাদের নিকটে কোন বিশেষ ব্যক্তি-পুরুষ নহেন, তিনি রামায়ণিক যুগের কবি-প্রতিভার প্রতিনিধিস্বরূপ।

রামায়ণ কাব্যখানিকে আজ আমরা যেরূপে পাইতেছি এইরূপে যে ইহা বাল্মীকি নামক কোনও একজন ঐতিহাসিক কবির লিখিত

নয় এ সংশয়ের যৌক্তিকতা গ্রন্থের ভিতরেই এখানে-সেখানে নিহিত আছে। প্রারম্ভেই দেখি, বাল্মীকি এই কাব্যাংশ লিখিত হইবার কালে ব্রহ্মা-নারদাদির সমশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার ভিতরকার অলৌকিক উপাদানের কথা বাদ দিলেও দেখিতে পাই, বাল্মীকি মুনির কবিত্বলাভের ইতিহাস তিনি নিজেই স্বহস্তে একটি তৃতীয় পুরুষের ন্যায় অমন ফলাও করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এ-কথা মন খুব সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে চাহে না। 'উত্তর-কাণ্ডে'র সব না হইলেও অনেকাংশ যে উত্তরকালের যোজনা এ-কথার আভাস হয়ত এই কাণ্ডটির নামের ভিতরেই নিহিত আছে। এরূপ সংশয়ের স্থল বহু রহিয়াছে। কিন্তু আমরা কোন ঐতিহাসিক তর্কের ভিতরে বর্তমান আলোচনায় প্রবেশ করিতে চাহি না। মোটের উপরে আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য আদি-কবি বাল্মীকিকে আদি কবি-সমাজের মুখপাত্র বা প্রতিনিধিরূপেই গ্রহণ করিব, আমাদের নিকটে আদি কবি-সমাজের যৌথরূপের অভিব্যক্তিই আদি-কবি বাল্মীকি।

কিন্তু এ-সত্ত্বেও একটা মুস্কিল থাকিয়াই যায়। বাল্মীকির বিরাট্ পক্ষপুটে যে শুধু বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন কবিই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, অনেক অর্ধপ্রাচীন এবং অর্বাচীন কবিও এই কবির দলে ভিড়িয়া গিয়া বেমালুম আত্মগোপন করিয়াছেন। সমস্যা ইঁহাদিগকে লইয়া। কিন্তু এ-সমস্যার কোন সমাধান নাই। পাণ্ডিত্যের কম্পাস্ এখানে দিঙ্-নির্ণয় করিতে সাহায্য না করিয়া দিগ্-ভ্রান্তও করিয়া তুলিতে পারে। সেই জন্যই পণ্ডিত-সুলভ ছাঁটকাটের ভিতরে আমরা বেশী যাই নাই। এ-ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই, আমরা আমাদের আলোচনায় বাল্মীকি সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি তাহার

সমর্থনে রামায়ণের বিশেষ কোন অংশের একটি-আধটি দৃষ্টান্তের উপরই নির্ভর করি নাই,—গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ হইতে উদ্‌ধৃতির দ্বারা সেই কথা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এই প্রমাণ-প্রয়োগের ভিতরে অ-খাঁটি অংশ যেটুকু থাকিবার সম্ভাবনা তাহা দ্বারা আমাদের মূল বক্তব্য খুব শিথিল হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের ভারতবর্ষ গুরুবাদের দেশ; কিন্তু গুরুবাদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, গুরুর মাহাত্ম্য স্থাপনের দ্বারা শিষ্যের গৌরব কোথাও ম্লান হয় না,—আরও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া ওঠে। আদি-কবি বাল্মীকিকে তাই পরবর্তী কবিগণ কবিগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বাল্মীকি সম্বন্ধে এই আদিকবি এবং কবিগুরু আখ্যা দুইটির সার্থকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রামায়ণই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম কাব্য। এই প্রসঙ্গেই প্রথমে বেদের কথা উঠিতে পারে। বেদের ভিতরে কবিত্ব যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু তাহা অবিমিশ্র নহে। বৈদিক ঋষিগণের গাথাগুলির ভিতরে একটা বিস্ময়ের প্রেরণায় ধর্ম এবং সাহিত্য পরস্পরে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য মহাভারত রামায়ণের পরবর্তী না পূর্ববর্তী রচনা এ-বিষয়ে পণ্ডিত মহলে সংশয় রহিয়াছে। কিংবদন্তী অনুসারে রামায়ণ পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও বহু পণ্ডিতের মতে মহাভারত প্রাচীনতর। এই পরবর্তী মত স্বীকার করিয়া লইলেও বলিতে পারি, রামায়ণই ভারতবর্ষের আদিকাব্য। মহাভারত মূলতঃ ইতিহাস; বর্তমান যুগে আমরা তাহাকে 'মহাকাব্য' শিরোনামায় পরিচিত করাইলেও তাহার প্রাচীনতর পরিচয় ইতিহাস রূপে। এই ইতিহাসের ভিতরে

রাজনীতি আসিয়াছে, সমাজনীতি আসিয়াছে, ধর্মনীতি আসিয়াছে, তাহারই ভিতরে ফুটিয়াছে তাহার কাব্যত্ব। কিন্তু কাব্যত্বে মহাভারতের মুখ্য পরিচয় নহে। রামায়ণের ভিতরে আবার রাষ্ট্র, সমাজ বা ধর্মের কথা যেটুকু থাকুক না কেন, কাব্যত্বেই তাহার মুখ্য পরিচয়। এই জন্যেই বলিতে হয়, রামায়ণই ভারতবর্ষের আদিকাব্য এবং বাল্মীকিই ভারতবর্ষের আদিকবি। এই আদিকবিকে কবিগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ভারতবর্ষের সকল কবি। তাই কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধুসূদন পর্যন্ত এই কবিগুরুর চরণে প্রণতি জানাইয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস বাল্মীকির এই কবিগুরুত্বকে শ্রদ্ধায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, এবং কালিদাসের ভাস্বর প্রতিভার উপরে বাল্মীকির শিষ্যত্বের ছাপ অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই শিষ্যত্বের ছাপ শুধু 'রঘুবংশে' নহে, কালিদাসের সমগ্র কাব্যসৃষ্টির ভিতরে ছড়াইয়া আছে; তাহারই বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কোনও কবি-প্রতিভার উপরে পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কবি-প্রতিভার প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে সর্বদাই যেন একটা সঙ্কোচ রহিয়া গিয়াছে, পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক প্রভাব গ্রহণের ভিতরে যেন কবি-প্রতিভার প্রকাণ্ড একটা দৌর্বল্য প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রভাব-গ্রহণের ভিতরে এক দিকে যেমন একটা দুর্বলতা থাকিয়া যাইতে পারে, অন্য দিকে সে যে একটা দৃঢ় বলিষ্ঠতারও পরিচায়ক এ-কথাটা সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। অক্ষমের প্রভাব-গ্রহণ কাব্যসৃষ্টির ভিতরে আত্মপ্রকাশ করে হীন চৌর্যবৃত্তিতে ও অধম

অধিকারীর ক্ষেত্রে তাহা দেখা দেয় অন্ধ অনুকরণের রূপে। কিন্তু সবলের ক্ষেত্রে তাহা দেখা দেয় স্বীকরণের রূপে। এই সার্থক স্বীকরণের ভিতরে প্রতিভার দৈন্য নাই, সক্রিয় সবলতা আছে, তাহার গ্রহণ-শক্তি এবং পরিপাক শক্তির প্রাচুর্যের পরিচয় রহিয়াছে।

শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই প্রাচীনের স্বীকরণের ভিতরে অবমাননা নাই, ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে। নিরন্তর এই স্বীকরণের ভিতর দিয়াই ত চলিতেছে ইতিহাসের অখণ্ড ধারা। বর্তমান কাহাকে বলে? স্তূপীকৃত অতীতের আত্মাহুতির হোমশিখা হইতেই বাহিরিয়া আসে বর্তমানের হেমদ্যুতি। অতীতের অসংখ্য 'গত কাল' গুলি নিঃশেষে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে পৃথিবীর একটি 'আজে'র ভিতরে; নবপ্রভাতের অরুণিম অঙ্কুরটির শিকড় যতখানি পারে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে অতীতের সরস ভূমিতে; নতুবা সে শাখাবাহু-ফুলফলে বাড়িয়া উঠিবার উপজীব্য সংগ্রহ করিবে কোথা হইতে?

মানুষ তাহার অখণ্ড সাধনার দ্বারাই চাহিতেছে তাহার চরম বিকাশ; 'কালে'র সঙ্গে 'আজে'র নিবিড় যোগের ভিতরেই রহিয়াছে মানুষের সকল সাধনার অখণ্ডতা। সাধনার যৌথত্বের ভিতরেই ত নিহিত চরম মঙ্গলের আদর্শ ও আশা। সর্বপ্রকার স্বীকরণের ভিতর দিয়াই দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আমাদের সাধনা লাভ করে এই যৌথ রূপ। এক যুগ তাহার যুগব্যাপী সাধনায় মানুষের ইতিহাসকে যেখানে আগাইয়া দিয়া যায় সেই সাধনাকে স্বীকার করিয়া—অর্থাৎ আত্মসাৎ করিয়াই আরম্ভ হয় নবযুগের যাত্রা। এক যুগকে অপর যুগ এমনই করিয়া স্বীকার করিয়া—আত্মসাৎ করিয়া

না লইলে মানুষের ইতিহাসের আদিযুগের আর শেষ হইত না,—নতুবা প্রতিযুগকেই ত আবার প্রথম হইতে নূতন করিয়া যাত্রা সুরু করিতে হইত।

এক যুগের সাহিত্য তাই যুগের বুকে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়া নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়া যায় নব নব সম্ভাবনার বীজরূপে নবযুগের নবীন উর্বর ক্ষেত্রে। বাল্মীকির বীজ তাই ফুটিয়া ওঠে কালিদাসের নূতন ফুলে, আবার কালিদাসের প্রতিভা ও সাধনা বীজ-রূপে ঝরিয়া পড়িয়া নূতন নূতন ফুল ফুটাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টিতে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে। বাল্মীকির ভাব ও ভাষা, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গিকে কালিদাস সগর্বে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারকে প্রকৃতরূপে গ্রহণ এবং নিজের সাধনায় তাহাকে নানা ভাবে উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তোলা—এই-খানেইত উত্তরাধিকারীর উত্তমাধিকারিত্ব। পিতৃপিতামহের সঞ্চিত ধন-রত্নকে গ্রহণ করিবার এবং ব্যবহার করিবার ক্ষমতা যাহার নাই সে ত অভাগ্য বঞ্চিত! কালিদাসের সে ক্ষমতা ছিল, তাই তিনি বাল্মীকির যোগ্যতম উত্তরাধিকারী।

বাল্মীকির নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল দায়ভাগ গ্রহণ সত্ত্বেও কালিদাসের প্রতিভা অম্লানজ্যোতিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কালিদাস তাঁহার লব্ধ দায়ভাগের দ্বারা কোথাও আচ্ছন্ন বা বিমূঢ় নহেন; তাই তাঁহার 'অপূর্ব বস্তু নির্মাণ-ক্ষমা-প্রজ্ঞা' প্রতিভা তাহার নব নব উন্মেষণী শক্তিতে অব্যাহত ভাবে নিত্য নূতন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আসলে কালিদাস বাল্মীকির সকল দানকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রকৃতির দানের মত। তাঁহার কবি-মানসের ভিতরে তাঁহার

চারিপাশের জীবন—আলো-বাতাস, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-প্রান্তর যেমন করিয়া গিয়া ভিড় করিয়া বাসা বাঁধিয়াছিল, বাল্মীকির নিকট হইতে লব্ধ সকল চিন্তা, ভাব, আদর্শ, তেমন করিয়াই তাঁহার কবি-মানসে বাসা বাঁধিয়াছিল। এই সকলের সমবায়ে গঠিত তাঁহার সমগ্র কবি-মানস ; সেখানে স্বোপার্জিত ধন এবং ঋক্‌থ-সূত্রে লব্ধ ধনের ভিতরে কোনও ভেদ নাই। প্রাচীনের সকল উপাদান তাঁহার 'হৃদয়-বৃত্তির জারক-রসে জারিত' হইয়া একেবারে তাঁহার নিজস্ব হইয়া গিয়াছিল ; ইহাকেই বলে প্রাচীনের স্বীকরণ। কালিদাসের কাব্য পড়িতে পড়িতে বহু স্থানে বাল্মীকির স্মরণ হয় ; সে স্মরণ সর্বত্র 'বোধপূর্ব'ও নহে, অনেক সময়ে 'অবোধপূর্ব' ; সব জড়াইয়া এই কথাই মনকে নাড়া দিতে থাকে, বাল্মীকির কাব্য কিরূপে কালিদাসের কাব্যে নব পরিণতি লাভ করিয়াছে! এই নব-পরিণতির ভিতরে কালিদাস বাল্মীকির ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিকে অনেক স্থানে যে আরও গভীর এবং ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাল্মীকির নিসর্গ-প্রীতি ও কালিদাসের নিসর্গ-প্রীতি, বাল্মীকির উপমা-প্রয়োগ ও কালিদাসের উপমা প্রয়োগের ভিতরে হয়ত সাধর্ম্য বহু রহিয়াছে ; কিন্তু বাল্মীকির ভিতরে যাহার আভাস রহিয়াছে কালিদাস তাহাকে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছেন। কালিদাসই যে শুধু বাল্মীকিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন নহে, কবিগুরু বাল্মীকিও গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ববর্তিগণকে। আমাদের পরবর্তী আলোচনার ভিতরেই দেখা যাইবে, বাল্মীকি যেমন বরহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন কালিদাসের শিয়রে, বৈদিক ঋষিগণ তেমনই বরহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন বাল্মীকির শিয়রে। কালিদাস

যেমন শুধু তাঁহার নিজের যুগকেই তাঁহার সাহিত্যে প্রতিফলিত করেন নাই, সেখানে যেমন পটভূমিরূপে তিনি অতীতকেও গ্রহণ করিয়াছেন, বাল্মীকির ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথাই বলা চলে।

কালিদাস এবং বাল্মীকির ভিতরকার সম্পর্কটা অনেকখানি রবীন্দ্রনাথ এবং কালিদাসের সম্পর্কের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা 'বর্ষামঙ্গল' বা 'নববর্ষা' পড়িতে পড়িতে অবোধপূর্ব ভাবে কালিদাসের স্মরণ হইতে থাকে, এ যেন বীণার মূলতারে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট তারগুলির ঝঙ্কার। এ জাতীয় কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে আমরা সব সময়ে স্পষ্ট বুঝিতে পারি না রবীন্দ্রনাথ কালিদাস হইতে কি কি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কতটা গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এ-কথা মনে হয়, ভাবে, দৃশ্যে, ভঙ্গিতে ভাষায় কালিদাস যেন রবীন্দ্রনাথের সহিত এক হইয়া অতি সহজ ভাবে মিলিয়া আছেন। কালিদাসের ভাব, চিত্র ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের ভিতরে গিয়া বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কালিদাসের 'মেঘদূত'কে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিয়াছেন, রচনা লিখিয়াছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা বা কবিতা পড়িলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, ইহা কালিদাস-রচিত পটভূমিকার উপরে সৃষ্ট একান্ত ভাবেই রবীন্দ্রনাথের 'নবমেঘদূত'। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতা পড়িলে যেমন মনে হয়, কালিদাসের নিকট হইতে কবি অনেক গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনই মনে হয়, কালিদাসের 'মেঘদূতে'র পটভূমিতে তিনি নূতনও অনেক কিছু দিয়াছেন; 'মেঘদূতে'র ভিতরে তিনি যে নূতন অর্থ সঞ্চার করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার দান; সে দান কালিদাসকেও মহিমান্বিত করিয়াছে

আপনাকেও মহিমান্বিত করিয়াছে। কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে তাঁহার জীবনের বিভিন্ন যুগে নানা ভাবে দোলা দিয়াছে। এর ভিতরে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে যত বার 'কুমার-সম্ভবে'র দোলা লাগিয়াছে 'কুমার-সম্ভব'কে অবলম্বন করিয়া কবি ততবার নূতন ভাবে ও নূতন ভঙ্গিতে কাব্য-রচনা করিয়াছেন; কিন্তু কালিদাসের পটভূমিতে ইহার প্রত্যেকটি কবিতাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দান, এবং রবীন্দ্রপ্রতিভাও এই কবিতাগুলির ভিতরে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। কালিদাসের যুগ-মানস এই ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া কি পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহারই স্পষ্টতম পরিচয় রহিয়াছে এই কবিতাগুলির ভিতরে; ভাব ও প্রকাশ-ভঙ্গি উভয়ের ভিতরেই রহিয়াছে গভীর বিবর্তন। এই বিবর্তনের ভিতরেই সাহিত্যের ইতিহাসের অখণ্ড যোগ এবং এইখানেই সাহিত্য সাধনার যৌথরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে! রবীন্দ্রনাথের সাধনার সকল সিদ্ধিকে—তাঁহার সকল ভাব ও ভাষাকে আমরা আজ আবার লাভ করিয়াছি তাঁহার উত্তরাধিকারী রূপে, সেই উত্তরাধিকারের ভূমিকায় যদি আমরা আনিতে পারি নব নব পরিণতি নিত্যনবীন সৃষ্টিতে তবে সেইখানেই ত রবীন্দ্রনাথের সকল দানের মর্যাদা। আমরা গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব বলিয়া এখানে এ বিষয়ে আর আলোচনা করিলাম না।

কবি হিসাবে বাল্মীকি ও কালিদাসের তুলনামূলক আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও দু'একটি কথা বলা দরকার। একটা কথা প্রথমেই স্পষ্ট করিয়া

বলিয়া রাখিতেছি, আমাদের উদ্দেশ্য কোন তুলনামূলক 'বিচার' নহে, আমাদের উদ্দেশ্য তুলনামূলক 'আলোচনা'। তুলনামূলক 'বিচারে'র প্রয়াস এবং পদ্ধতি আমাদের নিকটে মূলতঃই ভুল বলিয়া মনে হয়। দুই যুগের দুই দেশের বিভিন্নধর্মী দুই কবির ভিতরে কে বড় কে ছোট এ প্রশ্নই আসে না। একই দেশের দুই যুগের বিভিন্নধর্মী দুই কবির ভিতরেও এই ভালমন্দের প্রশ্নটা সর্বত্র সাধু নহে। সুতরাং আমাদের আলোচনার ভিতরে বাল্মীকি ও কালিদাসের কবিধর্মের দোষগুণের কথা প্রসঙ্গক্রমে যতই উল্লেখ করি না কেন, সেই সকল দোষগুণ লইয়া তুলনায় কে ছোট কে বড় হইয়া উঠিয়াছেন এ জাতীয় অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা আমরা করিব না। আমাদের তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্য উভয় কবিকে তাঁহাদের বিভিন্নযুগের পটভূমিকার উপরে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয়ের কবি-প্রতিভাকে মিলে ও বৈষম্যে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখা। অধিকন্তু একটি বিশেষ দেশের সাহিত্যের ইতিহাস বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ কবিগণের সাধনার ভিতর দিয়া কি করিয়া একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্ররূপে আবর্তিত হইয়া বিভিন্নযুগের ভিতর দিয়াই একটা যোগসূত্র রচনা করিয়া চলে, বাল্মীকি-কালিদাসের সকল লেন-দেনের ভিতর দিয়া আমরা সেই জিনিসটি লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

বাল্মীকি ও কালিদাসের আলোচনাপ্রসঙ্গে কবি অশ্বঘোষের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে; কারণ এই তিনজন কবির ভিতরে ইতিহাসের যোগ খুব নিবিড়। অশ্বঘোষ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মহলে কিছু কিছু বিতর্ক থাকিলেও মোটের উপরে তিনি যে বাল্মীকি ও কালিদাসের মধ্যবর্তী কবি সে-কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া

লইয়াছেন। আর এ কথার প্রমাণ সন তারিখের ভিতরে স্পষ্ট করিয়া পাওয়া না গেলেও এই তিনের কাব্যের ভিতরে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। অশ্বঘোষ তাঁহার 'বুদ্ধ-চরিত','সৌন্দরানন্দ' প্রভৃতি কাব্যে বাল্মীকির রামায়ণ হইতে ঋক্‌থ-সূত্রে অনেক রীতি, উপমা, ভাষা, গ্রহণ করিয়াছেন, আবার কালিদাসের কাব্যের সহিত অশ্বঘোষের কাব্যের মিলও অতি স্পষ্ট।

এতদিন আমরা জানিতাম, সংস্কৃতের কাব্য-রীতি কালিদাস কর্তৃকই প্রচলিত এবং প্রচারিত ; অন্ততঃ কালিদাসের পূর্বে কোথায়ও আর ইহার নমুনা মেলে নাই। বাল্মীকির রামায়ণে কাব্যত্ব প্রচুর রহিয়াছে, কিন্তু ঠিক কাব্য-রীতিটির পরিচয় নাই। কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ছন্দঃ-প্রয়োগে, বচন-বিন্যাসে, অলঙ্কার-প্রয়োগে কাব্য-শৈলীর একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক সময় মনে হইত, বাল্মীকির রামায়ণের কাব্যরীতি এবং কালিদাসের কাব্যরীতির ভিতরে যে ব্যবধান তাহাকে লঘু করিবার জন্য মাঝখানে কোনও মধ্যধর্মাবলম্বী কবির আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। অশ্বঘোষের আবিষ্কার আমাদের মনের এই কৌতূহলকে একেবারেই নিবৃত্ত করে। এখন পর্যন্ত যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে সংস্কৃতের এই বিশিষ্ট কাব্যরীতির প্রথম পরিচয় রহিয়াছে বাল্মীকির কাব্যে, তারপরে অশ্বঘোষের কাব্যগুলির ভিতরে। কালিদাস সেই রীতিকে অবলম্বন করিয়াই কাব্য-রূপের একটি বিশিষ্ট পরিণতি দান করিয়াছেন। 'বুদ্ধ-চরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' কাব্যের প্রথমাংশ পাঠ করিবার সময় বিষয়ের বর্ণনায়, বচন-রীতিতে, অলঙ্কার-প্রয়োগে কেবলই কালিদাসের স্মরণ হইতে থাকে। বর্ণনায় বহুস্থানে শ্লোকে শ্লোকে উভয় কবির

ভিতরে মিল দেখান যাইতে পারে। অশ্বঘোষ রামায়ণকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন, কালিদাস রামায়ণের সহিত অশ্বঘোষকেও আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাইত কাব্যের ক্ষেত্রে যৌথ-সাধনা এবং এই যৌথ-সাধনার ফল সাহিত্যের ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে রক্ষা করা। আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় অশ্বঘোষের সহিত একদিকে বাল্মীকির এবং অন্যদিকে কালিদাসের যে মিল রহিয়াছে সে আলোচনার ভিতরে বিস্তারিত ভাবে প্রবেশ করি নাই, কারণ প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে এই আলোচনা আরও কেহ কেহ করিয়াছেন। একান্ত প্রাসঙ্গিক বলিয়া আমরা এই মিলের উল্লেখ মাত্রই করিলাম। তবে গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে পাদটীকায় আমরা অশ্বঘোষের কাব্য হইতে কিছু কিছু শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিয়াছি, তাহার ভিতরেও আমাদেও কথার অনেকখানি যাথার্থ্য মিলিবে।

কালিদাস বাল্মীকির নিকটে কোথায় কতখানি ঋণী এ কথা আলোচনার পূর্বে কালিদাসের কবি-প্রতিভা এবং বাল্মীকির কবি-প্রতিভার ভিতরে যে পার্থক্য রহিয়াছে সে-সম্বন্ধ একটু আলোচনার প্রয়োজন। এই কবিধর্মের পার্থক্যের পশ্চাতে রহিয়াছে অনেক খানি যুগধর্মেরই পার্থক্য। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা বাল্মীকির রামায়ণ এবং কালিদাসের 'রঘুবংশে'র কথাই উল্লেখ করিতেছি। কালিদাসের 'রঘুবংশ' পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা কোন বিশেষ কবি

কর্তৃক রচিত; রামায়ণ পাঠ করিলে মনে হয়, ইহা রচিত নহে,—হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিভাগে ইহা শস্যের মতন উৎপন্ন। কালিদাস আত্ম-সচেতন সুনিপুণ ভাস্কর, অতি যত্নে ধীরে-সুস্থে খুদিয়া খুদিয়া রঘুবংশের মূর্তিগুলি তৈয়ার করিয়াছেন, তাহাকে ঘষিয়া মাজিয়া সুডৌল, মসৃণ এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন,—দুর্লভ মণিমুক্তায় খচিত সে কাব্য ঝল্‌মল্ করিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের গভীর যোগে, বর্ণনার বিরল নৈপুণ্যে, বাগ্‌ভঙ্গির রমণীয় চাতুর্যে রঘুবংশ পরম আস্বাদ্য,—কিন্তু এ-কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, যে-যুগের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন, সে যুগের জীবনের সহিত কবির কোন ঐকাত্ম্য বা নিবিড় পরিচয় ছিল না; ফলে কবিকে সমগ্র রঘুবংশকে তৈয়ারী করিয়া লইতে হইয়াছে বিশুদ্ধ কবিকল্পনার সাহায্যে তাঁহার নিজের যুগের পটভূমিকায়। কিন্তু বাল্মীকি যেন সুনিপুণ কৃষক; তাঁহার যুগে একটি বিস্তীর্ণ ভূমিভাগের ভিতরে বৃহত্তর সমাজ-জীবনে ফলিয়াছিল যত সোনার ফসল তাহাকেই বাছিয়া বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কবি-কল্পনা দ্বারা আটি বাঁধিয়াছেন রামায়ণ কাব্যরূপে। রামায়ণের পত্রে পত্রে তাই সহজ জীবনের ভিড়; একটা বৃহৎ জাতির যুগান্তব্যাপী জীবন-ইতিহাস—তাহার কলমুখরতাই আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তোলে। বাল্মীকির কাব্যের ছোট বড় সকল সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্য, বীরত্ব-ভীরুতা একান্ত জীবন্ত হইয়াই দেখা দেয়; কালিদাসের 'অজবিলাপ' বা 'রতি-বিলাপ' রূপ দীর্ঘ শোকবর্ণনাও বিলাপের নামে দীর্ঘ-বিলাস; সে বিলাসের নৈপুণ্যের ভিতরে চমৎকৃতির প্রাচুর্য রহিয়াছে, কিন্তু প্রাণ-প্রাচুর্য নাই।

পাশ্চাত্ত্য কাব্যবিভাগ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আমরা বলিতে পারি, বাল্মীকির কাব্য খাঁটি এপিক্ কাব্য—কালিদাসের কাব্য 'সাহিত্যিক এপিক্' বা কৃত্রিম এপিক্। রামায়ণের যুগ হইতে কালিদাস বহু দূরে নির্বাসিত; সেখান হইতে কল্পনার মেঘদূত পাঠাইয়া তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়া তাঁহার উপায় ছিল না, আর সেই তথ্যকে কাব্যে রূপায়িত করিতে সমসাময়িক জীবনের পটভূমিকে বাদ দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাল্মীকির কাব্যে যে যুগ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা তাঁহার নিজেরই যুগ; সে যুগের বৃহত্তর সমাজ-সত্তা অপরূপ কাব্যমূর্তি লাভ করিয়াছে বাল্মীকির কবি-প্রতিভার ভিতর দিয়া; বাল্মীকির কাব্য তাই এত জীবন্ত।

বস্তুতঃ, কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যের অন্য যতই মহৎ গুণ থাক, বাল্মীকি-রামায়ণের বলিষ্ঠ সজীবতা সেখানে বিরল। বাল্মীকি বর্ণিত লক্ষ্মণ-চরিত্রের ন্যায় একটি প্রাণবন্ত চরিত্র আমরা কালিদাসের নিকট হইতে আশা করিতে পারি না। এই লক্ষ্মণ-চরিত্রকে এতখানি জীবন্ত করিয়া তুলিতে বাল্মীকির কোন কায়ক্লেশ বিপুল আয়োজন ছিল না,—অতি সহজ ভাবে—অতি সহজ ভাষায় তাহা মূর্তি লাভ করিয়াছে তাঁহার কাব্যে। রামের নির্বাসনের বার্তা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অতি রূঢ় ভাষায় তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছিল; ধর্মজ্ঞ রাম নানা নীতিবাক্যে লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু সে সকল ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ—

তদা তু বদ্ধা ভ্রুকুটীং ভ্রুবোর্মধ্যে নরর্ষভঃ।
নিশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ॥ (অযো—২৩।২)

'নরর্ষভ লক্ষ্মণ দুই ভুরুর মধ্যে ভ্রূকুটী বদ্ধ করিয়া বিলস্থ রোষিত মহাসর্পের ন্যায় ঘন শ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল' ;—এবং লক্ষ্মণ বলিল,—

নোৎসহে সহিতুং বীর তত্র মে ক্ষন্তুমর্হসি। (ঐ ২৩।১১)

—'তুই যতই ধর্মবাক্য বল, এ-জাতীয় অবিচার সহ্য করিতে আমার কোনই উৎসাহ নাই,—এ বিষয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা করিও।' এতখানি বলিষ্ঠতাকে কালিদাস এত সহজে এত ছোট এবং অল্প কথায় প্রকাশ কোথাও করেন নাই। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ এই প্রসঙ্গে রামকে বলিয়াছিল—

ন শোভার্থাবিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে।
নাসিরাবন্ধনার্থায় ন শরাস্তম্ভহেতবঃ॥ (ঐ ২৩।৩১)

—'আমার এই দীর্ঘ বাহু দু'টি অঙ্গের শোভা বৃদ্ধির জন্য হয় নাই,—আর ভূষণের জন্য ধনু ধারণ করি নাই, বন্ধনের জন্য অসি এবং স্তম্ভের জন্য এই শরগুলি ধারণ করি নাই।'—কালিদাসের হাতে এই-জাতীয় বীরত্ব-প্রকাশ বিপুল আয়োজনের অপেক্ষা রাখিত।

শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের জন্য রাম শোক করিয়া বলিতেছিল,—আমি যখন অযোধ্যায় ফিরিব তখন মাতৃগণ এবং ভ্রাতৃগণ সকলেই আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে,—

সহ তেন বনং যাতো বিনা তেনাগতঃ কথম্।
(যুদ্ধ ১০১।১৭)

'তুমি বনে যাইবার কালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে, ফিরিবার কালে তাহাকে বিনা ফিরিলে কেন ?' এ-শোকের ভিতর কবি-কল্পনার অতিশয়োক্তি নাই—এ-শোক এবং এ-শোকের ভাষা সবই বাল্মীকি

গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার চারিপাশে ছড়ান সাধারণ জনগণের জীবন হইতে।

রাবণবধের পর সীতা উদ্ধার করিয়া রাম সীতাকে সর্বজনসমক্ষে বলিয়াছিল—

অদ্য মে পৌরুষং দৃষ্টমদ্য মে সফলঃ শ্রমঃ।
অদ্য তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽহং প্রভবাম্যদ্য চাত্মনঃ॥ (যুদ্ধ ১১৫।৪)

'আজ আমার পৌরুষ সকলে দেখিতে পাইল, আজ আমার সকল শ্রম সফল, আজ আমি প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ, আজ আমি নিজের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত' ; কিন্তু—

প্রাপ্তচারিত্রসন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়ং॥
তদ্ গচ্ছ ত্বানুজানেঽদ্য যথেচ্ছং জনকাত্মজে।
এতা দশদিশো ভদ্রে কার্যমস্তি ন মে ত্বয়া॥

(ঐ ১১৫।১৭-১৮)

'তোমার চরিত্র আজ সন্দিগ্ধ, সুতরাং স্মিতমুখে আজ তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেও নেত্রাতুর লোকের নিকট প্রদীপের ন্যায় তুমি আজ আমার বিশেষ প্রতিকূলারূপে প্রতিভাত হইতেছ ; সুতরাং হে জনক-নন্দিনি, তোমাকে আমি এই অনুজ্ঞা দিতেছি,—এই দশদিক পড়িয়া রহিয়াছে—তুমি ইহার যে দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার, তোমাকে দিয়া আমার আর কোন কাজ নাই।' চরিত্রের এত বড় একটা কঠোরতাকে এতখানি রূঢ় সরলতার ভিতরে প্রকাশ করিয়া কবিগুরু রামচন্দ্রকে একটি রক্তমাংসের মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। সীতাও সরোষ রাঘবের এই রোমহর্ষণ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া

গজেন্দ্রহস্তাভিহতা বল্লরীর ন্যায় প্রব্যথিতা হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাষ্প-পরিক্লিন্ন নিজের মুখ মার্জনা করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে সে উত্তর করিয়াছিল—

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব॥
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে॥ (যুদ্ধ ১১৬।৫-৬)

'হে বীর, তুমি বীর হইয়াও প্রাকৃতজনের প্রাকৃত বাক্যের ন্যায় এরূপ শ্রোত্রদারুণ অসদৃশ বাক্য আমাকে শুনাইতেছ কেন? তুমি আমাকে যেরূপ জান, হে মহাবাহো, আমি সেরূপ নহি, শপথ করিয়া বলিতেছি—আমার নিজের চারিত্র দ্বারাই তুমি প্রত্যয় লাভ কর।' বেশ বোঝা যাইতেছে, এই সীতা পরবর্তী কালের লোহা-বাঁধান সতীত্বের ফ্রেম নহে,—এ সতী হইলেও রক্তমাংসের নারী।

রামচন্দ্র যে-দিন দূর হইতে অতর্কিত ভাবে শর সন্ধান করিয়া বালীকে হত্যা করিয়াছিল, সেদিন বালী ভূমি-নিপতিত হইয়াও সগর্বে রামচন্দ্রকে যে পরুষ বাক্য বলিয়াছিল, বাল্মীকি তাহাকে 'প্রশ্রিতং ধর্মসহিতম্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বালী বলিয়াছিল,—

ত্বয়া নাথেন কাকুৎস্থ ন সনাথা বসুন্ধরা।
প্রমদা শীলসম্পূর্ণা পত্যেব চ বিধর্মণা॥
শঠো নৈকৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যাপ্রশ্রিত-মানসঃ।
কথং দশরথেন ত্বং জাতঃ পাপো মহাত্মনা॥
ছিন্নচারিত্র্যকক্ষ্যেণ সতাং ধর্মাতিবর্তিনা।
ত্যক্তধর্মাঙ্কুশেনাহং নিহতো রামহস্তিনা॥

(কিষ্কিন্ধা ১৭।৪২-৪৪)

'হে কাকুস্থ, তোমাকে নাথরূপে লাভ করিয়া বসুন্ধরা যে সনাথা হইয়াছে তাহা বলা যায় না,—বিধর্মা পতি দ্বারা শীলসম্পূর্ণা প্রমদা যেমন কখনও পতিযুক্ত হয় না। তুমি শঠ, পরাপকারী, ক্ষুদ্র, তোমার মন মিথ্যাশ্রিত; দশরথের ন্যায় মহাত্মা কর্তৃক তোমার মত পাপ কিরূপে জাত হইল? চারিত্র্যের গলবন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, সৎ ব্যক্তি-গণের ধর্মকে অতিক্রম করিয়াছে, ধর্মের অঙ্কুশকে ত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ একটি রামহস্তী দ্বারা আমি আজ হত হইলাম।' রামচন্দ্রের প্রতি এই জাতীয় ভর্ৎসনাকে 'প্রশ্রিতং বাক্যং ধর্মার্থসহিতং হিতম্,' বলিয়া অভিহিত করিবার ভিতরে যে সংস্কারবর্জিত স্বাধীন দৃষ্টি রহিয়াছে তাহাই রামায়ণ কাব্যখানিকে একটা বলিষ্ঠতা দান করিয়াছে।

কিষ্কিন্ধা-কাণ্ডের সুগ্রীবের চরিত্রের ভিতরেও আদিম অনার্য জীবনের একটা বর্বর বলিষ্ঠতা প্রস্ফুট হইয়াছে। সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া রামচন্দ্র বালিবধ পূর্বক সুগ্রীবকে বানর রাজ্যের নিষ্কণ্টক রাজা করিয়া দিয়াছিল; বিনিময়ে সুগ্রীব সীতা অন্বেষণ করিয়া তাহাকে উদ্ধারের সহায়তা করিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। সম্মুখে বর্ষাকাল—এখন বন-প্রান্তর, পর্বত-গুহা সকলই জলে ভরিয়া যাইবে—অতএব সকলকে শরতের আগমন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল। রাম-লক্ষ্মণ বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, সুগ্রীব তাহার নবলব্ধা স্ত্রী তারাকে লইয়া গুহাস্থিত রাজধানীর ভিতরে প্রস্থান করিল।

রামচন্দ্রের হৃদয়-আকাশকে বেদনার মেঘে ভরিয়া দিয়া ঘন বর্ষার সমাগম হইল—রামচন্দ্রের অশ্রু বর্ষণের সহিত ঘনবর্ষণের ফলে বেদনার মেঘ অনেকখানি কাটিয়া গেল,—দেখা দিল বিমলব্যোম—গতবিদ্যুদ্বলাহকের শরৎ কাল। রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণের জন্য

ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—কিন্তু মিতা সুগ্রীবের আর কোনও সাড়া নাই। সুগ্রীবের একে রাজ্যসমৃদ্ধি লাভ—তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী লাভ—অতএব মধুপানে আরক্তলোচনেই তাহার সুখের দিন ধীর মন্থর কাটিতে লাগিল—মিত্রতার প্রতিশ্রুতি সে কখন ভুলিয়া বসিয়া আছে। অপেক্ষায় অধৈর্য হইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিল,—

স কিষ্কিন্ধাং প্রবশ্য ত্বং ব্রূহি বানরপুঙ্গবম্।
মূর্খং গ্রাম্যসুখে সক্তং সুগ্রীবং বচনান্ মম ॥
অর্থিনামুপপন্নানাং পূর্বং চাপ্যুপকারিণাম্।
আশাং সংশ্রুত্য যো হন্তি স লোকে পুরুষাধমঃ ॥

(কিষ্কিন্ধা—৩০।৭০-৭১)

'সেই কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিয়া তুমি মূর্খ গ্রাম্যসুখে সক্ত বানরপুঙ্গব সুগ্রীবকে আমার এই কথাগুলি বলিয়া আস,—বলবীর্যশালী অর্থী—যে পূর্বে অনেক উপকারও করিয়াছে—তাহাকে একবার আশা দিয়া যে লোক তাহা নষ্ট করে সে পুরুষাধম।' লক্ষ্মণ তখনই উত্তর করিয়াছিল,—বানরের কি কখনও সাধুবৃত্তি হয় ?—সে কখনও কর্মফল সম্বন্ধের কথা চিন্তা করে না।

ন বানরঃ স্থাস্যতি সাধুবৃত্তে
ন মন্যতে কর্মফলানুষঙ্গান্। (ঐ—৩১।২)

ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ অকৃতজ্ঞ বানররাজকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য শরধনু লইয়া সুগ্রীবের রাজপুরীতে প্রবেশ করিল। গিরিসঙ্কটে সুগ্রীবের দুর্গে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণ চারিদিকে বৃক্ষে বৃক্ষে বানরশ্রেণী দেখিতে পাইল,—লক্ষ্মণের রোষায়িত করাল মূর্তি দেখিয়া ভীত সংত্রস্তভাবে বানরগণ ছুটিয়া সুগ্রীবকে খবর দিল, কিন্তু—

তারয়া সহিতঃ কামী সক্তঃ কপিবৃষস্তদা।
ন তেষাং কপিসিংহানাং শুশ্রাব বচনং তদা॥

(ঐ—৩১।২২)

সে সময়ে তারার সহিত আসক্ত কামী কপিরাজ সে সকল বানরগণের কথা মোটে কানেই তুলিল না। বানরগণ অনন্যোপায় হইয়া প্রাণভয়ে যে যেখানে পারিল বৃক্ষের অন্তরালে পলাইয়া রহিল। লক্ষ্মণকে দেখিয়া বানরকুল কিলকিল শব্দে মহান্ কোলাহল তুলিল, এবং সেই কোলাহলে সুগ্রীবের নেশা টুটিয়া গেল, বর্ষার চারিমাসের নিরবছিন্ন মদবিলাসের পর যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই—

তেন শব্দেন মহতা প্রত্যবুদ্ধ্যত বানরঃ।
মদবিহ্বলতাম্রাক্ষো ব্যাকুলস্রগ্বিভূষণঃ॥ (কি—৩১।৪১)

সেই মহান্ কোলাহল শব্দে বানর সুগ্রীব জাগিয়া উঠিল—তখনও সে মদবিহ্বল—চক্ষু দুইটি তাম্রবর্ণ—মাল্য-ভূষণ শিথিল হইয়া গিয়াছে।

দ্বারী অঙ্গদ সত্বর গিয়া পিতৃব্য এবং মাতাকে লক্ষ্মণের আগমন বার্তা জানাইল। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের পুরীতে পূর্বপ্রতিশ্রুতি পালনের কোন আয়োজনচিহ্ন দেখিতে পাইল না,—সীতার অন্বেষণের জন্য কোথায়ও কোনও উৎকণ্ঠার লক্ষণ নাই,—চারিদিকে আছে শুধু ভোগবিলাসের আয়োজন। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের পুরীতে প্রবেশ করিল, ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া কৃতঘ্নতার উচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইল; এমন সময় সুগ্রীবপত্নী তারা অনুনয় বাক্যে লক্ষ্মণের শরণ গ্রহণ করিল।

সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী
প্রলম্বকাঞ্চীগুণহেমসূত্রা।
সলক্ষণা লক্ষ্মণসন্নিধানং
জগাম তারা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ॥ (ঐ—৩৩।৩৮)

মদবিহ্বলাক্ষী তারার প্রতিপদে পদস্খলন হইতেছিল, স্বর্ণ সূত্রের কাঞ্চী প্রলম্বিত হইয়া পড়িয়াছিল ; স্তনভারে অঙ্গযষ্টি অবনমিত হইয়া পড়িতেছিল—এইরূপে সুলক্ষণা তারা লক্ষ্মণের সন্নিধানে গমন করিল। তারার অনুনয়ে লক্ষ্মণের ক্রোধের উপশম হইল, সুগ্রীবও চৈতন্য প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে সীতার অন্বেষণের জন্য উদ্যোগ-আয়োজনে তৎপর হইল।

আমরা এখানে সুগ্রীবের যে বন্য প্রাকৃতজনোচিত চরিত্রটি পাইতেছি তাহার চারিপাশে একটা সজীব বাস্তবতা জাগিয়া উঠিয়াছে। বাল্মীকির কাব্যদৃষ্টি নাগরিক রাজা, রাজপুত্র বা রাজপুরোহিত প্রভৃতির প্রতিই নিবদ্ধ ছিল না, চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে তাঁহার কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। কাব্যের ভিতরে যাহাকে যতটুকু স্থান দিয়াছেন দেশ-কাল-পাত্রের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া তাহার ভিতরেই তাহাকে সর্বত্র সজীব করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালিদাসের রঘুবংশে বর্ণিত সকল চরিত্রগুলি এইভাবে অপক্ষপাতে কবি-কল্পনার অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অভিজাতের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট, সেই পক্ষপাতিত্বের দ্বারাও যে তিনি তাঁহার অভিজাত চরিত্রগুলিকে সজীব করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না।

পৌরুষ বা বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা বা চরিত্রের বর্ণনায়ই যে বাল্মীকির

বলিষ্ঠতার প্রকাশ তাহা নহে। সহজ হাস্য-কৌতুক বা শোক-হর্ষ প্রকাশের ভিতরেও এই সজীব বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ছোট দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। হনূমান্ লঙ্কা হইতে সীতার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ; বানরগণ হনূমানের নিকটে সীতার সংবাদ জানিতে পারিয়া 'মদোৎকট' হইয়া মধুপানের মানসে সুগ্রীব-রক্ষিত মধুবনে প্রবেশ করিল। হর্ষের আতিশয্যে—

গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ
নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।
পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ
প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ ॥
পরস্পরং কেচিদুপাশ্রয়ন্তি
পরস্পরং কেচিদতিক্রবন্তি।
দ্রুমাদ্দ্রুমং কেচিদভিদ্রবন্তি
ক্ষিতৌ নগাগ্রান্নিপতন্তি কেচিৎ ॥
মহীতলাৎ কেচিদুদীর্ণবেগা
মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসংপতন্তি।
গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি
রুদন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি ॥
তুদন্তমন্যঃ প্রণুদন্নুপৈতি
সমাকুলং তৎ কপিসৈন্যমাসীৎ।
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ ॥ (সুন্দর—৬১।১৬-১৯)

'কেহ কেহ গান ধরিয়া দিল, কেহ কেহ তুমুল হাস্য আরম্ভ করিয়া

দিল; কেহ কেহ নৃত্য আরম্ভ করিল, কেহ কেহ প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল;—কেহ কেহ পাঠ সুরু করিল, কেহ কেহ ঘুরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ লম্ফ দিতে লাগিল, কেহ কেহ প্রলাপ বকিতে লাগিল। কেহ কেহ পরস্পরে ভর করিতে লাগিল, কেহ কেহ পরস্পরে গালমন্দ আরম্ভ করিয়া দিল,—কেহ কেহ গাছ হইতে বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল, কেহ কেহ পাহাড়ের চূড়া হইতে ভূমিতে নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ উন্মত্ত আবেগে ভূমিতল হইতে গিয়া বড় বড় বৃক্ষের অগ্রভাগে পড়িতেছে, যে গান করিতেছে তাহার কাছে কেহ পরিহাস করিয়া আগাইয়া যাইতেছে, যে রোদন করিতেছে তাহার কাছে কেহ তীব্রতর রোদন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে;—আবার একজনে যাহাকে নানা ভাবে পীড়িত করিতেছে অপরে তাহাকে বিনোদন করিতে আসিতেছে; এইরূপে সেই সমস্ত কপিসৈন্যই একেবারে সমাকুল হইয়া উঠিল; সেখানে এমন কেহ ছিল না যে মত্ত হইয়াছিল না,—এমন কেহ ছিল না যে দৃপ্ত হইয়াছিল না।' হর্ষোন্মত্ত কপিগণের এই চিত্রটি বেছন্দ হৈ-হুল্লোড়ে একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বনরক্ষক সুগ্রীবের বৃদ্ধ মাতুল দধিবক্ত্র এই প্রমত্ত বানরগণকে বারণ করিতে গিয়া যে লাঞ্ছনা লাভ করিয়াছিল তাহা আরও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাসের ভিতরে এরূপ বেসামাল বেছন্দ প্রমত্ততার স্থান নাই,—সেখানে সকলই পরিপাটি।

আসলে কালিদাসের যুগটাই পরিপাটি যুগ, সেখানে বেসামাল ভাবে হাসিতে পারা ও কাঁদিতে পারার সুযোগ কম। প্রিয়জনের জন্য শোক করিতে হইলেও নিখুঁত শ্লোকসমষ্টির ভিতর দিয়া অনেকক্ষণ

বসিয়া ইনাইয়া-বিনাইয়া বিলাপ করিতে হয়। বাল্মীকির যুগটায় কোনদিক হইতেই আঁটসাট ছিল না; তখনও সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম তরল বায়বীয় অবস্থাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া একেবারে শক্ত শীতল কাঠামবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে নাই। সেটা ছিল বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সর্বত্রই একটা গড়িয়া উঠিবার যুগ। কালিদাসের যুগ একটি বিলাসী সামন্ততন্ত্রের যুগ। সেই সামন্ততন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-জীবন কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিতেছিল নাগরিক জীবনের স্বচ্ছন্দ বিলাসে। কিংবদন্তী অনুসারে কালিদাস ছিলেন রাজকবি, নব-রত্নসভার তিনিই ছিলেন উজ্জ্বলতম রত্ন। এ-সকল কথা সত্য হোক কি না হোক, এ-কথা সত্য যে কালিদাসের সাহিত্য মূলতঃ নাগরিক সাহিত্য, রামায়ণ অনেকখানি 'আরণ্যক' সাহিত্যেরই সম-গোত্রীয়। কালিদাসের যুগে 'উদ্যানলতা' এবং 'বনলতা'র ভিতরকার ভেদও বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং যেখানে

দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।

সেখানেও কবির নাগরিকজনসুলভ বৈচিত্র্যপ্রয়াসী সুকুমার রসবোধেরই পরিচয় রহিয়াছে। কবির বৈচিত্র্যপ্রয়াসী নাগরিক রসিক মনের পরিচয় আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 'মেঘদূতে'র ভিতরে। উদ্‌গৃহীতালকান্তা পথিক-বনিতাগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইবার লোভ, জনপদ-বধূগণের ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দ্বারা পীয়মান হইবার লোভের ভিতর এই নাগরিকবৃত্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আসলে কিন্তু কবির অধিক পরিচয় 'বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতা' হর্ম্যগুলির সহিত; এবং কবি পথিকবধূ এবং জনপদবধূগণের কথা যতই বলুন, মেঘকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন,—

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি॥ (মেঘদূত)

'তুমি উত্তর দিকে প্রস্থান করিয়াছ, সুতরাং তোমার পথ একটু বক্র হইবে,—তথাপি উজ্জয়িনীর সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখ হইও না, সেখানকার পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিত লোলাপাঙ্গের সহিত যদি রমণ না কর তবে তুমি চক্ষুদ্বারাই বঞ্চিত হইলে।'

অবশ্য আদিম জীবনের সজীবতা ও বলিষ্ঠতাকে আমরা কালিদাসের যুগে আশা করিতে পারি না। কালিদাসের যুগে সমাজ-বন্ধন মনুর শাসনের দ্বারা দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ছিলেন সেই যুগের কবি যখন নিয়মনিষ্ঠ রাজার শাসনগুণে প্রজাগণ মনুর কাল হইতে প্রচলিত বিধিমার্গকে অনুমাত্র অতিক্রম করিত না—যেমন সুনিপুণ সারথি-চালিত রথের চক্র অগ্রনেমির রেখামাত্র অতিক্রম করে না।—

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥
(রঘু—১।১৭)

কালিদাসের কবি-কল্পনাও যে এই মনুশাসিত সমাজের নেমি-বৃত্তের দ্বারা খানিকটা শাসিত হইয়াছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এই জন্যই কালিদাসের কাব্যে জীবনের সহজ প্রকাশ কম।

কিন্তু কালিদাসের কাব্যে—বিশেষ করিয়া 'রঘুবংশে' বাল্মীকির কাব্যের অনুরূপ জীবনের বাস্তবতা ও বলিষ্ঠতার অভাব আছে বলিয়া

এ-কাব্য একান্ত প্রাণহীন বা দুর্বল নহে। জীবনের বাস্তবতা ও বলিষ্ঠতার অভাবকে কালিদাস পূরণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহার কবি-কল্পনার বলিষ্ঠতা ও বিরল কারুনৈপুণ্যের দ্বারা। তা ছাড়া কালিদাসের কাব্যে জীবনের সজীবতা নাই—কিন্তু ঐশ্বর্য আছে। এ ঐশ্বর্য সর্বদা বহিরৈশ্বর্য নহে—আন্তরৈশ্বর্যও একান্ত অপ্রচুর নহে। জীবনের এই ঐশ্বর্য উপযুক্ত বর্ণনার ভিতরে একটা চিত্তপ্রসারী মহিমাকে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। রঘুবংশের প্রারম্ভেই এই ঐশ্বর্যের পরিচয় রহিয়াছে। সেখানে 'রঘুবংশের' যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় রহিয়াছে, ভাষায় ছন্দে—বচন-ভঙ্গীতে—আভিজাত্যে—সে সমুদ্রের ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতনই পাঠকের চিত্ততটে আসিয়া আঘাত করিতে থাকে।

> সো ঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্মণাম্।
> আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্॥
> যথাবিধি-হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চিতার্থিনাম্।
> যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্॥
> ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
> যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্॥
> শৈশবে ঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
> বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥[১]

এমনি করিয়া রঘুগণের যে বর্ণনা চলিতে লাগিল তাহার ভিতর দিয়া আমরা রঘুগণের বাস্তব জীবনের যাথার্থ্যকে লাভ না করিতে পারি,

(১) "সেই আমি—যাঁহারা আজন্ম শুদ্ধ—যাঁহারা ফলোদয় না হওয়া পর্যন্ত কর্ম করেন—যাঁহারা আসমুদ্রক্ষিতির প্রভু—স্বর্গলোকেও যাঁহাদের রথের গতি—যাঁহারা যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন—অর্থীদিগকে যথাকাম

কিন্তু সব জুড়িয়া একটা ঐশ্বর্য—একটা মহিমাই এখানে প্রধান লাভ। ইহার পরেই এই রঘুবংশীয় রাজা দিলীপের যে বর্ণনা দেখিতে পাই তাহার ভিতরে অতিশয়োক্তির ফলে দিলীপের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য যতই মুছিয়া যাক না কেন, একটা ব্যক্তি-বিয়োজিত রাজ-মহিমা এবং সেই রাজ-মহিমাকে প্রকাশ করিবার বচন-চাতুর্য সেখানে চিত্তের ভিতরে একটা গভীর চমৎকৃতি দান করে।

ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাশ্রিতঃ॥
সর্বাতিরিক্তসারেণ সর্বতেজোঽভিভাবিনা।
স্থিতঃ সর্বোন্নতেনোর্বীং ক্রান্ত্বা মেরুরিবাত্মনা॥
আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ॥
ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥
... ...
প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

অর্চিত করিতেন—অপরাধীর যথাবিধি দণ্ডদান করিতেন—যথাকালে (স্বীয় কর্তব্যে) প্রবোধিত হইতেন,—যাঁহারা ত্যাগের জন্যই অর্থ সঞ্চয় করিতেন—সত্যের জন্য মিতভাষী ছিলেন, যশের জন্য বিজয় যাত্রা করিতেন—সন্তানের জন্যই দার পরিগ্রহণ করিতেন,—যাঁহারা শৈশবে বিদ্যা অভ্যাস করিতেন—যৌবনে বিষয় ভোগ করিতেন—বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন এবং অন্তকালে যোগদ্বারা তনুত্যাগ করিতেন—(এমন রঘুগণের অন্বয় বর্ণনা করিব)।

সেনা পরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনম্।
শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্বী ধনুষি চাততা॥
তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব॥
জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥
জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।
অনাকৃষ্টস্য বিষয়ৈর্বিদ্যানাং পারদৃশ্বনঃ।
তস্য ধর্মরতে রাসীদ্ বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা॥
প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

(রঘু—১।১৩-১৬, ১৮-২৪)

এইরূপে শ্লোকের পর শ্লোকে কালিদাস অপূর্ব বাগ্বৈদগ্ধ্যে যাঁহার বর্ণনা করিতে লাগিলেন তিনি একটি বিশেষ দেশ-কালের একজন রক্তমাংসের দেহধারী রাজা নহেন, তিনি কালিদাসের চিত্তভূমিতে জাত একটি রাজ-মহিমার বিগ্রহবান্ প্রতীক মাত্র। তাঁহার বিশাল বক্ষ, বৃষের ন্যায় স্কন্ধ,—তিনি শালপ্রাংশু, মহাভুজ; তাঁহার আত্মকর্মক্ষম দেহ—যেন মূর্তিমান ক্ষাত্র ধর্ম। তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সারবান্, সর্বতেজের অভিভবকারী, সর্বাপেক্ষা উন্নত—এই হেতু তিনি যেন পৃথিবীকে আক্রমণ করিয়া মেরু পর্বতের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। আকারসদৃশ ছিল তাঁহার প্রজ্ঞা—প্রজ্ঞার সদৃশ আগম—আগমের সদৃশ কর্মারম্ভ—আরম্ভের সদৃশ ফলোদয়। ভয়ানক আবার

কমনীয় নৃপগুণ সকলের দ্বারা তিনি আশ্রিতগণের নিকট অধৃষ্যও ছিলেন—আবার অভিগম্যও ছিলেন—যেমন জলজীবগণের নিকটে রত্নসমাকীর্ণ অর্ণব। প্রজাগণেরই মঙ্গলার্থে তিনি তাহাদের নিকট হইতে দান (কর) গ্রহণ করিতেন—যেমন রস গ্রহণ করে রবি—সহস্রগুণে ফিরাইয়া দিবার জন্য। সেনা তাঁহার পরিচ্ছদের ন্যায় ভূষণমাত্র ছিল; শাস্ত্রে অকুণ্ঠিতা বুদ্ধি এবং ধনুকে সংযোজিত জ্যা—এই দুইটি দ্বারাই তাঁহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইত। তাঁহার এমন মন্ত্রগুপ্তি ছিল এবং আকার ইঙ্গিত এমন গূঢ় ছিল যে কেহই কিছু বুঝিতে পারিত না; অতএব তাঁহার প্রারম্ভ সকল—অর্থাৎ সকল কর্মানুষ্ঠান প্রাক্তন সংস্কার সমূহের ন্যায় শুধু ফলের দ্বারাই অনুমেয় হইত। তিনি অত্রস্তভাবে আত্মরক্ষা করিতেন, অনাতুরভাবে ধর্মোপার্জন করিতেন, অগৃধ্নু হইয়া অর্থ গ্রহণ করিতেন, অনাসক্ত হইয়া সুখ ভোগ করিতেন। জ্ঞান সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মৌনী, শক্তিসত্ত্বে ছিলেন ক্ষমাশীল, ত্যাগে ছিলেন শ্লাঘাবিবর্জিত; এইরূপ পরস্পর বিরোধী গুণসমূহ তাঁহার শরীরে সহোদরের ন্যায়ই বাস করিত। প্রজাগণের শিক্ষা বিধানে—রক্ষণ এবং ভরণপোষণের হেতু তিনিই ছিলেন তাহাদের সকলের পিতা—তাহাদের নিজেদের পিতৃগণ শুধু ছিলেন জন্মের হেতু মাত্র।—এমনি করিয়াই চলিয়াছে রাজার মহিমা বর্ণনা; সে বর্ণনার ভিতরে অযথার্থতা যতই থাক না কেন—চমৎকৃতির কোন অসদ্ভাব নাই।

রঘুবংশের দ্বিতীয়সর্গে রাজা দিলীপ কর্তৃক বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীর চারণের বর্ণনার ভিতরেও এই জাতীয় একটা গম্ভীর মহিমার ব্যঞ্জনা রহিয়াছে—সে মহিমা শুধু রাজার নহে, হোমধেনুরও।

তারপরে সকল অলৌকিকতা সত্ত্বেও একটা সজীবতা লাভ করিয়াছে মায়াসিংহ এবং রাজা দিলীপের সুদীর্ঘ কথোপকথন; বর্ণনাগুণে এখানে এমন একটি ওজোগুণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাহা বাস্তবধর্মী না হইলেও চিত্ত-প্রসারী।

অনেকস্থলে দেখা যায়, কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের (বাল্মীকির রামায়ণের সহিত তুলনায় আলোচনা প্রসঙ্গে এই কাব্যখানিকেই আমরা বিশেষভাবে গ্রহণ করিতেছি) চমৎকৃতি বহুস্থানেই নির্ভর করিতেছে বর্ণনীয় বিষয়ের উপরে ততটা নহে যতটা বর্ণনার চমৎকৃতির উপরে। এই বর্ণনার ভিতরে কবি যে কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন তাহা যেমন মৌলিক তেমনই বলিষ্ঠ। একটি ছোট দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। রামচন্দ্রের তিরোভাবের পর জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ অযোধ্যা নগরী ত্যাগ করিয়া কুশাবতীতে রাজ্য স্থাপন করেন। একদিন অর্ধরাত্রে দীপশিখা স্তিমিত হইলে এবং নগরীর সকল লোক সুপ্ত হইলে কুশ সহসা প্রবুদ্ধ হইল এবং বিরহবেশধারিণী অদৃষ্টপূর্ব এক রমণীকে দর্শন করিলেন। এ রমণী পরিত্যক্ত অযোধ্যাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পরিত্যক্ত নগরীর দুরবস্থা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই মহারাজ কুশের সম্মুখস্থ হইয়াছেন। কবি এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুখে ঐশ্বর্যশালিনী পুরাতন অযোধ্যা এবং পরিত্যক্তা শ্রীহীন অযোধ্যার ভিতরকার পার্থক্য বর্ণনার জন্য একটি অপূর্ব এবং বলিষ্ঠ কবি-কৌশল গ্রহণ করিলেন। বর্ণনায় প্রত্যেকটি শ্লোকের ভিতরে দৃশ্য এবং ঘটনার এমন কতগুলি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে, সেই দ্বন্দ্বে প্রাচীন এবং বর্তমান অযোধ্যার ভিতরকার দ্বন্দ্বটাও একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। দেবী বলিতেছেন—

নিশাসু ভাস্বৎকলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চরো ২ভূদভিসারিকাণাম্।
নদনমুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ
স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ॥ ১৬।১২

পূর্বে যামিনীযোগে সমুজ্জ্বল নূপুরের কলগুঞ্জনধ্বনি সহকারে অভিসারিকাগণ যে রাজপথ দিয়া নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিত, এখন সেই রাজপথে সশব্দ মুখনিঃসৃত উল্কাপ্রভার সাহায্যে মাংসের অনুসন্ধানকারী শিবাগণের আনাগোনা চলিতেছে।

আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈ-
র্মৃদঙ্গধীরধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ
শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্॥ (১৬-১৩)

যে নির্মল জল বিলাসিনী প্রমদাগণের করাগ্র দ্বারা আস্ফালিত হইয়া মৃদঙ্গের ধীর গম্ভীর ধ্বনির অনুকরণ করিত, আজ সেই দীর্ঘিকার জল বন্য মহিষগণের শৃঙ্গদ্বারা আহত হইয়া যেন ক্রোশ-ধ্বনির অনুকরণ করিতেছে।

সোপানমার্গেষু চ যেষু রামাঃ
নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যো হতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং
ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে॥ (১৬।১৫)

যে সমস্ত সোপান-পথে রমণীগণ অলক্তসিক্ত রক্তিম চরণ যুগল নিক্ষিপ্ত করিত, আমার সেই সোপানাবলীতে এখন সদ্যমৃগবধকারী ব্যাঘ্রগণ রুধিরলিপ্ত পদ স্থাপন করিতেছ।

চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ
করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্নকুম্ভাঃ
সংরব্ধসিংহপ্রহৃতং বহন্তি ॥ (১৬।১৬)

চিত্রপটে অঙ্কিত যে সকল করী পদ্মবন হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং করেণু কর্তৃক দত্ত মৃণাল খণ্ড গ্রহণ করিয়াছে, এখন সিংহগণের (যাহারা এই চিত্রদ্বিপগুলিকে জীবিত বলিয়া মনে করিয়াছে) নখাঙ্কুশের আঘাতে ভিন্নকুম্ভ হইয়া তাহারা কুপিত সিংহের প্রহার বহন করিতেছে।

স্তম্ভেষু যোষিৎপ্রতিযাতনানা-
মুৎক্রান্তবর্ণক্রমধূসরাণাম্।
স্তনোত্তরীয়াণি ভবন্তি সঙ্গা-
ন্নির্মোকপট্যঃ ফণিভির্বিমুক্তাঃ ॥ (১৬।১৭)

কালক্রমে বর্ণবিন্যাস বিলুপ্ত হওয়ায় ধূসরতা প্রাপ্ত, স্তম্ভোপরি বিন্যস্ত দারুময়ী স্ত্রী প্রতিকৃতি সমূহের উপর ভুজঙ্গনির্মুক্ত নির্মোক সকল পতিত হইয়া স্তনাবরণের কাজ করিতেছে।

আবর্জ্য শাখাঃ সদয়ঞ্চ যাসাং
পুষ্পাণ্যুপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ।
বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ
ক্লিশ্যন্ত উদ্যানলতা মদীয়াঃ ॥ (১৬।১৯)

বিলাসিনীগণ যে সকল বৃক্ষশাখা অতি সদয় ভাবে আনত করিয়া তাহাদের কুসুম চয়ন করিত এখন বন্য পুলিন্দগণের ন্যায় বানরেরা আমার সেই উপবন-লতা ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে।

রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ
কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি।
তিরস্ক্রিয়ন্তে কৃমিতন্তুজালৈ-
র্বিচ্ছিন্নধূম-প্রসরা গবাক্ষাঃ॥ (১৬।২০)

রাত্রিতে এখন আর আমার গবাক্ষগুলিতে দীপভাস দেখা যায় না—দিবসেও রমণীমুখকান্তি শোভিত হয় না—এখন আর এই গবাক্ষদ্বার দিয়া সুগন্ধি ধূম নিঃসৃত হয় না—এখন শুধু সেখানে কৃমিকুল তন্তুজাল বিস্তার করিতেছে।

এই বর্ণনার ভিতর দিয়া সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যা এবং হতশ্রী অযোধ্যার যে দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা শুধু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, তাহার ভিতরে কবি-কল্পনার একটা অসামান্য বলিষ্ঠতার পরিচয় রহিয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে বোঝা যাইবে, কালিদাসের কাব্যে—বিশেষ করিয়া রঘুবংশে বলিষ্ঠতা এবং ওজোগুণের যে একান্ত অভাব রহিয়াছে তাহা নহে—কিন্তু বাল্মীকির কাব্যের বলিষ্ঠতা এবং কালিদাসের কাব্যের বলিষ্ঠতা ভিন্নধর্মী এবং এই ভিন্নধর্মের পশ্চাতে যে বিভিন্ন যুগের পার্থক্য রহিয়াছে তাহাকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

বাল্মীকির যুগ আরণ্য কৃষিসভ্যতার যুগ। তখন পর্যন্তও মানুষ বন কাটিয়া চারিদিকে নগর পত্তন শেষ করে নাই,—বনের সহিত জনপদের মিলন নিবিড় ছিল। এই জনপদজীবন এবং আরণ্যজীবনের মিলনেই গড়িয়া উঠিয়াছে সকল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই মিলন এবং মিলনজাত বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের ইতিহাসই

রহিয়াছে বাল্মীকির কাব্যে। অরণ্যের বিরাট বিরাট শালবৃক্ষ কাটিয়া তখন জনপদের পত্তন করিতে হইত; গৈরিক ধাতুপূর্ণ পার্বত্য ভূমিতে জনবসতির ব্যবস্থা করিতে হইত। বাল্মীকির কাব্যের উপমাগুলির ভিতরেই এই অর্ধ-আরণ্য জীবনের পরিচয় রহিয়াছে। মৃত দশরথের বর্ণনা করিতে কবি বলিতেছেন,—

তমার্তং দেবসঙ্কাশং সমীক্ষ্য পতিতং ভুবি।
নিকৃত্তমিব সালস্য স্কন্ধং পরশুনা বনে॥ (অ ৭২।২২)

ভূমিতে পতিত আর্ত দেবসঙ্কাশ দশরথ যেন কুঠারচ্ছিন্ন বনের শালস্কন্ধ। লঙ্কার বর্ণনা দিতেও কবি বলিতেছেন—

মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণং
শ্রিয়া জ্বলন্তং বহুরত্নকীর্ণম্।
নানাতরূণাং কুসুমাবকীর্ণং
গিরেরিবাগ্রং রজসাবকীর্ণম্॥ (সু ৭।৬)

বহুরত্নকীর্ণা লঙ্কা যেন নানা তরুগণের কুসুমাবকীর্ণ ধূলিকীর্ণ গিরিশৃঙ্গ। এই আরণ্য-জীবনে মানুষকে সর্বদা হিংস্র আরণ্য পশুগণের সংস্পর্শে আসিতে হইত: বাল্মীকির উপমাগুলির ভিতরে তাই বনের সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ, সর্প প্রভৃতি চারিদিকে ভিড় করিয়া আছে। বাল্মীকির বর্ণনায় দেখিতে পাই, ক্রুদ্ধ বীরগণ অনেক স্থানেই 'নিশ্বসন্ ইব পন্নগঃ'। রাজগৃহ হইতে বহিরাগত রামচন্দ্র 'পর্বতাদিব নিষ্ক্রম্য সিংহো গিরিগুহাশয়ঃ' (অ ১৬।২৬); বিজন পার্বত্য বনে নির্ভয়ে শায়িত রামলক্ষ্মণ দুই ভাই—

ততস্তু তস্মিন্ বিজনে মহাবলৌ
মহাবনে রাঘব-বংশ-বর্ধনৌ।

> ন তৌ ভয়ং সম্ভ্রমমভ্যুপেয়তু
> র্যথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ ॥ (অ ৫৩।৩৫)

গিরিসানুগোচর দুইটি সিংহের ন্যায় মহাবল দুই ভাই নিঃশঙ্ক ভাবেই নিদ্রামগ্ন ছিল। বনমধ্যে বাষ্পশোকপরিপ্লুত রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণ যখন কথা বলিয়াছিল তখন—

> অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্ ॥
> (আরণ্য ২।২২)

রুদ্ধ হস্তীর ন্যায় শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ তাহার কথা বলিয়াছিল।

মৃত দশরথকে দেখিয়া কৌশল্যা এবং সুমিত্রা যখন শোক করিতেছিল তখন তাহারা—

> করেণব ইবারণ্যে স্থানপ্রচ্যুতযূথপাঃ। (অ-৬৫।২১)

যূথপতি মহাগজ স্থানভ্রষ্ট হইলে অরণ্যে অসহায়া করেণুগণের মত।[১] অশোকবনে সীতাকে রাবণ যখন কিছুতেই বশে আনিতে পারিতেছিল না তখন সে দুরন্ত রাক্ষসীগণকে আদেশ দিয়া গিয়াছিল,—

> তত্রৈনাং তর্জনৈর্ঘোরৈঃ পুনঃ সান্ত্বৈশ্চ মৈথিলীম্।
> আনয়ধ্বং বশং সর্বা বন্যাং গজবধূমিব ॥ (আর-৫৬।৩১)

---

(১) তুলনীয়—

> যূথভ্রষ্টামিবৈকাং মাং হরিণীং পৃথুলোচন।
> মহাভারত, নলোপখ্যান, বনপর্ব, ৫২।২৪
> (পি. পি. এস্. শাস্ত্রীর সংস্করণ)

'এই মৈথিলীকে কখনও ঘোর তর্জনের দ্বারা, পুনরায় সান্ত্ববাক্য দ্বারা বন্যা গজবধূর মত বশে আনয়ন কর।' তখন—

সা তু শোকপরীতাঙ্গী মৈথিলী জনকাত্মজা।
রাক্ষসীবশমাপন্না ব্যাঘ্রীণাং হরিণী যথা॥ (ঐ ৫৬।৩৪)

সেই শোকপরীতাঙ্গী জনক দুহিতা সীতা হরিণী যেরূপ ব্যাঘ্রিণী-গণের বশ্যতা স্বীকার করে সেইরূপ রাক্ষসীগণের বশ্যতা স্বীকার করিল।

হনূমান্ প্রথম যখন লঙ্কাপুরীতে সীতাকে দেখিয়াছিল তখন সীতাকে দেখাইতেছিল—

গৃহীতাং লাড়িতাং স্তম্বে যূথপেন বিনাকৃতাম্।
নিশ্বসন্তীং সুদুঃখার্তাং গজরাজবধূমিব॥ (সু-১৯।১৮)

সীতা একটি গজরাজবধূর ন্যায়,—সে ধৃত হইয়াছে, উৎপীড়িত হইতেছে, যূথপতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে—আর গভীর দুঃখে আর্ত হইয়া শুধু নিশ্বাস ফেলিতেছে। রাবণকর্তৃক অপহৃতা সীতার সন্ধান লাভে ব্যর্থকাম অবসাদগ্রস্ত রামের কথা বলিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,—

পঙ্কমাসাদ্য বিপুলং সীদন্তমিব কুঞ্জরম্। (আরণ্য—১।১৩)

কর্দমের মধ্যে যেন বিষণ্ণ একটি বিপুল হাতী।[১]

(১) উবাচ রামং সংপ্রেক্ষ্য পঙ্কলগ্ন ইব দ্বিপঃ॥ (কি-১৮।৫১)
গাঙ্গে মগতি তোয়ান্তে প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্। (সু-১০।২৮)
তুলনীয়—ভর্তুঃ সীদতি মে চেতো নদীপঙ্ক ইব দ্বিপঃ॥
বুদ্ধচরিত—অশ্বঘোষ, ৬.২৬
তুলনীয়—ততঃ ক্ষিপ্তমিবাত্মনং দ্রোপদ্যা স পরংতপঃ।
নামৃষ্যত মহাবাহুঃ প্রহারমিব সদ্গজঃ॥
মহাভারত—বনপর্ব, ১৩৩।৩২

রাবণ একস্থানে স্ূর্পণখাকে বলিয়াছিল—

অযুক্তচারং দুর্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্।
বর্জয়ন্তি নরা দূরান্নদীপঙ্কমিব দ্বিপাঃ॥ (আরণ্য—৩৩।৫)

'অযুক্তচার দুর্দর্শ অস্বাধীন রাজাকে সকল লোকে সেইরূপই বর্জন করে, যেমন হস্তিগণ দূর হইতেই এড়াইয়া চলে নদীপঙ্ককে।'

এই সকল বর্ণনা এবং উপমাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হইবে, এগুলির ভিতরে কবির সমসাময়িক আরণ্য জীবনের ছাপ পড়িয়াছে।

বাল্মীকির যুগে কৃষিই ছিল প্রধান বৃত্তি। বৈদিকযুগে যে কৃষিযুগের পত্তন ঘটিয়াছিল তাহারই একটা পরিণতি দেখিতে পাই বাল্মীকির যুগে। তাই মহাকবির বর্ণনায় কৃষিসম্বন্ধীয় বহু উপমা বর্তমান। যুবরাজ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প লইয়া দশরথ বলিতেছেন,—

বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্বভূতানুকম্পকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্॥ (অ-১।২৮)

'সর্বভূতানুকম্পক, লোকের বৃদ্ধিকাম রাম বৃষ্টিমান্ মেঘের ন্যায় আমা হইতেও সকলের নিকট প্রিয়তর!' রাম ব্যতীত রাজ্য দশরথের নিকট 'শস্যং বা সলিলং বিনা' (অ-১২।১৩)। লঙ্কার অশোকবনে হনূমান্‌কে দেখিয়া সীতা বলিয়াছিল,—

ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রিয়বক্তারং সংপ্রহৃষ্যামি বানর।
অর্ধসঞ্জাতশস্যেব বৃষ্টিং প্রাপ্য বসুন্ধরা॥ (সু-৪০।২)

'হে বানর, প্রিয়বক্তা তোমাকে দেখিয়া আমি সেইভাবে প্রহৃষ্ট হইয়াছি, যেমন প্রহৃষ্ট হয় অর্ধসঞ্জাতশস্যা বসুন্ধরা বৃষ্টিকে পাইয়া।'

মারীচ যখন রাবণকে সদুপদেশ দান করিয়াছিল, তখন রাবণ বলিয়াছিল যে মারীচের—

বাক্যং নিষ্ফলমত্যর্থং বীজমুপ্তমিবোখরে ॥ (আ-৪০।৩)

'অতিশয় অর্থযুক্ত হইলেও তপ্তপাত্রে উপ্ত বীজের ন্যায় তাহার বাক্য একেবারেই নিষ্ফল।'

এই কৃষিযুগে গোধনই ছিল শ্রেষ্ঠ ধন। রাবণ বিভীষণকে বলিয়াছিল,—

বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্।
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ॥ (যু-১৬।১)

গাভীতেই ছিল সম্পদ—তাই গাভী এবং বৃষের উপমা বাল্মীকির সমগ্র রামায়ণে ছড়াইয়া আছে। দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন,—

যথা হ্যপালাঃ পশবো যথা সেনা হ্যনায়কাঃ।
যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্॥
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা ন দৃশ্যতে। (অ-১৪।৫৪-৫৫)

যেমন পালহীন পশুগণ, যেমন নায়কহীন সেনা,—যেমন চন্দ্রবিনা রাত্রি, যেমন বৃষ বিনা গাভী, সেইরূপই হয় রাষ্ট্রের অবস্থা—যেখানে কোন রাজা দেখা যায় না।[১]

রামচন্দ্র যেদিন বনে গমন করিল তখন—

ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ। (অ ২০।৬)

---

(১) যথা হ্যনুদকা নদ্যো যথা বাপ্যতৃণং বনম্।
অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্॥ (অ-৬৭।২৯)

রামহীন সকল মহিষী যেন বিবৎসা ধেনু।[১]

কৌশল্যা রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

কথং হি ধেনুঃ স্ববৎসং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি যত্র বৎস গমিষ্যসি॥ (অ ২৪।৯)

'বৎস যে দিকে যায় ধেনু যেমন তাহাকেই অনুগমন করে, আমিও সেইরূপ তুমি যেখানে যাইবে সেইখানেই তোমার অনুগমন করিব!'

হনূমান্ যেদিন সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞান মণি লইয়া রামের নিকট পৌঁছিয়াছিল সেদিন সেই মণি দর্শনে রামচন্দ্র সুগ্রীবের নিকট বলিয়াছিল—

যথৈব ধেনুঃ স্রবতি স্নেহাদ্বৎসস্য বৎসলা।
তথা মমাপি হৃদয়ং মণিশ্রেষ্ঠস্য দর্শনাৎ॥ (সু-৬৬।৩)

'বৎসলা গাভী যেমন বৎস অবলম্বন করিয়া স্নেহবশত দুগ্ধ স্রবণ করে, এই মণিশ্রেষ্ঠকে অবলম্বন করিয়া আমার হৃদয়ও তদ্রূপ হইতেছে।'

এই কৃষি-সভ্যতার নিদর্শন অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে রাণী কৌশল্যার একটা উক্তিতে। রামচন্দ্রের বনগমনের পর বিষণ্ণ দশরথকে লক্ষ্য করিয়া কৌশল্যা বলিতেছেন,—

কদাযোধ্যাং মহাবাহুঃ পুরীং বীরঃ প্রবেক্ষ্যতি।
পুরস্কৃত্য রথে সীতাং বৃষভো গোবধূমিব॥ (অ-৪৩।১২)

'বৃষভ যেমন গোবধূকে সম্মুখে রাখিয়া আগমন করে, সেইরূপে মহাবাহু রাম কবে আবার রথে সীতাকে সম্মুখে রাখিয়া অযোধ্যাপুরীতে

(১) ততঃ সবাষ্পা মহিষী মহীপতেঃ প্রণষ্টবৎসা মহিষীব বৎসলা।
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ৮।২৪

প্রবেশ করিবে!' একান্ত কৃষিসভ্যতার যুগ না হইলে মায়ের পক্ষে পুত্র এবং পুত্রবধূকে বৃষ এবং গোবধূর সহিত উপমিত করা সম্ভব হইত না, শোভনও হইত না। এ উপমা আমাদের যুগে একেবারেই অচল। কালিদাসের যুগেও চলিত না,—অন্ততঃ কোথাও চলে নাই; 'বৃষস্কন্ধঃ' পর্যন্ত চলিত—অধিক চলিত না; কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের সকল পারিপার্শ্বিকতার ভিতরে উপমাটি আশ্চর্যরূপে মানাইয়া গিয়াছে। গাভী সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ বর্ণনা কালিদাসের অনেক আছে। দিলীপ রক্ষিত বশিষ্ঠের হোমধেনু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—

পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রাং
জুগোপ গোরূপধরামিবোর্বীম্ ॥ (রঘু-২।৩)

দিলীপ গোরূপধরা পৃথিবীকেই যেন রক্ষা করিয়াছিলেন, পৃথিবীর চারিটি সমুদ্র যেন হোমধেনুর চারিটি বাঁটযুক্ত পয়োধরে পরিণত হইয়াছিল। সন্ধ্যায় এই হোমধেনু যখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিত তখন—

সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি
কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।
প্রচক্রমে পল্লবরাগতাম্রা
প্রভা পতঙ্গস্য মুনেশ্চ ধেনুঃ ॥ (রঘু-২।১৫)

এখানে মুনির হোমধেনুকে সূর্যপ্রভার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সূর্যপ্রভাও সারাদিন সকল দিগ্‌দিগন্তকে তাপ দ্বারা পূত করিয়াছে, ধেনুও তাহার প্রচরণের দ্বারা দিগন্তর পূত করিয়াছে; দিনান্তে সূর্যপ্রভাও পল্লবরাগ-তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, ঋষির ধেনুটিও পল্লবরাগ-তাম্রা। সূর্যপ্রভা আপন নিলয়ে চলিল—ঋষির ধেনুটিও

আশ্রমে চলিল। তার পরে মধ্যম লোকপাল দিলীপ যখন ধেনুর অনুগমন করিতে লাগিলেন তখন—

বভৌ চ সা তেন সতাং মতেন
শ্রদ্ধেব সাক্ষাদ্ বিধিনোপপন্না॥ (রঘু-২।১৬)

সাধুজনের বহুমান্য রাজা কর্তৃক অনুসৃত হইয়া গাভীটি বিধিযুক্তা মূর্তিমতী শ্রদ্ধার মত শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ দিলীপ ধেনুটির পশ্চাতে আসিতেছেন—আর পার্থিবধর্মপত্নী সুদক্ষিণা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন,—

তদন্তরে সা বিররাজ ধেনু
র্দিনক্ষপামধ্যগতেব সন্ধ্যা॥ (ঐ ২।২০)

উভয়ের মাঝখানে পাটলবর্ণা ধেনুটি দিন ও রাত্রির মধ্যবর্তী সন্ধ্যার ন্যায় বিরাজমানা! কালিদাসের এই সকল বর্ণনার ভিতর দিয়া কালিদাসের বর্ণনার চমৎকৃতি এবং তৎসঙ্গে স্বর্গীয় কামধেনুসুতা ঋষির হোমধেনুরই মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু এই সকল বর্ণনার সহিত বাল্মীকির পূর্বোক্ত উপমাটির তুলনা করিলেই কালিদাসের যুগ এবং কাব্যপ্রতিভা এবং বাল্মীকির যুগ এবং কাব্যপ্রতিভার পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

এই গাভী এবং বৃষভের কথা কবির মনে জাগিয়া উঠিয়াছে বহু বর্ণনায়। রামচন্দ্রের শরে বালী নিহত হইলে—

হতে তু বীরে প্লবগাধিপে তদা
বনেচরাস্তত্র ন শর্ম লেভিরে।
বনেচরাঃ সিংহযুতে মহাবনে
যথা হি গাবো নিহতে গবাম্পতৌ॥ (কি ২২।৩১)

'বানরাধিপ বীর বালী হত হইলে বনেচর বানরগণ কিছুতেই সুখ বা স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছিল না ; তখন বনেচরদের অবস্থা গবাম্পতি নিহত হইলে সিংহযুক্ত মহাবনে গাভীদের অবস্থার ন্যায়।'[১] কবি যেখানে বর্ষাত্যয়ে শরতের বর্ণনা দিতেছেন সেখানেও—

শরদ্ গুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ
প্রহর্ষিতাঃ পাংশুসমুত্থিতাঙ্গাঃ।
মদোৎকটাঃ সম্প্রতি যুদ্ধলুব্ধা
বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি ॥ (কি-৩০।৩৮)

'শরৎগুণে বৃষগুলির রূপশোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে, বৃষগুলি অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া সমস্ত দেহ ধূলিযুক্ত করিয়াছে, এবং সম্প্রতি মদোৎকট হইয়া যুদ্ধলুব্ধ বৃষগুলি গোরুগুলির মধ্যে গিয়া নাদ করিতেছে।'[২]

লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া হনূমান্ আকাশে চন্দ্রকে দেখিতে পাইয়াছিল।—

(১) তুঃ—অহং পুত্রসহায়া ত্বামুপাসে গতচেতনম্।
সিংহেন পাতিতং সদ্যো গৌঃ সবৎসেব গোবৃষম্॥ (কি-২৩।২৬)
তুঃ—বিবর্ণবক্ত্রা রুরুদুর্বরাঙ্গনা
বনান্তরে গাব ইবর্ষভোজ্ঝিতাঃ॥
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত—৮।২৩

(২) আরও :—বেণুস্বরব্যঞ্জিততূর্যমিশ্রঃ
প্রত্যূষকালেঽনিলসম্প্রবৃত্তঃ।
সংমূর্ছিতো গহ্বরগোবৃষাণা-
মন্যোঽন্যমাপূরয়তীব শব্দঃ॥ (কি-৩০।৫০)

ততঃ স মধ্যংগতমংশুমন্তং
জ্যোৎস্নাবিতানং মুহুরুদ্বমন্তম্।
দদর্শ ধীমান্ ভুবি ভানুমন্তং
গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব ভ্রমন্তম্॥ (সু ৫।৩)

'তাহার পর হনূমান্ (মধ্যরাত্রে) তারকামধ্যগত অংশুমান্ চন্দ্রকে দেখিতে পাইল; সে (চন্দ্র) প্রতিমুহূর্তে জ্যোৎস্নাবিতান বমন করিতেছিল, সূর্যসহযোগে প্রকাশবত্ত্ব লাভ করিয়া সে গোষ্ঠে মত্ত বৃষের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছিল।'

এইরূপে দেখিতে পাই সমুদ্রতিতীর্ষু হনূমান্ 'সমুদগ্রশিরোগ্রীবো গবাংপতিরিবাবভৌ' (সু ১।২)। এইরূপে বীর্যবান্ গবাক্ষ রাক্ষস 'গবাং দৃপ্ত ইবর্ষভঃ' (যু ৪।১৫)। রামচন্দ্র যখন আবার চতুর্দশবর্ষ পরে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিল তখন ভরত বলিয়াছিল,—

ধুরমেকাকিনা ন্যস্তাং বৃষভেণ বলীয়সা।
কিশোরবদ্ গুরুং ভারং ন বোঢ়ুমহমুৎসহে॥ (যু ১২৮।৩)

'বলবান্ বৃষভই যে জোয়াল বহন করিতে সমর্থ তাহাই আমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে; কিশোর বৃষের ন্যায় এই গুরুভারকে বহন করিতে আমার আর উৎসাহ নাই।'

বেদের বহু বর্ণনাও আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক ঋষিগণ গাভী ও বৃষের উপমায়ই বহু জিনিষকে বর্ণনা করিয়াছেন। ধন হিসাবে গাভী-বৃষের মূল্য তখন বাল্মীকির যুগের মূল্য অপেক্ষাও বেশী ছিল,—এই কারণেই বেদে গাভীবৃষের উপমার এত ছড়াছড়ি।

বিশ্ব-প্রকৃতির বর্ণনায় বা স্তবে বহুস্থলেই গাভী এবং বৃষের কথা ঋষিগণের মনে ভিড় করিয়াছিল। ইন্দ্রের স্তব-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ
সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥
(ঋক্ ১।৩২।২)

‘বৎসগণ যেরূপ ধেনুর প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ স্যন্দমান জলরাশি সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।’ ইন্দ্রই মেঘরূপ কালো গাভীকে দোহন করিতেন, এ-কথা বহুস্থানে দেখিতে পাই। আবার দেখি,—

বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি।
(ঋক্—১।৩৮।৮)

‘শব্দযুক্ত প্রস্তুত স্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জন করিতেছে; বৎসকে যেমন মাতা (গাভী) সেবা করে (সেইরূপ বিদ্যুৎ মরুদ্‌গণের সেবা করিতেছে)।’

বিপাশা (বিপাশ্) ও শতদ্রু (শুতুদ্রী) নদীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

গাবেব শুভ্রে মাতরা রিহাণে
বিপাট্‌ছুতুদ্রী পয়সা জবেতে ॥ (ঋক্-৩।৩৩।১)

দুইটি নদী বৎসলেহনাভিলাষিণী শুভ্র দুইটি গাভীর ন্যায় বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। জলবতী নদীর সহিত স্তনবতী গাভীর উপমা বেদের বহুস্থলে পাওয়া যায়। মাতা পৃথিবীকে বহুস্থানে গাভীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। দাবাগ্নিকে নির্ঘোষকারী বৃষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আবার বায়ুপ্রেরিত শব্দায়মান মেঘগুলিকে গর্জনকারী মহাবৃষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। (অথর্ব ৪।১৫।১)। এ-জাতীয় উপমা এবং বর্ণনা বেদে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না, অজস্র রহিয়াছে; সুতরাং আমরা আর বেশী উদ্ধৃতির সাহায্য গ্রহণ করিলাম না।

উপরি উক্ত আলোচনার ভিতর দিয়া বাল্মীকি ও কালিদাসের যুগ এবং উভয়ের কবিপ্রতিভার পার্থক্যের একটা আভাস পাওয়া যাইবে মনে হয়। 'রঘুবংশে'র প্রারম্ভে কালিদাস বাল্মীকি প্রভৃতি পূর্বসূরীর উল্লেখ করিয়া অবশ্য বলিয়াছেন—

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥ (১।৪)

কিন্তু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, বিষয়-বস্তুতে কালিদাস বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বাল্মীকি-রামায়ণে যেখানেই বিচিত্র চরিত্রের সমবায়ে এবং সংঘাতে জীবনের ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে কালিদাস তাহাকে দুই একটি শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া জনপদ এবং অরণ্যের সেই ভিড় এড়াইয়া চলিয়াছেন। তিনি শুধু প্রধান প্রধান কয়েকটি চরিত্র এবং বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ঘটনা বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং সেই প্রধান চরিত্র এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কবিকল্পনা প্রকাশের সুযোগ খুঁজিয়াছেন। ঘটনা-বহুল জীবনের ভিড় কবিকে এক স্থানে বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে দেয় না, ঠেলিয়া লইয়া চলে; কিন্তু কালিদাস এইরূপ ভিড়ের ঠেলা খাইয়া হটিবার পাত্র নহেন, যেখানে যেটুকু কবিকল্পনা ঢালিবার ইচ্ছা তাহা নিঃশেষ হইবার পূর্বে কবির সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলিবার কোন লক্ষণ কোথাও প্রকাশ পায় নাই। বাল্মীকি-রামায়ণের

বিষয়বস্তু কালিদাসে অতি সংক্ষিপ্ত,—তিনি আশেপাশেই রং ফলাইয়াছেন বেশী। বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্রের আরণ্য জীবন এবং সেই আরণ্য জীবনে আরণ্যক মুনি-ঋষি এবং পার্বত্য বন্য জাতিগুলির সহিত মিলন-সংঘাতই সর্বাপেক্ষা বেশী স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু কালিদাস বিদর্ভরাজদুহিতা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় সমাগত রাজপুত্রগণের রূপগুণ বর্ণনায় যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন, এই আরণ্য প্রাণিগণের বর্ণনায় কোথাও সে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। রামায়ণের গল্পাংশের ঠাসবুনানীর ভিতর দিয়া কালিদাস প্রায় দৌড়াইয়া চলিয়াছেন; কিন্তু তিনি থামিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এক জায়গায়—লঙ্কা হইতে রামসীতার বিমানযোগে প্রত্যাবতনের পথে সমুদ্র ও বনের উপরিভাগস্থ বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষলোকে কবি তাঁহার কবি-কল্পনাকে ঘোরফের করাইবার একটি সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিলেন, সুতরাং রঘুবংশের সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ সর্গটিতে চলিয়াছে শুধু রামসীতার প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা। এ বর্ণনার মূল বাল্মীকি-রামায়ণে থাকিলেও (দ্রঃ—যুদ্ধকাণ্ড ১২৩ সর্গ) এবং স্থানে স্থানে কালিদাসের বর্ণনা অতি ক্ষীণ ভাবে বাল্মীকিকে স্মরণ করাইয়া দিলেও[১] এ বর্ণনার চমৎকারিত্ব কালিদাসের কবিকল্পনার দান।

---

(১) তুঃ—এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে। রামায়ণ

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্। (রঘু)
পশ্য সাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়ম্॥
অপারমিব গর্জন্তং শঙ্খশুক্তিসমাকুলম্। (রামায়ণ)
ঊর্ধ্বাঙ্কুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ
ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযূথম্॥ (রঘু)

কালিদাসের কাব্য পাঠ করিতে করিতে স্থানে স্থানে অস্পষ্টভাবে বাল্মীকির স্মরণ হয়। যেমন রঘুবংশের প্রথম সর্গে দিলীপের বর্ণনা ও তাঁহার রাজত্বের বর্ণনা পড়িলে বালকাণ্ডে বাল্মীকি-বর্ণিত দশরথের বর্ণনা ও তাঁহার রাজত্বকালীন অযোধ্যার বর্ণনার কথা মনে পড়িয়া যায়। 'কুমার-সম্ভবে'র দ্বিতীয় সর্গে তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণের ব্রহ্মার নিকটে গমন এবং তারকাসুরের নিধন প্রার্থনার সহিত বাল্মীকি-বর্ণিত বালকাণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে রাবণ কর্তৃক উৎপীড়িত দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণের সমবেতভাবে ব্রহ্মার নিকট গমন ও রাবণের নিধন প্রার্থনার সহিত প্রায় পংক্তিতে

এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তি-
পর্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ। (ঐ)
এষা সা দৃশ্যতে পম্পা নলিনী চিত্রকাননা॥
ত্বয়া বিহীনো যত্রাহং বিললাপ সুদুঃখিতঃ। (রামায়ণ)
দূরাবতীর্ণা পিবতীব খেদা-
দমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ॥
অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্না-
মন্যোন্যদত্তোৎপলকেসরাণি।
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্তিনা তে
ময়া প্রিয়ে সস্পৃহমীক্ষিতানি॥ (রঘু)
আরও তুঃ—এতদ্গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদ্
আবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্।
নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ
ত্বদ্বিপ্রযোগাশ্রু সমং বিসৃষ্টম্॥ (রঘু)

পংক্তিতে মিল রহিয়াছে।[১] 'কুমার-সম্ভব' নামটিও বোধহয় কালিদাস বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] 'কুমার-সম্ভবে' বর্ণিত বসন্ত ও মদনসহায়ে উমার শিবের তপস্যাভঙ্গের চেষ্টা এবং ক্রুদ্ধ শিব কর্তৃক মদনভস্ম—ইহার সহিত রামায়ণ-বর্ণিত ইন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত রম্ভার বসন্ত ও মদনসহায়ে কঠোর তপস্যানিরত বিশ্বামিত্র মুনির ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা ও ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র কর্তৃক রম্ভাকে শাপদানের

(১) কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' দ্বিতীয় সর্গের সহিত তুলনীয়—

তাঃ সমেত্য যথান্যায়ং তস্মিন্ সদসি দেবতাঃ।
অব্রুবন্ লোককর্তারং ব্রহ্মাণং বচনং ততঃ॥
ভগবন্ ত্বৎপ্রসাদেন রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
সর্বান্নো বাধতে বীর্যাচ্ছাসিতুন্তং ন শক্নুমঃ॥
ত্বয়া তস্মৈ বরো দত্তঃ প্রীতেন ভগবংস্তদা।
মানয়ন্তশ্চ তন্নিত্যং সর্বং তস্য ক্ষমামহে॥
উদ্বেজয়তি লোকাংস্ত্রীনুচ্ছ্রিতান্ দ্বেষ্টি দুর্মতিঃ!
শক্রং ত্রিদশরাজানং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি॥
ঋষীন্ যক্ষান্ সগন্ধর্বান্ ব্রাহ্মণানসুরাংস্তথা।
অতিক্রামতি দুর্ধর্ষো বরদানেন মোহিতঃ॥
নৈনং সূর্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে॥
তন্মহন্নো ভয়ন্তস্মাদ্রাক্ষসাৎ ঘোরদর্শনাৎ।
বধার্থন্তস্য ভগবন্ উপায়ং কর্তুমর্হসি॥

(রামায়ণ, বালকাণ্ড, ১৫।৫-১১)

(২) দ্রঃ—এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
কুমার-সম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ॥ (বা-৩৭।৩১)

সাদৃশ্য রহিয়াছে। এখানেও ব্রীড়িতা এবং ভীতা রম্ভাকে উৎসাহিত করিয়া ইন্দ্র বলিতেছেন—

সুরকার্যমিদং রম্ভে কর্তব্যং সুমহত্ত্বয়া।
লোভনং কৌশিকস্যেহ কামমোহসমন্বিতম্॥

* * *

কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে।
অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ॥
ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্।
তমৃষিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্॥ (বাল ৬৪।১,৬-৭)

'কুমারসম্ভবে'র উমার জন্মদিনের বর্ণনা হয়ত রামায়ণের রামচন্দ্রের বিবাহ-দিনের বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে।[১]

কিন্তু মহাকবি কালিদাসের উপরে কবিগুরু বাল্মীকির প্রভাব আলোচনা করিতে গিয়া এই সকল অস্পষ্ট বা স্পষ্ট স্মরণকে অতি অকিঞ্চিৎকর এবং একান্ত বাহ্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই জাতীয় আলোচনায় আর প্রবেশ না করিয়া উভয় কবির কাব্যপ্রতিভার

---

(১) তু—
প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং
শঙ্খস্বনানন্তরপুষ্পবৃষ্টি।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং
সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব॥ (কুমারসম্ভব, ১।২৩)

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা।
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ॥
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্।
বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুতমদৃশ্যত॥ (বা ৭৩।৩৭-৩৮)

মৌলিক লক্ষণের ভিতরে যে গভীর মিল আছে তাহা লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। উভয় কবির কবিধর্মের মৌলিক পার্থক্য যেখানে, আমরা পূর্বে তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় কবির কবিধর্মে যে মিল রহিয়াছে তাহাও অতি গভীর। যে ইতিহাস উভয় কবির ভিতরে যুগের ব্যবধান ঘটাইয়া কবিধর্মের পার্থক্য ঘটাইয়াছে সেই ইতিহাসই আবার উভয় কবির ভিতরে একটি যোগসূত্রও রক্ষা করিয়াছে।

আমাদের বিচারে কালিদাসের কাব্যগুলি যে-সকল মহদ্‌গুণের জন্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাহার ভিতরে একটি প্রধান গুণ বহিঃ-প্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের গভীর যোগ এবং কাব্যের ভিতরে এই গভীর যোগের অনন্যসাধারণ প্রকাশ। প্রথমে এই দিক্ হইতেই কালিদাস এবং বাল্মীকির সাধর্ম্যবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

কালিদাসের কাব্যে বিশ্ব-প্রকৃতির বর্ণনা সম্বন্ধে সর্বপ্রথমেই একটা কথা আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে; তাহা এই যে, কবি তাঁহার কাব্যে বিশ্ব-প্রকৃতির জড় অংশটা এবং চেতন অংশের ভিতরে স্পষ্ট কোন ভেদ-রেখা টানিতে পারেন নাই,—সমস্ত কাব্যের ভিতরে জড় ও চেতনের একটা আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। এই মিলটির পশ্চাতে কবির নিছক একটি তত্ত্বদৃষ্টিই নাই, এ-মিল কবির কাব্যে সর্বত্রই এমন সহজ ভাবে দেখা দিয়াছে যে, কোথাও তাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন প্রশ্নই জাগে না।[১] কবি তাঁহার চিত্তের ভিতরে প্রকৃতির এমন একটি রাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যাহার

(১) দ্রঃ—'সাহিত্য-পরিচয়'—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১২৫-১৩০

ভিতরে জড়সত্তা এবং চেতনসত্তা ওতপ্রোতভাবে অন্বিত হইয়া আছে। কবির কাব্যের ভিতরে এইরূপ নিরন্তর জড় হইতে চেতনে বা চেতন হইতে জড়ে যাতায়াত করিতে আমাদের মনের কোনরূপ ক্লেশ নাই, এই যাতায়াত সম্বন্ধে আমরা কোথাও সচেতনও নহি। কালিদাসের 'রঘুবংশে' বর্ণিত সীতা যে ধরণী-দুহিতা ইহা একটা পূর্বলব্ধ সংস্কার মাত্র নহে; সীতাকে কবি নিজেও ধরণী-দুহিতা রূপেই দেখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা যেদিন নির্বাসিতা হইয়াছিল, জননী বসুন্ধরার সহিত সীতার নাড়ীর যোগ সেদিন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। কালিদাস বর্ণিত এই যোগ নিছক কবিকল্পনা না হইয়া বহু স্থানে জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার একটি সান্ত্বনা বাক্যের ভিতরে মাটির সহিত সীতার যোগ সহজ হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রম ঋষি সীতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন,—

পয়োঘটৈরাশ্রমবালবৃক্ষান্
সংবর্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্তনয়োপপত্তেঃ
স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম্॥ (রঘু, ১৪।৭৮)

'নিজের সামর্থ্যানুসারে পয়োঘটের দ্বারা আশ্রম বালবৃক্ষদিগকে সংবর্ধিত করিয়া তুমি অসংশয়ে পুত্রজন্মের পূর্বেই স্তনন্ধয়শিশু পালনের প্রীতি লাভ করিবে।'

কালিদাসের কাব্যে বালবৃক্ষ সর্বদাই এইরূপ স্তন্যপায়ী শিশু। তাই মায়া সিংহ রাজা দিলীপকে বলিয়াছিল,—

অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুং
পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।

যো হেমকুম্ভস্তননিঃসৃতানাং
স্কন্দস্য মাতুঃ পয়সাং রসজ্ঞঃ ॥
কণ্ডূয়মানেন কটং কদাচিৎ
বন্যদ্বিপেনোন্মথিতা ত্বগস্য ;
অথৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ
সেনান্যমালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ ॥ (রঘু, ২।৩৬-৩৭)

"সম্মুখে ঐ দেবদারু দেখিতেছ কি ? বৃষভধ্বজ শিব উহাকে নিজের পুত্র করিয়া লইয়াছেন। এই দেবদারু গাছ কুমার স্কন্দের মাতা পার্বতীর হেমকুম্ভরূপ স্তন হইতে নিঃসৃত দুগ্ধধারার আস্বাদ লাভ করিতে পারিয়াছে। একদিন একটি বন্যহস্তী গাত্র ঘর্ষণ করিয়া এই দেবদারুর ত্বক্ উন্মথিত করিয়া দিয়াছিল,—তাহাতে গিরিদুহিতা পার্বতী ইহার জন্য ঠিক তেমন করিয়াই শোক করিয়াছিলেন, যেমন শোক করিয়াছিলেন তিনি অসুরাস্ত্রে ক্ষত কার্তিকের জন্য।" আবার অন্যত্র দেখি,—

অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্
ঘটস্তনপ্রস্রবণৈর্ব্যবর্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং
ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি ॥ (কুমার-সম্ভব, ৫।১৪)

"অতন্দ্রিতা সে (উমা) নিজেই শিশু বৃক্ষগুলিকে ঘটস্তন প্রস্রবণের দ্বারা বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল ; এই পূর্বজাত পুত্রগুলির প্রতি (উমার) পুত্রবাৎসল্য স্বয়ং কুমার কার্তিকও হ্রাস করিতে পারিবে না।"[১]

(১) আরও তুলনীয়—

ভগবতো মহামুনেরগস্ত্যস্য ভার্যয়া লোপমুদ্রয়া স্বয়মুপরচিতালবালকৈঃ করপুট-সলিলসংবর্ধিতৈঃ সুতনির্বিশেষৈরুপশোভিতং পাদপৈঃ—ইত্যাদি। কাদম্বরী।

'কুমার-সম্ভবে'র প্রথমেই দেখিতে পাই, উত্তর দিকে অবস্থিত দেবতাত্মা নগাধিপ হিমালয়-পর্বতের বর্ণনা। এই হিমালয়ের পরিচয়ের ভিতরে পর্বত হিমালয়েরই কতগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃশ্য এবং ঘটনার বর্ণনা দেখিতে পাই। অনন্তরত্নপ্রভব হিমালয়ের কঠোর হিমের বর্ণনা আছে, ইহার শিখরস্থ গৈরিক ধাতুর রক্তিমা মেঘমালায় সংক্রামিত হইয়া অকালসন্ধ্যার ন্যায় অপ্সরাগণকে বিলাসভূষণ সম্পাদনে প্ররোচিত করে, এখানে তুষার পতনে রক্তবিন্দু ধৌত হইলেও কিরাতগণ নখরন্ধ্রমুক্ত গজমুক্তাফল দর্শনে গজহন্তা কেশরীদের পথ জানিতে পারে; এখানকার গুহামুখোত্থিত বায়ু কীচকরন্ধ্র পরিপূরিত করিয়া কিন্নরগণের সঙ্গীতে তান প্রদান করে, এখানে কপোলকণ্ডূয়ন নিবারণার্থ হস্তিগণ দেবদারু বৃক্ষ ঘর্ষণ করে, সেই ঘর্ষণ-নিঃসৃত নির্যাসের সুরভিগন্ধে সমস্ত সানুদেশ পরিপূর্ণ হয়। এই হিমালয় দিবাভীত অন্ধকারকে তাহার গুহার ভিতরে দিবাকরের হাত হইতে রক্ষা করে; চমরীমৃগগণ চন্দ্রকিরণগৌর লাঙ্গুল বিশেষের দ্বারা নগাধিরাজকে ব্যজন করে, মৃগান্বেষী কিরাতগণ এখানে ভাগীরথীর নির্ঝরকণাবাহী সমীরণের দ্বারা সেবিত হয়। এই হিমালয়েরই আদরিণী কন্যা উমা। পাষাণে-গড়া হিমালয়ের দিগন্তব্যাপী বিরাট কর্কশ দেহ, তবু পিতৃস্নেহের কোনও অভাব নাই। রুদ্রতেজে মদন ভস্মীভূত হইলে উমা যখন শোচনীয় পরাজয় লাভ করিল তখন পিতা আগাইয়া গিয়া রুদ্রকোপভয়হেতু মুকুলিতাক্ষী দুহিতাকে দুই বাহু বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন, এবং সুরগজ ঐরাবত যেমন করিয়া আদরে দন্তলগ্না পদ্মিনীকে বহন করে তেমন করিয়াই তাঁহার কর্কশ বুকে উমাকে লইয়া বেগে দীর্ঘীকৃতাঙ্গ হইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন।

সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা
দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিমাদায় দোর্ভ্যাম্।
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং
প্রতিপথগতিরাসীদ্ বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ॥

(কুমারসম্ভব, ৩।৭৬)

উমাকে যেখানে চিরন্তন সামাজিক বিধানে বিবাহ দিবার সময় আসিল সেখানে পিতা হিমালয়কেও সামাজিক জীব হইতে হইল। কালিদাস হিমালয়কে অতি কৌশলে পর্বত হিমালয়ও রাখিয়াছেন আবার তৎসঙ্গে সামাজিক জীবও করিয়া তুলিয়াছেন। যোগীশ্বর মহাদেবের বিবাহের ঘটক হইলেন সপ্তর্ষিগণ ; তাঁহারা সম্বন্ধের বার্তা লইয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন হিমালয়ের পুরী 'ওষধিপ্রস্থে'। এই 'ওষধিপ্রস্থ' নামটিই লক্ষণীয়। এই 'ওষধিপ্রস্থ'

গঙ্গাস্রোতঃপরিক্ষিপ্তং বপ্রান্তর্জ্বলিতৌষধি।
বৃহন্মণিশিলাসালং গুপ্তাবপি মনোহরম্॥
জিতসিংহভয়া নাগা যত্রাশ্বা বিলযোনয়ঃ।
যক্ষাঃ কিম্পুরুষাঃ পৌরা যোষিতো বনদেবতাঃ॥

(৬।৩৮, ৩৯)

এই পুরী গঙ্গাস্রোতদ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রাচীরের অভ্যন্তরে ওষধিগুলি প্রজ্বলিত হইয়াই দীপের কাজ করিতেছে ; বৃহৎ মণিশিলা খচিত ইহার প্রাচীর—গুপ্ত হইলেও মনোহর। এখানে হাতী গুলির আর সিংহের ভয় নাই, বিল হইতে অশ্ব জাত হয় ; যক্ষ এবং কিন্নর ইহার পৌরজন, বনদেবতারাই পুরকামিনী।—এমনি করিয়া কালিদাস 'ওষধিপ্রস্থে'র যে বর্ণনা করিলেন তাহা একটি পার্বত্য অঞ্চলও বটে—

আবার পুরীও বটে! এই 'ওষধিপ্রস্থে'র নাগরিক হিমালয় সপ্তর্ষির অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন—

নময়ন্ সারগুরুভিঃ পাদন্যাসৈর্বসুন্ধরাম্। (৬।৫০)

তাঁহার গুরুভার পাদন্যাসে বসুন্ধরাকে নমিত করিয়া আসিতেছিলেন! এই হিমবান্—

ধাতুতাম্রাধরঃ প্রাংশুর্দেবদারুবৃহদ্ভুজঃ।
প্রকৃত্যৈব শিলোরস্কঃ সুব্যক্তো হিমবানিতি॥ (৬।৫১)

তাঁহার ধাতুতাম্র অধর, উন্নত দেহ, দেবদারুর বিশালভুজ, প্রকৃতিতেই প্রস্তরের বক্ষ—তিনিই যে হিমবান্ ইহা সুব্যক্ত। হিমালয় মহর্ষিগণকে পাদ্য-অর্ঘ্যে অভ্যর্থিত করিয়া বলিলেন—

ভবৎসম্ভাবনোত্থায় পরিতোষায় মূর্ছতে।
অপি ব্যাপ্তদিগন্তানি নাঙ্গানি প্রভবন্তি মে॥
ন কেবলং দরীসংস্থং ভাস্বতাং দর্শনেন বঃ।
অন্তর্গতমপাস্তং মে রজসোঽপি পরং তমঃ॥ (৬।৫৯-৬০)

আপনাদের অনুগ্রহজন্য আনন্দ এত অপর্যাপ্ত হইয়াছে যে, আমার দিগন্তব্যাপী অঙ্গেও তাহার স্থান সঙ্কুলন হইতেছে না। জ্যোতির্ময় আপনাদের দর্শনের দ্বারা কেবল আমার গুহাস্থিত তমঃই দূরীভূত হইল না, আমার আভ্যন্তরীণ রজঃ (ধূলি এবং রজোগুণ) এবং তমঃও (অন্ধকার এবং তমোগুণ) দূরীভূত হইল।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এই হিমালয় পর্বতও বটে, সামাজিক জীবও বটে। কবি বলিয়াছেন যে, হিমালয়ের স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দুইটি রূপ আছে; এবং এই দুই রূপকে একত্রে মিলাইয়াই এখানে তিনি হিমালয়ের সকল বর্ণনা করিয়াছেন। আসলে

বিশ্ব-প্রকৃতিরই একটা স্থাবর রূপ এবং একটা জঙ্গম রূপ রহিয়াছে, এবং এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রকৃতি উভয় রূপকে এক করিয়া কবির দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল; কবিও তাই প্রকৃতির ভিতরে স্থাবর-জঙ্গমকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখিতে চাহেন নাই। এই জন্যই দেখিতে পাই, কন্দর্পের সহিত যে অকাল বসন্তকে সহায় করিয়া গিরিরাজ-দুহিতা উমা কৃত্তিবাসের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিল, সে বসন্ত কন্দর্প এবং উমার মতই বিগ্রহবান্ এবং প্রাণবান্। দিকে দিকে প্রাণলীলার প্রাচুর্যে এবং চাঞ্চল্যে সে জীবতনুর ন্যায়ই স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। সহসা অশোকের স্কন্ধদেশ পর্যন্ত নবকিশলয়-রঞ্জিত রাশি রাশি কুসুম-গুচ্ছে ভরিয়া গেল, আম্রশাখা কিশলয় অঙ্কুর এবং আম্রমুকুলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, নির্গন্ধ কর্ণিকারের বর্ণদ্যুতি বিচ্ছুরিত হইল, বসন্ত-সঙ্গতা শ্যামল বনভূমির গাত্রে বালেন্দুবক্র অশোকরূপ নখক্ষত দেখা দিল, মধুশ্রীর মুখে ভ্রমরের তিলক এবং বালারুণকোমল চূতপ্রবালোষ্ঠ শোভা পাইল, পিয়ালতরুমঞ্জরীর রেণুকণায় দৃষ্টিপাত বিঘ্নিত হইলেও মদোদ্ধত মৃগগণ যেখানে বনস্থলীর মর্মর পত্রধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার উপর দিয়া সমীরণাভিমুখে ধাবিত হইল, চূতাঙ্কুরাস্বাদে কষায়কণ্ঠ কোকিলের রব জাগিয়া উঠিল,—দিকে দিকে লীলাচঞ্চল প্রাণের সাড়া পড়িয়া গেল; কুসুমের একটি পাত্রে ভ্রমর-ভ্রমরী মধুপানে মত্ত হইল, স্পর্শনিমীলিতাক্ষী মৃগীকে কৃষ্ণসার মৃগ কণ্ডূয়নের দ্বারা সোহাগ করিতে লাগিল, রসের আবেশে করেণু গণ্ডূষপূর্ণ পদ্মরেণুগন্ধি জল হাতীকে দিল, অর্ধোপভুক্ত মৃণালখণ্ডের দ্বারা চক্রবাক নিজের প্রিয়াকে সাদর সম্ভাষণ জানাইল, বনের তরুগণও পর্যাপ্তপুষ্পস্তবক-স্তনবতী প্রদীপ্ত-পল্লবোষ্ঠযুক্ত মনোহরা

লতাবধূগণের নিকট হইতে বিনম্রশাখা-ভুজ-বন্ধন লাভ করিয়াছিল। এখানে প্রকৃতি জড়-চেতন স্থাবর-জঙ্গমের অভেদরূপে মূর্ত। এক দিকে যেমন কবি এমনি ভাবে প্রাণ-লীলায় জীবন্ত করিয়া প্রকৃতিকে মানুষের অনেকখানি সজাতীয় করিয়া মানুষের কাছে টানিয়া আনিয়াছেন,—অন্য দিকে আবার তিনি প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে-সরিয়া-যাওয়া চেতন-বিলক্ষণ মানুষকে টানিয়া আনিয়া প্রকৃতির সহিত সহজ ভাবে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই পূর্বোক্ত বসন্তোজ্জীবিত বনস্থলীর পটভূমিতে যে উমার আবির্ভাব ঘটাইলেন তাহার—

অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগ-
মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং
বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥
আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥ (৩।৫৩-৫৪)

উমার অঙ্গে অশোকগুচ্ছ পদ্মরাগমণিকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল,—কর্ণিকার ফুল স্বর্ণের দ্যুতি কাড়িয়া লইয়াছিল, সিন্ধুবারপুষ্পই মুক্তা-কলাপের স্থান অধিকার করিয়াছিল; অঙ্গে অঙ্গে নবযৌবনা উমা বসন্তপুষ্পাভরণ বহন করিতেছিল। উমা স্তনভারে যেন একটু আনম্রা—তরুণার্করাগ বসন পরিহিতা—যেন পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকের ভারে অবনম্র সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

এখানে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, যেমন করিয়া বসন্তের বনস্থলীতে তরুলতা নব প্রাণরসে পুষ্পে-পল্লবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে—যেমন করিয়া সহকারতরু নবযৌবনা লতাবধূর ভুজবন্ধন লাভ করিয়াছে, যেমন করিয়া ভ্রমর-ভ্রমরী, হরিণ-হরিণী, চক্রবাক-চক্রবাকী, গজ এবং গজ-বধূ প্রেমলীলায় চঞ্চল—উমার যৌবনশ্রী এবং প্রেম-চাঞ্চল্য ঠিক সেই একই ছন্দে গাঁথা। কবি এমন একটি মোহের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার ভিতরে কিছুতেই স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় না, এখানে বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের ন্যায় চেতন ধর্মে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, না উমা তাহার সকল মনুষ্যধর্ম লইয়াই বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে! এমনি করিয়াই সর্বত্র স্থাপন করিয়াছেন কালিদাস মানুষ এবং বিশ্বপ্রকৃতির ভিতরে গভীর আত্মীয়তা।

এই গভীর আত্মীয়তাই মূর্তি লাভ করিয়াছে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' এবং 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকেও। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র চতুর্থ অঙ্কে আশ্রম-প্রকৃতি যে একান্ত সজীব হইয়া একটি নাট্যবর্ণিত চরিত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার ভিতরেও দেখিতে পাই কালিদাসের সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি এক দিকে আশ্রম-প্রকৃতিকে যেমন জঙ্গম চেতনধর্মে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনিই শকুন্তলাকে যতখানি পারেন প্রকৃতি-দুহিতা করিয়া তুলিয়াছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কে যেখানে আশ্রম-তরুলতার আলবালে জল-সেচননিরতা শকুন্তলা বলিতেছে—'ণ কেবলং তাদণিওও এব্ব, অত্থি মে সোদরসিণেহোবি এদেসু'—তাত কাশ্যপের নিয়োগের জন্যই নহে, এই আশ্রম-তরুগণের প্রতি আমারও একটা সোদর স্নেহ রহিয়াছে—সেইখানেই নাটকের চতুর্থ অঙ্কের আভাস

ধ্বনিত হইয়াছে। প্রকৃতির কোলে পরিবর্ধিত তরুলতা পশু-পাখী সকলের সহিতই বল্কলপরিহিতা শকুন্তলার প্রথমাবধি একটা সজাতীয়ত্ব—একটা সোদরত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে! শকুন্তলার বর্ণনায়ও কালিদাস যতটা পারেন তাহাকে প্রকৃতির কাছে টানিয়া রাখিয়াছেন। সে 'ণোমালিআকুসুমপেলবা', সে শৈবালমণ্ডিত সরোজ অপেক্ষাও অধিক মনোজ্ঞা, তাহার—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

এবং এইরূপে সহোদরা বলিয়াই 'বাদেরিদপল্লবঙ্গুলীহিং তুবরেদি বিঅ মং কেসররুক্‌খও'—বায়ুচালিত পল্লবাঙ্গুলি দ্বারা বকুল গাছ তাহাকে কাছে ডাকে; সে পতিগৃহে যাত্রা করিলে আশ্রম-প্রকৃতি মাঙ্গল্য উচ্চারণ করে, তাহাকে ক্ষৌমবসন, অলক্তক এবং বিবিধ উপহার দান করে, আশ্রম পরিত্যাগ কালে তাহার বসনাঞ্চল টানিয়া ধরে, বিচ্ছেদ-কাতর হইয়া গভীর বিষাদে অশ্রুমোচন করে।

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ যোগের আর একটি অভিনব দৃশ্য দেখিতে পাই 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে। রাজা পুরূরবার প্রিয়তমা উর্বশী পার্বত্যবন-প্রদেশে লতারূপে পরিণত হইয়াছে, পুরূরবা বিরহে উন্মত্ত হইয়া সেই পার্বত্য বনদেশে তাহার প্রিয়ার সন্ধান করিতেছে। অঙ্কটির আরম্ভেই দেখিতে পাই, উর্বশী-সখী চিত্রলেখা সহচরী উর্বশীর বিরহে কাতর হইয়া দ্বিপদিকা তাললয়ে গান ধরিয়াছে—

সহঅরিদুক্‌খালিদ্ধঅং সরবরঅম্মি সিণিদ্ধঅম্।
বাহোবগ্‌গিঅণঅণঅং তম্মই হংসীজুঅলঅম্॥

'সহচরী-দুঃখে কাতর বাষ্পাচ্ছাদিতনয়ন স্নিগ্ধ হংসীযুগল আজ সরোবরে তাপ ভোগ করিতেছে।' এখানে চিত্রলেখা এবং সহজন্যাই সরোবরের স্নিগ্ধ হংসীযুগল, সহচরী উর্বশীর বিরহে তাহারা কাতর। আর তাহার পরে দেখিতে পাই, তাহারা যখন পুনরায় উর্বশীর সহিত দর্শনের আশা পাইল তখন—

চিন্তাদুম্মিঅমাণসিআ সহঅরিদংসণলালসিআ।
বিঅসিঅকমল-মণোহরএ বিহরই হংসী সরবরএ ॥

'সতত চিন্তায় ব্যাকুলমানসা হংসী সহচরীর দর্শন-লালসায় বিকসিতকমল-মনোহর সরোবরে বিহার করিতেছে।' তাহার পর যখন আকাশে বদ্ধদৃষ্টি বিরহোন্মত্ত রাজা পুরূরবা প্রবেশ করিল তখন—

হিঅআহিঅপিঅদুক্খও সরবরএ ধুঅপক্খও।
বাহ-বগ্গিঅ-ণঅণও তম্মই হংসজুআণও ॥

'হৃদয়ভরা প্রিয়াদুঃখ, বাষ্পাকুলনয়নে হংসযুবা সরোবরে ডানা ঝাপ্টায় আর ক্লেশ ভোগ করে!' এই প্রিয়াদুঃখকাতর বাষ্পাকুলনয়ন হংসযুবা পুরূরবা। এই গানগুলিকে কবি এমন ভাবে সমস্ত অঙ্কটির মাঝে মাঝে ভরিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা একটি নেপথ্য-সঙ্গীতের সুরের জালে যেন অতি সূক্ষ্ম এবং মোহময় একটি যবনিকার সৃষ্টি করিয়াছে; সে যবনিকার একদিকে রহিয়াছে মানুষের জীবন-লীলা অন্য দিকে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণলীলা; বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত নদ-নদী, তরু-লতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতির প্রাণ-লীলার বিরাট্ পটভূমিতেই কবি দেখিতে চাহিয়াছেন মানুষের জীবনের সকল সুখ-দুঃখকে। তাই দেখিতে পাই, কবি পুরূরবার বিরহ-দশার আর একটু বর্ণনা দিয়াই আবার নেপথ্য-সঙ্গীতের সুর তুলিয়াছেন,—

দইআরহিও অহিঅং দুহিও বিরহাণুগও পরিমন্থরও।
গিরিকাণণএ কুসুমুজ্জলএ গঅজূহবঈ উঅ ঝীণগঈ॥

'দয়িতারহিত অধিক দুঃখিত বিরহানুগত এবং একান্ত মন্থর গজযূথপতি কুসুমোজ্জ্বল কাননে আজ অতীব হীনগতি।' কবি মানুষের প্রণয়কাতর জীবনকে একটু একটু করিয়া রঙ্গমঞ্চে আনিয়াছেন আর ক্ষণে ক্ষণে এই গানগুলি দ্বারা মানব-জীবনের চারিদিকে বিরাট পটভূমির মত বিশ্ব-জীবনের দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই পটভূমিকা রচনার ফলে বিরহী রাজার বিশ্বপ্রকৃতির সহিত যে যোগ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা একটা কবিকল্পনামাত্র না হইয়া গভীর সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বর্ষার জলস্পর্শে মলিনগর্ভ আরক্ত নবকন্দলী কুসুমগুলি কোপহেতু অন্তর্বাষ্প-আরক্তিম প্রিয়ানয়ন দু'টির কথাই বিরহী রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ইন্দ্রগোপ তৃণের সহিত অচিরোদ্গত ঘাসগুলি দেখিয়া মনে হইয়াছে, প্রিয়া রোষ-বশে চলিয়া যাওয়ায় তাহার শুকোদরশ্যাম স্তনাংশুক পড়িয়া আছে, চোখের জল অধররাগের সহিত মিলিত হইয়া সেই স্তনাংশুকে লাল লাল বিন্দু ধারণ করিয়াছে। নৃত্যতৎপর ময়ূরকে দেখিয়া রাজা প্রশ্ন করিয়াছিল—

বরহিণপব্ভ! পই অব্ভত্থেমি, আঅক্খু হি মে তা।
এত্থ অরণ্ণে ভমন্তে জই পই দিট্টা সা মহু কন্তা॥

'হে ময়ূররাজ, তোমাকে অভ্যর্থনা করিতেছি; এই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তুমি যদি আমার কান্তাকে দেখিয়া থাক তবে আমাকে তাহা বল।' কাননের পরভৃতকাকে ডাকিয়াও রাজা জিজ্ঞাসা করিল—

পরহুঅ! মহুরপলাবিণি কন্তী ণন্দণবণ-সচ্ছন্দ-ভমন্তী।
জই পই পিঅঅম সা মহু দিট্টা তা আঅক্খহি মহু পরপুট্টা॥

'হে মধুরপ্রলাপিনি কান্তা পরভৃতবধূ, নন্দনবনে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি আমার সেই প্রিয়তমাকে তুমি দেখিয়া থাক তবে আমাকে তাহা বল।' এমনি করিয়া মানস-গামী রাজহংসদিগকে ডাকিয়া রাজা প্রিয়ার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছে, গোরোচনা-কুঙ্কুমবর্ণ চক্রবাকের নিকট, করিণীসহায় নাগাধিরাজের নিকট, স্ফটিকশিলাতল নির্মল নির্ঝরশালী পর্বতের নিকট প্রিয়ার বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। প্রিয়া-বিরহের গভীরতা তাহার চোখের সম্মুখ হইতে জড় ও চেতনের ভেদের পর্দাখানি সরাইয়া দিয়াছে। তাহার পরে বেগে ধাবমানা নদীকে দেখিয়া মনে হইয়াছে—

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণিরশনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথা জিহ্মং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো
নদীভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা॥

রাজার মনে হইল, নিশ্চয়ই সেই অসহিষ্ণু প্রিয়া আজ এই নদী-ভাবে পরিণতা; তরঙ্গ তাহার ভ্রূভঙ্গ, ক্ষুভিত বিহগশ্রেণী তাহার মেখলা, ফেনপুঞ্জ তাহার রোষশিথিল বসন—স্খলিত বসন যেন বার বার টানিয়া চলিতেছে; আর রোষাবেগে যেন বার বার হোছট্ খাইয়া বক্রগতিতে চলিয়াছে!—কিন্তু ইহার কোথায়ও প্রিয়ার সন্ধান না পাইয়া সর্বশেষে একটি বনলতাকে দেখিয়া রাজার মনে হইল, তাহার অভিমানিনী প্রিয়া নিশ্চয়ই ঐ পার্বত্য বনলতায় পরিণত হইয়াছে।

তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ
শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্ বিশ্রান্ত-পুষ্পোদ্গমা।
চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে
চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং যাতা প্রকুপ্যেব সা॥

মেঘজলসম্পাতে ধৌতপল্লবা তন্বী এই লতা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া অধরপল্লব বিধৌত করিয়াছে; অকালে পুষ্পোদ্গম বন্ধ হওয়ায় যেন আভরণশূন্যা, ভ্রমরের শব্দহীন বলিয়া সে যেন চিন্তামৌন হইয়া আছে, মনে হয় পাদপতিত আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই সততকোপনা প্রিয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছে।—এই বলিয়া বিরহী রাজা বনলতাকে আলিঙ্গন করাতে সেই বনলতাই উর্বশী মূর্তিতে রাজার বাহুডোরে ধরা দিল। উর্বশীর এই লতারূপে পরিণতি এবং বনলতার পুনরায় উর্বশী মূর্তিতে পরিণতির ভিতরে কবি কিছু অলৌকিকতার আমদানী করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই অলৌকিকতার বাচ্যার্থ হইতে এখানে কাব্যধ্বনিই প্রধান এবং অধিক মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির সহিত গভীর আত্মীয়তায় চেতন-অচেতনের অদ্বয়ত্বই এখানে কাব্য-ধ্বনি,—উহাই কালিদাসের অন্তর্লব্ধ বাণী।

কালিদাসের মেঘদূতের ভিতরে—বিশেষ করিয়া 'পূর্বমেঘে' এই কবিদৃষ্টির একটি বিচিত্র পরিণতি দেখিতে পাই। কবি এখানে 'শাপেনাস্তংগমিতমহিমা' বিরহী যক্ষের ভূমিকায় আষাঢ়ের প্রথম দিনে পর্বতের সানুদেশে বপ্রক্রীড়াপরিণতগজ মেঘকে দেখিয়া অন্তর্বাষ্প হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং কুটজ কুসুমের অর্ঘ্য দ্বারা তাহাকে প্রিয়-সম্ভাষণ জানাইয়া রামগিরি পর্বত হইতে অলকাপুরীতে তাঁহার কল্পিত প্রিয়ার নিকট দূত পাঠাইবার প্রস্তাব জানাইলেন।

আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দর্শনে এই অন্তর্বাষ্পত্ব সম্বন্ধে কবি অবশ্য একটা কারণ নির্দেশ করিয়াছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥

এবং 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতে'র সন্নিপাতে গঠিত মেঘকে কেন দূত করিয়া পাঠাইতেছেন তাহার জবাব দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥

বিরহী ব্যক্তির চেতন এবং অচেতনে কোন ভেদ থাকে না। আসলে কবির এই সকল জবাবদিহি অ-সহৃদয় এবং অরসিক পাঠকের জন্য। কালিদাসের বাসনা-লোকে বিশ্বজীবনের এক ছন্দে চেতন এবং অচেতন পরস্পরে মেশামিশি করিয়া এক হইয়া আছে,—সমস্ত পূর্বমেঘের ভিতরেই রহিয়াছে এই চেতন-অচেতনের যৌথলীলা। রামগিরি হইতে কৈলাস শিখরের অঙ্কে অবস্থিত অলকাপুরী পর্যন্ত পল্লী-নগরী, নদ-নদী, বন-উপবন, সমতলক্ষেত্র এবং পর্বতরাজি-সমন্বিত যে একটা বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ রহিয়াছে, আষাঢ়ের গতিশীল মেঘকে বাহন করিয়া সেই বিচিত্র ভূমিভাগের উপর দিয়া কবি তাহার সজাগ মনটিকে একবার ঘুরাইয়া আনিয়াছেন। মেঘাশ্রয়ে কবিমন দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ পৃথিবী হইতে একটু ঊর্ধ্বে উঠিয়া আশেপাশে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছে,—সে চোখে বিরহের বাষ্পাবরণ কম—মিলন-বিচ্ছেদে বিচিত্র প্রেমের সুনিপুণ অঞ্জনরেখাই স্পষ্ট। এই বিস্তীর্ণ ভূমিভাগের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কবি যাহা কিছু দেখিয়াছেন তাহার সকল দৃশ্য ও ঘটনা মিলিয়া মিশিয়া একটি অখণ্ড প্রেম-লীলার ঐক্যতানে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই প্রেম-লীলার

ভিতরে প্রকৃতির কোন অংশটাই স্থাবর নয়, আবার একান্তভাবে স্থাবর-বিলক্ষণ জঙ্গমও নয়; কোন অংশই যেমন সম্পূর্ণভাবে অচেতন নয়, ঠিক তেমনই আবার মনে হয়, চেতন অংশটাও যেন অতি উগ্রভাবে অচেতন-বিলক্ষণ চেতন নয়!

আষাঢ়ের নবীন মেঘকে দেখিয়া প্রিয়াগমনের প্রত্যয়বশতঃ যে পথিকবনিতাগণ উদ্‌গৃহীতালকান্তা হইয়া ঊর্ধ্বে তাকাইবে, অনুকূল বাতাসে মন্দ আন্দোলিত মেঘের বামে থাকিয়া যে চাতকগুলি মধুর রব করিবে, গর্ভাধান-ক্ষণপরিচয় বশতঃ যে আবদ্ধমালা বলাকাশ্রেণী নয়ন-সুভগ মেঘের সেবা করিবে, মেঘের শ্রবণ-সুভগ যে রবে ধরণী শস্যশ্যামলা হইয়া ওঠে সেই রব শুনিয়া মানসসরোবর গমনোৎসুক যে রাজহংসগুলি খণ্ড খণ্ড মৃণালের পাথেয় লইয়া কৈলাসপর্বত পর্যন্ত মেঘের সঙ্গী হইবে, চিরসুহৃদের ন্যায় দীর্ঘবিরহান্তে যে চিত্রকূট-পর্বত উষ্ণবাষ্প মোচন করিয়া মেঘের প্রতি স্নেহ ব্যক্ত করিবে, পবন গিরিশৃঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে না কি, এই কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া যে সিদ্ধাঙ্গনাগণ মেঘের দিকে ভীত নয়নে তাকাইবে ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ যে জনপদবধূগণ তাহাদের প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দ্বারা মেঘকে পান করিবে, তাহাদের ভিতরে বিজাতীয়ত্বের স্পষ্ট ভেদরেখা কোথায়? মেঘবর্ষণে প্রশমিতদাবাগ্নি সেই সানুমান আম্রকূট, কর্কশ হস্তীর গাত্রে শোভিত রেখা-বিন্যাসের ন্যায় বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে প্রবাহিতা উপলবিষমা বিশীর্ণা রেবানদী, সেই অর্ধসমুৎপন্ন কেশরসমূহে হরিৎ ও কপিশবর্ণ কদম্বপুষ্পের দর্শনে উৎফুল্ল এবং ভূমিকদলীর প্রথমোৎপন্ন মুকুল ভক্ষণ করিয়া বনভূমির মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছে যে হরিণগুলি, স্বাগতরবকারী

শুক্লাপাঙ্গ সজলনয়ন কেকাগুলি, সেই দশার্ণদেশ—যেখানে কেতকীপুষ্পে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে উপবনের বেড়াগুলি—যেখানে গৃহবলিভুক্ পাখিগণের নীড়নির্মাণ-কোলাহলে আকুল হইয়া উঠিয়াছে গ্রামপথের বৃক্ষগুলি—যে দেশে বর্ষাগমে পরিণত-ফল শ্যামজম্বুতে বনান্ত ভরিয়া গিয়াছে,—সেই বেত্রবতী নদীর চলোর্মি-সভ্রূভঙ্গ মুখ,—সেই নবজলকণায় বননদীতীরে জাত যূথিকাকলিকা—সেই যূথিকালাবী নারীগণ—কপোলের ঘাম মুছিতে গিয়া যাহাদের কর্ণোৎপল মলিন হইয়া গিয়াছে—আর সেই উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনাদের বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিতচকিত লোলাপাঙ্গ নয়নের দৃষ্টি—সকল মিলিয়া যেন একটা অদ্ভুত 'সঙ্গতে'র সৃষ্টি করিয়াছে। এখানেও কবি বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দিকে দেখিয়াছেন যে বিরহ-মিলন-মধুর প্রেমলীলা তাহাই যেন মানুষের সকল সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের একটা বিরাট পটভূমিকা বা নেপথ্য-সঙ্গীতের মত দাঁড়াইয়া আছে; এই নেপথ্য-সঙ্গীতের সহিত মানুষের জীবন-সঙ্গীত মিশিয়া গিয়া একটা অখণ্ড আস্বাদনের সৃষ্টি করিয়াছে।

কালিদাসের এই কবিমানসের পশ্চাতে কবিগুরু বাল্মীকির দানকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারিনা। কালিদাসের কাব্যসাধনা এখানে বাল্মীকির কাব্যসাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়; তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা উচিত, বাল্মীকির সাধন-ফল পরবর্তী কালের জন্য আপনার ভিতরে যে বীজ গড়িয়া তুলিয়াছিল কালিদাস সেই বীজে অনেক নূতন ফুল এবং ফল ধরাইয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিতে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের গভীর যোগ আবিষ্কৃত হইলেও কালিদাসের প্রতিভা-বৈশিষ্ট্য সেই কারণেই

অম্লান থাকে। বাল্মীকিতে যে কথার আভাস রহিয়াছে—কালিদাস তাঁহার কাব্য-সৃষ্টিতে তাহাকে স্থানে স্থানে আরও নিবিড় করিয়া তুলিয়াছেন।

বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতরে স্থাবর-জঙ্গম, চেতন-অচেতনের ভিতরে যে মিলন দেখিতে পাই আমরা কালিদাসের কাব্যে, সেই সত্যটিকে পাঠকের নিকটে একটি রসস্বরূপ কাব্যসত্য করিয়া তুলিতে হইয়াছে কবিকে তাঁহার নিপুণ সৃষ্টি-কৌশলের দ্বারা। প্রতিভাবলে কবি এমন একটি স্বতন্ত্র মোহময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, যেখানে একবার প্রবেশ করিলে পাঠক কবির বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু বাল্মীকির সমস্ত কাব্যে ছড়াইয়া আছে এই সত্যটি একটি আদিম বিশ্বাসের রূপে। সে বিশ্বাসকে কবি এমন সহজভাবে আনিয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন যে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের আদিম বিশ্বাস উদ্বুদ্ধ হইয়া সকল সংশয় নিরসন করে।

কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে আমরা দেখিয়াছি, উমা হিমালয় পর্বতের দুহিতা। রামায়ণের ভিতরেও দেখিতে পাই, ধাতুসকলের আকর শৈলেন্দ্র হিমালয়ের স্ত্রী মেরুদুহিতা মেনা; তাহাদের দুইটি কন্যা,—জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা উমা। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে হিমালয় দেবগণের অনুরোধে ত্রিলোকের হিতের জন্য ত্রিপথগা করিয়া পাঠাইয়াছেন; আর কনিষ্ঠা উমা উগ্রব্রত অবলম্বন করিয়া কঠোর তপস্যা আচরণ করিয়াছিল; সেই তপস্বিনী কন্যাকে হিমালয় রুদ্র মহেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।—

শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্।
তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি॥

যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা।
নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া॥
তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।
উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব।
অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্যচিকীর্ষয়া।
শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্॥
দদৌ ধর্মেণ হিমবান্ তনয়াং লোকপাবনীম্।
স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া॥

... ...

যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘুনন্দন।
উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা॥
উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্।
রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্॥

(বাল—৩৫।১৩-১৭, ১৯-২০)

কবিগুরু এখানে গঙ্গাকে উমার সহোদরা করিয়া হিমালয়ের সহিত উমার দুহিতৃসম্বন্ধকে আরও সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। গঙ্গার শিবের মস্তকে পতন সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে,—

হিমবৎ-প্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে। (বা—৪৩।৮)

ধরণীর বুক হইতে সীতার উৎপত্তিকে কবিগুরু অতি বাস্তব রূপ দিয়াছেন একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়।—

উত্থিতা মেদিনীং ভিত্ত্বা ক্ষেত্রে হলমুখক্ষতে।
পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণা শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ॥

(সুন্দর—১৬।১৬)

হলক্ষতমুখে শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া মাটির পৃথিবীর যে কন্যার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার সমস্ত অঙ্গে কীর্ণ রহিয়াছিল ক্ষেত্রের ধূলিকণা ; মাটির মেয়ের অঙ্গে সেই ধূলিকণা দেখা দিয়াছিল শিশু-অঙ্গে বিচ্ছুরিত পদ্মরেণুর মত ; আর এই ধূলি-ভূষণের ভিতরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল একটা মঙ্গলের দীপ্তি, তাই 'শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ'। বাল্মীকির পূর্বে এবং পরে ক্ষেত্রের ধূলিকে এমনতর 'পদ্মরেণুনিভ' করিয়া আর কেহ কোথায়ও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না ; এক দিকে এই পদ্মরেণুনিভ শুভ কেদারপাংশু যেমন সীতার দেহশ্রীকে অপূর্ব করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে ইহার ভিতর দিয়া মাটির ধরণীর সহিত সীতার যোগও অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। বনে ঋষিপত্নীর নিকট আত্মপরিচয় দিতে গিয়াও সীতা বলিয়াছিল —

> তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্রমণ্ডলম্।
> অহং কিলোত্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং নৃপতেঃ সুতা ॥
> স মাং দৃষ্ট্বা নরপতির্মুষ্টিবিক্ষেপতৎপরঃ।
> পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গী বিস্মিতো জনকোঽভবৎ।
>
> (অ—১১৮।২৮-২৯)

সীতা যখন প্রথম ক্ষেত্র হইতে আবির্ভূতা হয় তখন সে ছিল পাংশু-গুণ্ঠিতসর্বাঙ্গী—তাহাকে দেখিয়া জাগিয়াছিল লাঙ্গলহস্ত জনকরাজার পরম বিস্ময়।

রামায়ণের আরম্ভে দেখিতে পাই পতিবিয়োগে ক্রৌঞ্চী 'রুরাব করুণং গিরম্' ; এইখান হইতেই রামায়ণ-কাব্যের অনুপ্রেরণা। ক্রৌঞ্চীর এই করুণ ক্রন্দন যে রামায়ণ-কাব্যের প্রেরণা যোগাইল তাহার কারণ এই, পতিবিরহিত সীতাকেও বাল্মীকি অসহায়া কুররীর

মত করুণ-ক্রন্দনরতা দেখিয়াছিলেন। এক কুররীর ক্রন্দন অপর কুররীর ক্রন্দনের জন্য কবিচিত্তকে আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছিল। বাল্মীকি বিগ্না সীতাকে বহু স্থানেই 'কুররীব দীনা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (অরণ্য—৬৩।১১, কি—১৯।২৮)।[১] কালিদাসও সীতাকে বিগ্না কুররী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন (রঘু ১৪।৬৮) এবং কালিদাসের বর্ণনায় দেখি, এই বিগ্না কুররীর সঙ্গে ভাগীরথীতীরবর্তী বিজন বনে দেখা হইয়াছিল সেই করুণহৃদয় মহাপ্রাণ কবির

নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ
শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ॥ (রঘু—১৪।৭০)

নিষাদের শরবিদ্ধ বন্যবিহঙ্গকে অবলম্বন করিয়া যাঁহার শোক এক দিন শ্লোকত্ব লাভ করিয়াছিল।

কালিদাসের রঘুবংশে দেখিতে পাই, লক্ষ্মণের মুখে সীতা যখন তাহার নির্বাসনের কথা শুনিয়াছিল তখন ধরণীদুহিতা সীতা একটি বনলতার ন্যায়ই ধরণীমায়ের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।—

ততোঽভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা
প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।

১। তুঃ— সা চক্রবাকীব ভৃশং চুকূজ সৌন্দরনন্দ—৬।৩০

বিষাদপারিপ্লবলোচনা ততঃ
প্রণষ্টপোতা কুররীব দুঃখিতা।
বিহায় ধৈর্যং বিরুরাব গৌতমী
তताম চৈবাশ্রুমুখী জগাদ চ॥

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ৮।৫১

স্বমূর্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীং
লতেব সীতা সহসা জগাম ॥ (রঘু,—১৪।৫৫)

হঠাৎ প্রবল বাত্যার আঘাতে লতা যেমন তাহার ফুলগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া পৃথিবীর বুকে লুটাইয়া পড়ে, সীতাও সেইরূপ বিপদ্ ও অপমান-বাত্যায় আহত হইয়া আভরণের কুসুমগুলি ছড়াইয়া দিয়া নিজের জন্মদাত্রী ধরণীর বক্ষেই লুটাইয়া পড়িল।[১] বাল্মীকিও বিপদ্ ও অপমানে আহতা সীতাকে 'গজেন্দ্রহস্তাবহতা বল্লরী' বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন (যুদ্ধ—১১৫।২৪)।[২]

'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ যখন সীতাকে নির্বাসিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে তখন—

তথেতি তস্যাঃ প্রতিগৃহ্য বাচং
রামানুজে দৃষ্টিপথং ব্যতীতে।
সা মুক্তকণ্ঠং ব্যসনাতিভারা-
চ্চক্রন্দ বিগ্না কুররীব ভূয়ঃ ॥ (রঘু,—১৪।৬৮)

১। তু ঃ-- নির্ভূষণা সা পতিতা চকাশে
বিশীর্ণপুষ্পস্তবকা লতেব ॥ (সৌন্দরনন্দ—৬।২৮)

২। আরও তুলনীয়—
নষ্টেব সীতাং পরমাভিজাতাং
পথি স্থিতে রাজকুলে প্রজাতাম্ ।
লতাং প্রফুল্লামিব সাধুজাতাং
দদর্শ তন্বীং মনসাভিজাতাম্ ॥ (সুন্দর—৫।২৫)

আর বিগ্না কুররী সীতার আর্তক্রন্দন শুনিয়া মাতা ধরণীর বন-বক্ষও বেদনায় বিমথিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই—

নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষা
দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবম্
অত্যন্তমাসীদ্রুদিতং বনেঽপি॥ (রঘু—১৪।৬৯)

ময়ূর তাহার নৃত্য পরিত্যাগ করিল—বৃক্ষগুলি ফুল ঝরাইয়া দিতে লাগিল, হরিণগুলি কবলিত কুশগুচ্ছ পরিত্যাগ করিল; এইরূপে সমস্ত বনস্থলী সীতার দুঃখে সমদুঃখভাব প্রাপ্ত হইলে সেই বনে অত্যন্ত রোদনধ্বনি জাগিয়াছিল। শকুন্তলা যেদিন আশ্রম-পরিত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিয়াছিল সেদিন শকুন্তলাও যেমন আশ্রম-বিরহে ব্যাথাতুর হইয়া উঠিয়াছিল, সমগ্র বন-আশ্রমও তেমনি শকুন্তলা-বিরহে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল; প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলিয়াছিল,—

ণ কেবলং তবোবণবিরহকাদরা সহী এব্ব। তুএ উবাট্টিদবিওঅস্স তবোবণস্স বি অবত্থং পেক্খ দাব।—

উগ্গলিঅদব্ভকবলা মিঈ পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও॥

সখীই যে কেবল তপোবন-বিরহকাতরা তাহা নহে, তোমার বিয়োগকাল উপস্থিত বলিয়া তপোবনের অবস্থাও দেখ;—মৃগী তাহার কবলিত কুশগুচ্ছ মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়াছে, ময়ূরী তাহার নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, পাণ্ডুপত্র ঝরাইয়া দিয়া লতা যেন অশ্রু মোচন করিতেছে।

মানুষের সহিত আরণ্য প্রকৃতির এই সমবেদনা যেমন কালিদাসের কাব্যের সর্বত্র লক্ষিত হয়, বাল্মীকির রামায়ণের সর্বত্রও আমরা এই সমবেদনা লক্ষ্য করিতে পারি। রাম কর্তৃক নির্বাসিতা সীতার বর্ণনায় বাল্মীকি বলিয়াছেন—

দূরস্থং রথমালোক্য লক্ষ্মণং চ মুহুর্মুহুঃ।
নিরীক্ষমাণাং তূদ্বিগ্নাং সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ॥

তখন— সা দুঃখভারাবনতা যশস্বিনী
যশোধরা নাথমপশ্যতী সতী।
রুরোদ সা বর্হিণনাদিতে বনে
মহাস্বনং দুঃখপরায়ণা সতী॥ (উত্তর—৫৮।২৫–২৬)

এখানেও দেখিতে পাই, দুঃখভারাবনতা সতী যখন একান্ত অসহায়ভাবে বনে মহাস্বন তুলিয়া রোদন করিয়াছিল, তখন বনস্থলীও বর্হিনাদের দ্বারা সীতার সহিত সমভাবে রোদন করিয়াছিল।

শুধু এইখানেই নহে, রামায়ণের বহু স্থানে রাম ও সীতার সহিত আরণ্য প্রকৃতির যোগ অতি অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই, রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণ ও সীতাসহ অযোধ্যাপুরী ত্যাগ করিয়া বনে রওনা হইল, তখন সমস্ত প্রজাবর্গ তাহাদের অনুসরণ করিয়া সাশ্রুনয়নে তাহাদিগকে বনে গমনে বাধা দিতে লাগিল। তাহাদের ভিতরে—

তে দ্বিজাস্ত্রিবিধং বৃদ্ধা জ্ঞানেন বয়সৌজসা।
বয়ঃপ্রকম্পশিরসো দূরাদূচুরিদং বচঃ॥
বহন্তো জবনা রামং ভো ভো জাত্যাস্তুরঙ্গমাঃ।
নিবর্তধ্বং ন গন্তব্যং হিতা ভবত ভর্তরি॥ (অযো—৪৫।১৩-১৪)

জ্ঞান, বয়স এবং তপোবল এই ত্রিবিধভাবে বৃদ্ধ দ্বিজগণ—বয়সের জন্য যাঁহাদের শির কম্পিত হইতেছে—তাঁহারা দূর হইতে রথের অশ্বগুলিকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন—'তোমরা বনগমনে নিবৃত্ত হও—বনে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই—তোমরা তোমাদের প্রভুর হিত কর।' রামচন্দ্র এইরূপ দ্বিজবৃদ্ধগণকে প্রলাপ করিতে দেখিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্বক পায়ে হাঁটিয়াই বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে দ্বিজবৃদ্ধগণ তখনও ডাকিয়া বলিতেছেন—

যাচিতো নো নিবর্তস্ব হংসশুক্লশিরোরুহৈঃ।
শিরোভির্নিভৃতাচার মহীপতনপাংশুলৈঃ॥ (অযো—৪৬।২৭)

হে নিশ্চলধর্মাচারী রাম, আমরা আমাদের হংসশুক্লকেশপূর্ণ মস্তককে ভূমিপতন দ্বারা ধূলিপূর্ণ করিয়া তোমার নিবর্তন যাচ্ঞা করিয়াছি,—তুমি ফেরো।'

দ্বিজবৃদ্ধগণ কাতর স্বরে আরও বলিতে লাগিলেন,—'শুধু আমরাই যে তোমাকে ফিরিয়া আসিতে বলিতেছি তাহা নহে; ঐ দেখ—

অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুদ্ধতবেগিনঃ।
উন্নতা বায়ুবেগেন বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ॥
নিশ্চেষ্টাহারসঞ্চারা বৃক্ষৈকস্থাননিশ্চিতাঃ।
পক্ষিণোঽপি প্রযাচন্তে সর্বভূতানুকম্পনম্॥ (ঐ ৪৫।৩০-৩১)

'ঐ দেখ মূলের দ্বারা উদ্ধতবেগ উন্নত পাদপগুলি তোমার অনুগমনে অশক্ত হইয়া বায়ুবেগে তাহাদের বিক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। পক্ষীগুলি আহারান্বেষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া গতিরহিতভাবে বৃক্ষের এক স্থানে নিশ্চল হইয়া তোমার নিকট সর্বভূতের প্রতি অনুকম্পা প্রার্থনা করিতেছে।' দ্বিজগণ যখন রামের নিবর্তনের জন্য এইরূপে আর্তস্বরে

চিৎকার করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তমসা নদীও তাহার জলপ্রবাহ দ্বারা রামচন্দ্রকে বনগমনে বারণ করিয়া পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।—

এবং বিক্রোশতাং তেষাং দ্বিজাতীনাং নিবর্তনে।
দদৃশে তমসা তত্র বারয়ন্তীব রাঘবম্॥ (ঐ ৪৫।৩২)

রাম বনে চলিয়া গেলে বিষণ্ণ অযোধ্যাবাসী এই বলিয়া মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল—

শোভয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যো রম্যকাননাঃ।
আপগাশ্চ মহানূপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্বতাঃ॥
কাননং বাপি শৈলং বা যং রামোঽনুগমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যন্ত্যনর্চিতুম্॥
বিচিত্রকুসুমাপীড়া বহুমঞ্জরিধারিণঃ।
রাঘবং দর্শয়িষ্যন্তি নগা ভ্রমরশালিনঃ॥
অকালে চাপি মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্ত্যনুক্রোশাদ্গিরয়ো রামমাগতম্॥
প্রস্রবিষ্যন্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ।
বিদর্শয়ন্তো বিবিধান্ ভূয়শ্চিত্রাংশ্চ নির্ঝরান্॥
পাদপাঃ পর্বতাগ্রেষু রময়িষ্যন্তি রাঘবম্।

(ঐ—৪৮।১৯-১৫)

'রম্যকাননে অটবী সমূহ, গভীর স্রোতস্বিনী এবং সানুমন্ত পর্বত রামচন্দ্রের শোভাসম্পাদন করিবে। কানন বা শৈল যেখানেই রাম গমন করিবে সেইখানেই প্রিয় অতিথিকে পাইলে যেরূপ অর্চনা না করিয়া পারা যায় না, সেইরূপ তাহারা রামকে অর্চনা না করিয়া

পারিবে না। বহুমঞ্জরীধারী ভ্রমরশালী বৃক্ষগুলি রামচন্দ্রকে বিচিত্র কুসুমের শিরোভূষণ দেখাইবে। পর্বতগুলি সহানুভূতির আতিশয্যে অতিথি রামকে অকালেই মুখ্য মুখ্য ফুল এবং ফল দেখাইবে, বহু-বিচিত্র বিবিধ নির্ঝরগুলি দেখাইতে দেখাইতে পর্বতগুলি বিমল সলিল প্রস্রবণ করিতে থাকিবে; পর্বতের অগ্রস্থিত বৃক্ষগুলি রামকে আনন্দ দিতে থাকিবে।

প্রকৃতপক্ষেই আমরা দেখিতে পাই, পার্বত্য বনদেশে বাস করিয়া রাম-সীতা কখনই নির্বাসন-ক্লেশ ভোগ করে নাই,—বনে তাহারা সর্বপ্রকার রাজ্যসুখই ভোগ করিতেছিল। চিত্রকূট পর্বতে আসিয়া রামচন্দ্র সীতাকে যেখানে চিত্রকূটের শোভা দেখাইতেছিল সেখানে রামের পার্শ্বে সীতা যেন নন্দনবনে ক্রীড়ারত ইন্দ্রের পার্শ্বে শচী।

ভার্যামমরসঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ॥ (অযো—৯৪।২)

এই চিত্রকূটের চারি দিকে চাহিয়া রাম সীতাকে বলিয়াছিল—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্॥

* * *

যদীহ শরদোঽনেকাস্ত্বয়া সার্ধমনিন্দিতে।
লক্ষ্মণেন চ বৎস্যামি ন মাং শোকঃ প্রধক্ষ্যতি॥

(ঐ ৯৪।৩,১৫)

'ভদ্রে সীতা, রাজ্য হইতে যে ভ্রষ্ট হইয়াছি, বা সুহৃদ্গণের সহিত যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ইহার কিছুই আজ আর এই রমণীয় চিত্রকূট পর্বত দর্শনে আমার মনকে ক্লিষ্ট করিতেছে না। হে অনিন্দিতে, এখানে তোমার এবং লক্ষ্মণের সহিত যদি অনেক বৎসরও বাস করি

তাহাতেও শোক আমাকে দগ্ধ করিবে না।' এই চিত্রকূট পর্বতের অদূরে স্বচ্ছসলিলে প্রবহমানা মন্দাকিনী নদীকে দেখিয়াও রাম বলিয়াছিল,—

দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে।
অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ॥

* * *

সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীম্।
কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি॥
ত্বং পৌরজনবৎ ব্যালানযোধ্যামিব পর্বতম্।
মন্যস্ব বনিতে নিত্যং সরযূবদিমাং নদীম্॥
(অযো—৯৫।১২, ১৪-১৫)

'চিত্রকূট পর্বত এবং মন্দাকিনীর দর্শন এবং তাহার সহিত তোমার দর্শনের দ্বারা এখানে আমি পুরীতে বাস অপেক্ষা অধিক মনে করিতেছি।…হে সীতা, সখী যেমন সখীর ভিতরে আত্মনিমজ্জন করে তুমি তেমন করিয়া এই মন্দাকিনী নদীতে অবগাহন কর; এই নদী রক্তকমল এবং শ্বেত কমলগুলিকে বিক্ষোভের দ্বারা নিমজ্জিত করিতেছে। এই পার্বত্যদেশের সকল জীবজন্তুকে তুমি পৌরজনগণের ন্যায় মনে করিও, এই পর্বতকে অযোধ্যা বলিয়া মনে করিও, আর এই নদীকেই সরযূ নদী বলিয়া মনে করিও।'

রাবণ যে দিন ছদ্ম পরিব্রাজকবেশে সীতাহরণ মানসে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিয়াছিল সে দিন ক্রূরকর্মা রাবণকে দেখিয়া সমস্ত বনই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বনের বৃক্ষগুলি ভয়ে আর

শাখাবাহু কম্পিত করিল না, সমীরণ প্রবাহিত হইল না; —সেই রক্তলোচন রাক্ষসকে দেখিয়া শীঘ্রস্রোতা গোদাবরী নদীও ভয়ে স্তিমিতভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল।—

তমুগ্রং পাপকর্মাণং জনস্থানগতা দ্রুমাঃ।
সন্দৃশ্য ন প্রকম্পন্তে ন প্রবাতি চ মারুতঃ॥
শীঘ্রস্রোতাশ্চ তং দৃষ্ট্বা বীক্ষন্তং রক্তলোচনম্॥
স্তিমিতং গন্তুমারেভে ভয়াদ্গোদাবরী নদী॥

(আর ৪৬।৭-৮)

রাম স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে—লক্ষ্মণ তাহারই অনুগমন করিয়াছে; সুতরাং সীতাকে একাকিনী অসহায়া দেখিয়া সমস্ত বন ভয়-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ কর্তৃক যখন হৃতা হয় তখন সীতাও এই অরণ্য-প্রকৃতিকেই তাহার একমাত্র সহায় বলিয়া জানিয়াছিল, তাই সে করজোড়ে বনের প্রতিটি বৃক্ষ লতা, গোদাবরী নদী, সকল বনদেবতা, পশুপক্ষীর নিকট তাহার করুণ নিবেদন জানাইতে জানাইতে যাইতেছিল।—

আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
হংসসারসসংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
দৈবতানি চ যান্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্॥
যানি কানিচিদপ্যত্র সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
সর্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ॥

হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্তুঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
বিবশা তে হৃতা সীতা রাবণেনেতি সংশত ॥

(আরণ্য—৪৯।৩০-৩৪)

'হে জনস্থান, হে পুষ্পিত কর্ণিকার সমূহ, তোমাদের সকলকে ডাকিয়া জানাইতেছি, তোমরা ক্ষিপ্রগতি রামকে সংবাদ দাও যে সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। হংস-সারস-সমাকুল গোদাবরী নদীকে বন্দনা করিতেছি, শীঘ্র তুমি রামকে সংবাদ দাও, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। বিবিধ বৃক্ষে পূর্ণ এই বনস্থলীতে যত বনদেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করিতেছি, অপহৃতা আমার কথা তাঁহারা যেন আমার ভর্তাকে জানান। এখানে বিবিধ যত জীবজন্তু রহিয়াছে সেই মৃগ-পক্ষী প্রভৃতি সকলেরই আমি শরণ লইতেছি; তাহারা সকলেই যেন আমার ভর্তার নিকট তাঁহার প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী হ্রিয়মাণা প্রিয়ার সংবাদ জানায়, আরও যেন জানায় যে, রাবণ বিবশা সীতাকেই হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

আরণ্য প্রকৃতি সীতার এই আর্ত আবেদনে যে সাড়া দিয়াছিল না, তাহা নহে। যখন সীতার অগ্নিবর্ণ আভরণগুলি গগনচ্যুত ক্ষীণ-তারকার মতন ভূতলে সশব্দে ছড়াইয়া পড়িতেছিল,—যখন সীতার স্তনভ্রষ্ট হার গঙ্গার ধারার ন্যায় আকাশ হইতে বহিয়া পড়িতেছিল, তখন—

উৎপাতবাতাভিহতা নানাদ্বিজগণাযুতাঃ।
মাভৈরিতি বিধূতাগ্রা ব্যাজহ্রুরিব পাদপাঃ।
নলিন্যো ধ্বস্তকমলাস্ত্রস্তমীনজলেচরাঃ।
সখীমিব গতোৎসাহাং শোচন্তীব স্ম মৈথিলীম্ ॥

সমন্তাদভিসম্পত্য সিংহব্যাঘ্রমৃগদ্বিজাঃ।
অনুধাবংস্তদা রোষাৎ সীতাচ্ছায়ানুগামিনঃ॥
জলপ্রপাতাস্রমুখাঃ শৃঙ্গৈরুচ্ছ্রিতবাহুভিঃ।
সীতায়াং হ্রিয়মাণায়াং বিক্রোশন্তীব পর্বতাঃ॥
হ্রিয়মাণান্তু বৈদেহীং দৃষ্ট্বা দীনো দিবাকরঃ।
প্রবিধ্বস্তপ্রভঃ শ্রীমানাসীৎ পাণ্ডুরমণ্ডলঃ॥
নাস্তি ধর্মঃ কুতঃ সত্যং নার্জবং নানৃশংসতা।
যত্র রামস্য বৈদেহীং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
ইতি ভূতানি সর্বাণি গণশঃ পর্যদেবয়ন্।
বিত্রস্তকা দীনমুখা রুরুদুর্মৃগপোতকাঃ॥ (ঐ-৫২।৩৪-৪০)

নানাপক্ষিসমাকুল আরণ্য বৃক্ষগুলি ঊর্ধ্বগামী বাতাসের দ্বারা অভিহত হইয়া অগ্রভাগ বিকম্পিত করিয়া যেন বলিতেছিল—সীতা, আমরা এখানে রহিয়াছি, তোমার কোন ভয় নাই; ধ্বস্তকমল সরোবরের মীন প্রভৃতি জলচরগুলি ত্রস্ত হইয়া উঠিল,—সরোবরগুলি যেন গতোৎসাহা সখী সীতার জন্যই শোক করিতেছিল। সিংহব্যাঘ্র মৃগ প্রভৃতি পশুগুলি এবং বনের পাখীগুলি চারিদিক্ হইতে রাবণকে অভিসম্পাত করিতে করিতে রোষে সীতার ছায়া অনুসরণ করিয়া পিছনে পিছনে ধাবিত হইতে লাগিল; জলপ্রপাতে অশ্রুমুখ হইয়া শৃঙ্গবাহুগুলি ঊর্ধ্বে তুলিয়া পর্বতগুলি সীতা অপহৃতা হইতেছে দেখিয়া আক্রোশে আস্ফালন করিতেছিল; ধ্বস্তপ্রভ সূর্য পাণ্ডুরমণ্ডলে দীন হইয়া রহিল; যেখানে রামের সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যায় সেখানে ধর্ম বলিয়া কিছু নাই,—কোথায় সত্য? চরিত্রের ঋজুতা বা অনৃশংসতা বলিয়াও কোন জিনিস নাই,—এই কথা বলিয়া বনের

সকল প্রাণীকে ব্যথিত করিয়া বিত্রস্ত বালমৃগগুলি দীনমুখে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র যখন মারীচ বধ করিয়া লক্ষ্মণসহ তাহাদের পর্ণশালায় ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল—

দদর্শ পর্ণশালাঞ্চ সীতয়া রহিতাং তদা।
শ্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব ॥
রুদন্তমিব বৃক্ষৈশ্চ ম্লানপুষ্পমৃগদ্বিজম্।
শ্রিয়া বিহীনং বিধ্বস্তং সন্ত্যক্তং বনদৈবতৈঃ ॥

(আরণ্য—৬০।৫-৬)

সীতা-বিরহিতা পর্ণশালা হেমন্তের শ্রীহীন ধ্বস্ত সরোবরের মত পড়িয়া আছে ; চারিদিকে বৃক্ষগুলি রোদন করিতেছে, বনের পুষ্প, পশু, পাখী সকলই ম্লান হইয়াছে ; সকলই যেন শ্রীহীন— বিধ্বস্ত,— বনদেবতাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত। রামচন্দ্র শোকে উন্মত্ত হইয়া পর্বত হইতে পর্বতে—বন হইতে বনে—নদী হইতে নদীতে ধাবিত হইয়া সীতার উদ্দেশ করিতে লাগিল। পাশের কদম্ববৃক্ষকে ডাকিয়া রাম সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিল—কদম্ব যদি কদম্বপ্রিয়া শুভাননা সীতাকে দেখিয়া থাকে ; বিল্বকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সে স্নিগ্ধ-পল্লবসঙ্কাশা পীতকৌষেয়বাসিনী বিল্বোপমস্তনী সীতাকে দেখিয়াছে কি না ; অর্জুনবৃক্ষকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অর্জুনপ্রিয়া তন্বী সীতা বাঁচিয়া আছে কি না ; এইরূপে মরুবক, বকুল, অশোক, তাল, জম্বু প্রভৃতি সকল বৃক্ষের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়াই রাম সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কর্ণিকারকে ডাকিয়াও খোঁজ লইল—যদি সে কর্ণিকারপ্রিয়া সীতাকে দেখিয়া থাকে।

অস্তি কচ্চিৎ ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্ববনপ্রিয়া।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্ ॥
স্নিগ্ধপল্লবসঙ্কাশাং পীতকৌষেয়বাসিনীম্।
শংসস্ব যদি সা দৃষ্টা বিল্ব বিল্বোপমস্তনী ॥
অথবার্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জুনপ্রিয়াম্।
জনকস্য সুতা তন্বী যদি জীবতি বা ন বা ॥
ককুভঃ ককুভোরূং তাং ব্যক্তং জানাতি মৈথিলীম্।
লতাপল্লবপুষ্পাঢ্যো ভাতি হ্যেষ বনস্পতিঃ ॥
ভ্রমরৈরুপগীতশ্চ যথা দ্রুমবরো হ্যসি।
এষ ব্যক্তং বিজানাতি তিলকস্তিলকপ্রিয়াম্ ॥
অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতনম্।
ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম্ ॥
যদি তাল ত্বয়া দৃষ্টা পক্বতালোপমস্তনী।
কথয়স্ব বরারোহাং কারুণ্যং যদি তে ময়ি ॥
যদি দৃষ্টা ত্বয়া জম্বো জাম্বুনদসমপ্রভা।
প্রিয়াং যদি বিজানাসি নিঃশঙ্কং কথয়স্ব মে ॥
অহো ত্বং কর্ণিকারাদ্য পুষ্পিতঃ শোভসে ভৃশম্।
কর্ণিকারপ্রিয়াং সাধ্বীং শংস দৃষ্টা যদি প্রিয়া ॥

(আরণ্য—৬০।১২-২০)

বৃক্ষলতাগুল্মের নিকট পৃথক্-পৃথক্ভাবে সন্ধান লইবার পর রামচন্দ্র বনের পশুগণের নিকটেও একে একে সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। হরিণকে রাম জিজ্ঞাসা করিল, যদি হরিণনয়নী সীতাকে সে হরিণীর সহিত দেখিয়া থাকে; বনের করীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

যদি সে করিণীর সহিত সীতাকে দেখিয়া থাকে ; বনের শার্দূলও এ সময়ে রামচন্দ্রের প্রিয়তম বন্ধুর স্থান অধিকার করিয়াছিল।

অথবা মৃগশাবাক্ষীং মৃগ জানাসি মৈথিলীম্।
মৃগবিপ্রেক্ষণী কান্তা মৃগীভিঃ সহিতা ভবেৎ॥
গজ সা গজনাসোরূর্যদি দৃষ্টা ত্বয়া ভবেৎ।
তাং মন্যে বিদিতাং তুভ্যমাখ্যাহি বরবারণ॥
শার্দূল যদি সা দৃষ্টা প্রিয়া চন্দ্রনিভাননা।
মৈথিলী মম বিস্রব্ধঃ কথয়স্ব ন তে ভয়ম্॥

(ঐ ৬০।২৩-২৫)

শুধু বনের তরুলতা পশুপক্ষীর নিকটেই নহে, আকাশের সূর্য, সর্বলোকভ্রমণকারী বায়ুর নিকটেও রামচন্দ্র সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

আদিত্য ভো লোককৃতাকৃতজ্ঞ
লোকস্য সত্যানৃতকর্মসাক্ষিন্।
মম প্রিয়া সা ক্ব গতা হৃতা বা
শংসস্ব মে শোকহতস্য সর্বম্॥
লোকেষু সর্বেষু ন বাস্তি কিঞ্চিৎ
যৎ তেন নিত্যং বিদিতা ভবেৎ তৎ।
শংসস্ব বায়ো কুলপালিনীং তাং
মৃতা হৃতা বা পথি বর্ততে বা॥

(ঐ ৬৩।১৬-১৭)

'হে আদিত্য, তুমি বিশ্বলোকে যাহা কিছু কৃত এবং যাহা কিছু অকৃত সকলই অবগত আছ ; বিশ্বলোকের সকল সত্যকর্ম এবং

অসত্যকর্মের তুমিই সাক্ষী ; আমার সেই প্রিয়া কোথায় গিয়াছে—অথবা হৃত হইয়াছে, শোকাহত আমাকে সকল খুলিয়া বল। হে বায়ু, সর্বলোকে এমন কিছু নাই যাহা তোমা কর্তৃক নিত্য জ্ঞাত হইতেছে না ; তুমি সেই কুলপালিনীর সন্ধান আমাকে বল,—সে মরিয়াছে—অথবা হৃত হইয়াছে—অথবা পথে অবস্থান করিতেছে।'

মূক প্রকৃতি রামচন্দ্রের এই আর্তিতে গভীর সমবেদনার সহিত সাড়া দিয়াছিল। রাম-লক্ষ্মণ যখন কোথায়ও সীতার কোন সন্ধান না পাইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া ঘুরিতেছিল তখন হঠাৎ বনের মৃগগুলির দিকে চোখ পড়াতে রাম লক্ষ্মণকে বলিল ;—

এতে মহামৃগা বীর মামীক্ষন্তে পুনঃ পুনঃ ॥
বক্তুকামা ইব হি মে ইঙ্গিতান্যুপলক্ষয়ে। (ঐ-৬৪।১৫-১৬)

'হে বীর, এই মহামৃগগুলি আমাকে বার বার চাহিয়া দেখিতেছে, ইহাদের ইঙ্গিতে আমার মনে হইতেছে, ইহারা আমাকে কিছু বলিতে চাহিতেছে।' তখন—

তাংস্তু দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রো রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ ॥
ক্ব সীতেতি নিরীক্ষন্ বৈ বাষ্পসংরুদ্ধয়া গিরা। (ঐ ১৬-১৭)

'তাহাদিগকে দেখিয়া নরব্যাঘ্র রাম তাহাদের ইঙ্গিতের প্রত্যুত্তর দিল ; তাহাদের দিকে তাকাইয়া বাষ্পসংরুদ্ধ বাক্যে সে জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় সীতা ?' রামের সেই প্রশ্নের উত্তর মৃগগণ বাক্যে দিল না বটে, কিন্তু—

এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ তে মৃগাঃ সহসোত্থিতাঃ ॥
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে দর্শয়ন্তো নভঃস্থলম্।
মৈথিলী হ্রিয়মাণা সা দিশং যামভ্যপদ্যত ॥ (ঐ ১৭-১৮)

'নরেন্দ্র রাম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মৃগগণ সহসা উঠিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া আকাশের দিকে দেখাইতে লাগিল,—যে দিকে হ্রিয়মাণা সেই সীতা গমন করিয়াছিল।' রাম সক্রোশে যখন পর্বতের নিকট সীতার বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তখন সেই পর্বতও তাহার উন্নত শির তুলিয়া দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া যেন সীতাকেই দেখিতে লাগিল; এইরূপে পর্বত আভাসে-ইঙ্গিতে চক্ষু-ইসারায় সীতার সন্ধান বলিল, সাক্ষাতে সীতাকে দেখাইতে পারিল না।

দর্শয়ন্নিব তাং সীতাং নাদর্শয়ত রাঘবে। (ঐ ৩২)[১]

---

(১) মহাভারতের নলোপাখ্যানের ভিতরে দেখি নল-পরিত্যক্তা একাকিনী বিরহিণী দময়ন্তীও এইরূপ বন্য পশু, নদী, পর্বত সকলের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া নলের অন্বেষণ করিয়াছে।—

অরণ্যরাডয়ং শ্রীমাংশ্চতুর্দংষ্ট্রো মহাহনুঃ।
শার্দূলো হভিমুখঃ প্রৈতি পৃচ্ছাম্যেনমশঙ্কিতা॥
ভবান্ মৃগাণামধিপ স্ত্বমস্মিন্ কাননে প্রভুঃ।
বিদর্ভরাজতনয়াং দময়ন্তীতি বিদ্ধি মাম্॥

... ...

আশ্বাসয় মৃগেন্দ্রেহ যদি দৃষ্টস্ত্বয়া নলঃ।
সিংহস্কন্ধো মহাবাহুঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ॥

... ...

গিরিরাজমিমং তাবৎ পৃচ্ছামি নৃপতিং পতিম্॥
ভগবন্নচলশ্রেষ্ঠ দিব্যদর্শন বিশ্রুত।
শরণ্য বহুকল্যাণ নমস্তেঽস্তু মহীধর॥
প্রণমে ত্বাঽভিগম্যাহং রাজপুত্রীং নিবোধ মাম্।
রাজস্নুষাং রাজভার্যাং দময়ন্তীতি বিশ্রুতাম্॥

... ...

কবিগুরু বাল্মীকির এই সকল বর্ণনা মনে রাখিয়াই বোধ হয় কালিদাস 'রঘুবংশে' রামের মুখে বলাইয়াছেন,—

ত্বং রক্ষসা ভীরু যতোঽপনীতা
তং মার্গমেতাঃ কৃপয়া লতা মে।
অদর্শয়ন্ বক্তুমশক্নুবত্যঃ
শাখাভিরাবর্জিতপল্লবাভিঃ॥
মৃগ্যশ্চ দর্ভাঙ্কুরনির্ব্যপেক্ষা-
স্তবাগতিজ্ঞং সমবোধয়ন্মাম্।
ব্যাপারয়ন্ত্যো দিশি দক্ষিণস্যা-
মুৎপক্ষ্মরাজীনি বিলোচনানি। (১৩।২৪-২৫)

'হে ভীরু, তোমাকে রাক্ষস যে পথ দিয়া হরণ করিয়াছে সেই পথের কথা বলিতে অশক্ত হইলেও এই লতাগুলি কৃপা করিয়া আনম্রপল্লব শাখাদ্বারা (ইঙ্গিতে) আমাকে সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। মৃগগণও কুশাঙ্কুরের প্রতি স্পৃহাহীন হইয়া পক্ষ্মপংক্তি

সমুল্লিখদ্ভিরেতৈর্হি ত্বয়া শৃঙ্গশতৈর্নৃপঃ।
কচিদ্দৃষ্টোঽচলশ্রেষ্ঠ বনেঽস্মিন্ দারুণে নলঃ॥
... ...
কিং মাং বিলপতীমেকাং পর্বতশ্রেষ্ঠ দুঃখিতাম্।
গিরা নাশ্বাসয়স্যদ্য স্বাং সুতামিব মানদ॥

আরাণ্য পর্ব, ৫২
(পি, পি, এস্, শাস্ত্রীর সংস্করণ)

ভবভূতির 'মালতী-মাধব' নাটকেও (৯ম অঙ্ক) দেখিতে পাই, নায়ক মাধব বিরহোন্মত্ত হইয়া সকল পার্বত্য এবং বন্য প্রাণিগণকে সম্বোধন করিতেছে; কিন্তু সে দৃশ্য বাল্মীকির এই সব দৃশ্যের ন্যায় চিত্তাকর্ষক নহে।

উন্মোচন পূর্বক নয়নের দ্বারা বার বার দক্ষিণ দিকে তাকাইয়া তোমার গমনপথের সংবাদে অজ্ঞ আমাকে সম্বোধিত করিতেছিল।'

কালিদাসের শকুন্তলা-নাটকের চতুর্থ অঙ্কে দেখিতে পাই, প্রিয়ংবদা যখন দুঃখ করিতেছিল যে, শকুন্তলার আভরণীয় রূপকে অলঙ্কৃত করা যাইতেছিল না তখন সহসা ঋষিকুমারদ্বয় প্রবেশ করিয়া শকুন্তলাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য নানাপ্রকার আভরণ দান করিল। আর্যা গৌতমী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহা কি তাত কাশ্যপের মানসী সিদ্ধি? দ্বিতীয় ঋষিপুত্র উত্তর করিল,—'তাহা নয়; তাত কাশ্যপ আমাদিগকে শকুন্তলার জন্য বনস্পতিগুলি হইতে কুসুম আহরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন; তারপরে—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডুতরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতম্
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ-
র্দত্তান্যাভরণানি নঃ কিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ॥

'কোন তরু ইন্দুপাণ্ডু মাঙ্গল্য ক্ষৌমবসন বাহির করিয়া দিল, কোন তরু চরণোপরাগসুভগ লাক্ষারস ক্ষরিত করিল, অন্যান্য তরুগণ আপর্বভাগোত্থিত বনদেবতা-করতলের দ্বারা কিশলয়োদ্ভেদের প্রতি-যোগিতায় নানা প্রকারের অন্যান্য আভরণ দান করিয়াছে।'

বাল্মীকির রামায়ণেও দেখিতে পাই, ভরত যখন রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গিয়াছিল তখন ভরদ্বাজমুনি ভরতকে আতিথ্য দান করিয়াছিলেন। এইরূপ মান্য অতিথির সংকারের জন্য ভরদ্বাজ মুনি সকল নদী এবং বনের নিকটই আহার্য, পেয় এবং ভূষণ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

প্রাক্স্রোতসশ্চ যা নদ্যস্তির্যক্স্রোতস এব চ।
পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ সমায়ান্ত্বদ্য সর্বশঃ॥
অন্যাঃ স্রবন্তু মৈরেয়ং সুরামন্যাঃ সুনিষ্ঠিতাম্।
অপরাশ্চোদকং শীতমিক্ষুকাণ্ডরসোপমম্॥

... .

বনং কুরুষু যদ্দিব্যং বাসোভূষণপত্রবৎ।
দিব্যনারীফলং শশ্বৎ তৎ কৌবেরমিহৈব তু॥

... ...

বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপপ্রচ্যুতানি চ।

(অযো—৯১।১৪-১৫, ১৯, ২১)

আরণ্য প্রকৃতির সহিত বাল্মীকি ও কালিদাস এই উভয় কবির নিবিড় যোগের একটা কারণ এই মনে হয়, বাল্মীকি ও কালিদাসের যুগে আমাদের গার্হস্থ্য আশ্রমই একমাত্র আশ্রম ছিল না, ব্রহ্ম-চর্যাশ্রম, বান-প্রস্থ এবং যতি-আশ্রম তখন জীবনের অধিক অংশ অধিকার করিয়াছিল ; এই আশ্রম ত্রয়ের ভিতর দিয়া—বিশেষ করিয়া বান-প্রস্থ এবং যতি-আশ্রমের ভিতর দিয়া আরণ্য প্রকৃতির সহিত সে যুগের লোকের একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা আরণ্য তপোবনের সভ্যতা। আরণ্যকগুলির ভিতরেই আমাদের প্রথম জাগিয়াছিল 'একে'র বাণী। নগরবাসী নৃপতিগণও পঞ্চাশোর্ধ্বে আরণ্য জীবন যাপন করিতেন ; তাই পার্বত্য অরণ্যও সেদিন মানুষের নিকটে জনপদের ন্যায় মর্যাদা এবং প্রীতি-সম্বন্ধ লাভ করিয়াছিল।

তা ছাড়া বাল্মীকি-রামায়ণের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় উপরি-উক্ত সকল বর্ণনা পাঠ করিলে একটা জিনিস স্বতঃই মনে হইবে, ইহা নিছক

কবি-জনোচিত আলঙ্কারিক বর্ণনা নহে; ইহার পশ্চাতে কবি-চিত্তের একটা দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাস রহিয়াছে। কালিদাসের ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণনা স্থানে স্থানে আলঙ্কারিক বর্ণনা বলিয়া মনে হইলেও বাল্মীকি-রামায়ণের সমস্ত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মিলাইয়া এই বর্ণনাগুলি পড়িলে মনে হইবে, সমগ্র কাব্যে যে-যুগের জীবনকে প্রতিফলিত করা হইয়াছে এই প্রাকৃতিক বর্ণনাগুলির পশ্চাতেও সেই যুগের একটা আদিম সহজ সরল বিশ্বাস দাঁড়াইয়া আছে। সে বিশ্বাসটি এই যে, চারিদিকের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটার কোন অংশই যেন একেবারে জড় অচেতন নহে, সকলের ভিতরে একটা সূক্ষ্ম অলৌকিক প্রাণস্পন্দন এবং চেতনা রহিয়াছে। ঊর্ধ্বের আকাশ, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারকা,—অন্তরীক্ষের বায়ু—নিম্নে পৃথিবীর বুকে বৎসর-মাস-দিবসের সুনিয়ত আবর্তন—ষড়ঋতুর আসা-যাওয়া—সকল পর্বত-অরণ্য, নদ-নদী, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী—ইহাদের সকলের ভিতরে যে চেতনা-সত্তা রহিয়াছে, মানুষের সহিত তাহার মঙ্গলময় গভীর আত্মীয়তা আছে। এই সরল বিশ্বাসটি স্পষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে বনে গমনোদ্যত রাম সম্বন্ধে জননী কৌশল্যার প্রার্থনা-বাণীতে। কৌশল্যা একদিকে যেমন বলিতেছেন,—

যং পালয়সি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥
যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেষ্বায়তনেষু চ।
তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ।
যানি দত্তানি তেঽস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তানি ত্বামভিরক্ষন্তু গুণৈঃ সমুদিতং সদা॥

পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ ॥

(অযো—২৫।৩-৬)

প্রীতি দ্বারা এবং নিয়মের দ্বারা তুমি যে ধর্মকে পালন করিতেছ, হে রাঘবশার্দূল, সেই ধর্মই তোমাকে বনে রক্ষা করুক। দেবায়তনে যাঁহাদিগকে প্রণাম কর, হে পুত্র, তাঁহারা মহর্ষিগণের সহিত বনে তোমাকে রক্ষা করুন। ধীমান্ বিশ্বামিত্র তোমাকে যে-সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, গুণসমুদিত তোমাকে তাহারা রক্ষা করুক। পিতৃশুশ্রূষা, মাতৃশুশ্রূষা এবং সত্যের দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া, হে মহাবাহো, তুমি চিরজীবী হইয়া থাক!' কৌশল্যার এই সকল প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাই,—

সমিৎকুশপবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষা ক্ষুপা হ্রদাঃ ॥
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম।
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥

... ...

ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ স্বস্তি কুর্বন্তু তে সদা ॥

... ...

স্মৃতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ।
শৈলাঃ সর্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ ॥
দ্যৌরন্তরিক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ ॥

(ঐ ৭-৮, ১০, ১৩-১৪)

'সমিৎকুশ-পবিত্র আয়তনগুলি, যজ্ঞের বেদী এবং বিপ্রগণের স্থণ্ডিল ভূমি,—শৈল, বনস্পতি, হ্রস্বশাখাযুক্ত তরুগুলি, হ্রদ—সকলে তোমাকে রক্ষা করুক ; পতঙ্গ, সর্প, সিংহ প্রভৃতি, হে নরোত্তম, তোমাকে রক্ষা করুক। সাধ্যগণ ও মরুদ্গণ বনের মহর্ষিগণের সহিত তোমার স্বস্তিবিধান করুন।··ছয় ঋতু, সকল মাস, সংবৎসর, রজনী, দিন— এমন কি প্রতিটি মুহূর্তও তোমার স্বস্তিবিধান করুক। পর্বতসমূহ সকল সমুদ্র—সমুদ্রাধিপতি বরুণ, দ্যৌ, অন্তরিক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, সমস্ত চরাচর, সকল নক্ষত্র এবং গ্রহগুলি সকল দৈবশক্তির সহিত আমাকর্তৃক স্তুত হইয়া বনে সর্বদার জন্য তোমাকে রক্ষা করুক।'[1]

বাল্মীকি-কালিদাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টির ভিতর দিয়া আমরা ভারতীয় মনের একটি বিশেষ পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি। ভারতীয় মনের সাধারণ বিশ্বাসে বহিঃপ্রকৃতি কোনদিনই সম্পূর্ণ জড় বলিয়া গৃহীত হয় নাই। আমরা হয় জড় প্রকৃতির পশ্চাতে চৈতন্যের খেলা আবিষ্কার করিয়াছি, নতুবা প্রত্যেকটি জড়মূর্তির পশ্চাতেই অভিমানী দেবতার পরিকল্পনা করিয়াছি। গভীর দৃষ্টিতে

(১) মহাভারতেও দেখিতে পাই, সীতার চরিত্রের পবিত্রতা প্রমাণ করিবার জন্য বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি রামচন্দ্রের নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।—

বায়ু :—ভো ভো রাঘব সত্যং বৈ বায়ুরস্মি সদাগতিঃ।
অপাপা মৈথিলী রাজন্ সঙ্গচ্ছ সহসীতয়া॥

অগ্নি :—অহমন্তঃশরীরস্থো ভূতানাং রঘুনন্দন।
সুসূক্ষ্মমপি কাকুৎস্থ মৈথিলী নাপরাধ্যতি॥

বরুণ :—সর্বমন্তশ্চরো বেদ্মি ভূতদেহেষু রাঘব।
অহং বৈ ত্বাং প্রবীম্যেতন্ মৈথিলী প্রতিগৃহ্যতাম্॥

(বনপর্ব ২৪৬।২৫-২৭)

দেখিলে, ইহাকে ভারতীয় অদ্বয়বাদেরই একটা বিশেষ প্রকাশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই অদ্বয়বাদ ভারতবর্ষে শুধু দার্শনিক রূপেই আত্মপ্রকাশ করে নাই, কবি-অনুভূতির ভিতরেও ইহার একটা গভীর প্রকাশ রহিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের ভিতরেও তাই এই অদ্বয়বাদের একটা ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসের সূত্রপাত বৈদিক সাহিত্যে—প্রথম বিবর্তন 'আরণ্যক' এবং উপনিষদে,—তারপরে তাহার রূপান্তর পাই রামায়ণ-মহাভারতে, কালিদাস প্রমুখ মধ্যযুগের কবিগণের কাব্যের ভিতরে এই অদ্বয়বাদ দেখা দিয়াছে আলঙ্কারিক কারুকার্যের শ্রীমণ্ডিতরূপে—সেই ধারাই চলিয়া আসিয়াছে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথের ভিতরেও (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। ঋষিকবি বাল্মীকির যে প্রকৃতি-বর্ণনা আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিলাম তাহার পটভূমিতে এই অদ্বয়বাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলে তাঁহার কবি-মানসটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়। রামায়ণের প্রকৃতি-বর্ণনার অনুরূপ কিছু কিছু বর্ণনা আমরা মহাভারত হইতেও পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, তাহা হইতেই মহাভারতকারের কবি-দৃষ্টিরও পরিচয় মিলিবে। মহাভারতের শান্তিপর্বের ভিতরে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবগণের ন্যায় বৃক্ষ-লতারও প্রাণ আছে—তাহাদের ভিতরেও নিরন্তর পঞ্চভূতের খেলা চলিতেছে।—

সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণাম্ অচৈতন্যং ন বিদ্যতে ॥
উষ্মতো ম্লায়তে বর্ণং ত্বক্‌ফলং পুষ্পমেব বা।
ম্লায়তে চৈব শীতেন স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে ॥

বায়ূগ্ন্যশনিনিষ্পেষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্যতে।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দ স্তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ॥
বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
নাপ্যদৃষ্টেশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ॥
পুণ্যাপুণ্যৈস্তথা গন্ধৈ র্ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি।
ভবন্ত্যরোগাঃ পুষ্পাঢ্যা স্তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ॥
পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাং চাপিদর্শনাৎ।
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে॥
বক্ত্রেণোৎপলনালেন যথোঽর্ধ্বং জলমাদদেৎ।
তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ॥
তেন তজ্জলমাদত্তং জরয়েদগ্নিমারুতৌ।
আহারপরিণামাচ্চ স্নেহো বৃদ্ধিশ্চ জায়তে॥
ঘনানামপি বৃক্ষাণাম্ আকাশোঽস্তি ন সংশয়ঃ।
তেষাং পুষ্পফলৈর্ব্যক্তি র্নিত্যং সমুপলভ্যতে॥

(শাস্ত্রীর সংস্করণ, শান্তিপর্ব ১৭২।১০-১৮)

"সুখদুঃখের গ্রহণহেতু, ছিন্ন অংশের পুনরুদ্গমহেতু আমি বৃক্ষ সকলের জীব (প্রাণ) দেখিতেছি, অচৈতন্য কিছুই দেখিতেছি না। তাপের দ্বারা বর্ণ, ত্বক এবং ফল-পুষ্প ম্লান হইয়া যায়, আবার শীতের দ্বারাও ম্লান হয়, অতএব বৃক্ষে স্পর্শ আছে। বায়ু, অগ্নি এবং অশনি নিষ্পেষের দ্বারা ফল পুষ্প বিশীর্ণ হইয়া যায়, শ্রোত্রের দ্বারাই শব্দ গৃহীত হয়, অতএব বৃক্ষগণ শ্রবণ করে। লতা বৃক্ষকে বেষ্টন করে, সকল দিকে গমন করে; যে দেখে না তাহার কোন পথও নাই; অতএব বৃক্ষগণ দেখিতেও পায়। এই বৃক্ষগুলি পবিত্রাপবিত্র গন্ধের

দ্বারা এবং বিবিধ ধূপের দ্বারা অরোগ এবং পুষ্প-সমৃদ্ধ হয়; অতএব বৃক্ষগুলি ঘ্রাণও গ্রহণ করে। ইহারা পাদের দ্বারা সলিল পান করে, ইহাদের ব্যাধি দেখা যায়—আবার ব্যাধিপ্রতিক্রিয়া-শক্তিও দেখা যায়, অতএব গাছের রস-গ্রহণ শক্তি আছে। মুখের দ্বারা উৎপল নালের সাহায্যে যেমন ঊর্ধ্বে জল গ্রহণ করে, তেমনই পবনসংযুক্ত হইয়া পাদদ্বারা পাদপগণ জল (বা রস) পান করে। এইরূপে বৃক্ষ যে জল গ্রহণ করে—অগ্নি এবং বায়ু তাহাকে জীর্ণ করিয়া দেয়; এই আহার-পরিণামের দ্বারা বৃক্ষের কোমলতা আসে এবং বৃদ্ধি হয়। ঘনীভূত বৃক্ষগুলির ভিতরেও যে আকাশ আছে এ-বিষয়ে কোন সংশয় নাই; তাহাদের ফুলফলের প্রকাশের দ্বারাই (তন্মধ্যস্থিত) আকাশের অবস্থান সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যায়।"

মোটের উপরে ভারতীয় বিশ্বাসে সমস্ত জড়প্রকৃতিই 'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ'—ইহাদের প্রত্যেকেরই ভিতরে ভিতরে সংজ্ঞা বা চেতনা রহিয়াছে—ইহারা প্রত্যেকেই সুখদুঃখসমন্বিত। ইহার পশ্চাতেই রহিয়াছে একটা ব্যাপক বিশ্বাস—সমগ্র সৃষ্টি সেই 'এক' হইতে জাত—এবং 'একে'র ভিতরেই বিধৃত।

কবি কালিদাসের সকল মণ্ডনকলা-সমন্বিত প্রাকৃতিক বর্ণনার পশ্চাতেও এইরূপ একটা অদ্বয়দৃষ্টি ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কালিদাস শুধু বনদেবতারই কল্পনা করেন নাই—অযোধ্যাপুরীরও অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন (রঘুবংশ ১৬ সর্গ)। কালিদাসের বিশ্বাসে শক্তিরূপিণী বিশ্ব-প্রকৃতি জ্ঞানমাত্রতনু মহেশ্বরের সহিত শব্দার্থের ন্যায় অভেদরূপে বিরাজ করেন। শকুন্তলা-নাটকের প্রারম্ভেও দেখিতে পাই, স্রষ্টা ঈশ্বরের অষ্টমূর্তি—আদি সৃষ্টি জল,

বিধিহুত হবিকে বহন করে যে অগ্নি, হোতা যজমান, দিনরাত্রিরূপ কালের জনক চন্দ্রসূর্য, শ্রুতির বিষয় বিশ্বব্যাপী আকাশ, সর্ববীজপ্রকৃতি ক্ষিতি, যাহা দ্বারা প্রাণিগণ প্রাণবন্ত সেই বায়ু—ইহারা সকলেই সেই একই চৈতন্যময় পুরুষের প্রত্যক্ষ প্রপঞ্চতনু।—

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবি র্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

কালিদাসের এই অদ্বয় বিশ্বাস তাঁহার কবিদৃষ্টির পশ্চাতে বর্তমান রহিয়াছে। ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'ও দেখিতে পাই (তৃতীয় অঙ্ক) শুধু যে বনদেবী বাসন্তীই প্রত্যক্ষ রূপ লইয়া নির্বাসিতা বনবাসিনী সীতার সখীত্ব লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, নদীদ্বয় তমসা-মুরলাও মূর্তিমতী হইয়া সীতার সখীত্ব লাভ করিয়াছিল। কালিদাসের সমসাময়িক এবং পরবর্তী সকল কবিগণের কবিদৃষ্টির পশ্চাতেই এই অদ্বয়বাদটি কবির জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে দাঁড়াইয়া আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই অদ্বয়বাদের প্রথম আভাস রহিয়াছে বেদের ভিতরে। যে সরল বিশ্বাসী মনের পরিচয় রহিয়াছে সমস্ত বেদের পাতায় পাতায় বাল্মীকি এবং কালিদাসের কাব্যে পাইতেছি সেই মনেরই বিশেষ বিশেষ যুগানুরূপ পরিণতি। বৈদিক কবিগণ বিশ্বসৃষ্টির কোন অংশকেই একান্ত জড় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়াই যেন একটি অখণ্ড দৈবশক্তি নিজেকে বহু বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছে। বৈদিকযুগে অবশ্য এই এক শক্তিকেই বহু প্রকাশের ভিতর দিয়া বৈদিক কবি ঋষিগণ বহু

দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই বহুর ভিতরে বহুভাবে প্রকাশিত দৈবশক্তির একত্ব আসিয়া স্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে আরণ্যক এবং উপনিষদের যুগের ব্রহ্মবাদের ভিতরে। বৈদিক প্রার্থনাগুলির ভিতরে আমরা দেখিতে পাইব, একদিকে যেমন ইন্দ্র, বরুণ, ঊষা, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেবতাগণের বর্ণনা এবং তাঁহাদের নিকটে প্রার্থনা রহিয়াছে,—তেমনই প্রার্থনা রহিয়াছে জল, বায়ু, পর্বত, নদী, অরণ্য, বনস্পতি, ওষধি, দিন-রাত্রি, সংবৎসর প্রভৃতি সকলের নিকটে। ঋক্‌সংহিতার ভিতরে দেখিতে পাই, কবি জলের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন,—

অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ
সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥ (১।২৩।১৮)

'জলরূপ দেবীকে আহ্বান করিতেছি—যেখানে আমাদের গরুগুলি পান করে; এই সিন্ধুদিগের জন্য আমাদের হবি বিধান করা কর্তব্য।'

অপ্‌স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে।
দেবা ভবত বাজিনঃ।
অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ ॥
আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম।
জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥
ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্ ॥
(১।২৩।১৯-২২)

'জলের মধ্যে অমৃত, জলের মধ্যে ঔষধ ; অতএব জলের প্রশস্তির জন্য, হে দেবস্বরূপ ঋত্বিক্‌গণ, আপনারা সত্বর হউন। জলের মধ্যে সকল ঔষধ আছে, জলের মধ্যে বিশ্বের সুখকর অগ্নি আছে, ইহা আমাকে সোমদেব বলিয়াছেন ; সুতরাং জলই 'বিশ্বভেষজী'—অর্থাৎ সকল ভেষজের আধার। হে জল সমূহ, আপনারা আমার শরীরের নিমিত্ত রোগনাশক ঔষধকে পূরণ (অর্থাৎ বর্ধন) করুন, এবং আমরা যেন নীরোগ হইয়া চিরকাল সূর্যকে দেখি। হে জল সমূহ, আমাতে যাহা কিছু পাপ আছে, অথবা আমি বুদ্ধিপূর্বক সর্বতোভাবে যে দ্রোহ করিয়াছি, অথবা যে শাপ দিয়াছি, যাহা কিছু অসত্য বলিয়াছি তাহা সকল আপনাদের প্রবাহের দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যান।'

ঋগ্‌বেদের ভিতরে বহু স্থানে দেখিতে পাই, ঋষি নদীর নিকট স্তবের দ্বারা প্রার্থনা জানাইতেছেন।—

উত ত্যে নঃ পর্বতাসঃ সুশস্তয়ঃ সুদীতয়ো নদ্যস্ত্রামণে ভুবন্।

(৫।৪৬।৬)

'উৎকৃষ্ট স্তবার্হ পর্বতসকল এবং দানশীল নদীগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্মিভি-
র্মহো মহীরবসা যংতু বক্ষণীঃ।
দেবীরাপো মাতরঃ সূদয়িত্ন্বো।
ঘৃতবৎপয়ো মধুমন্নো অর্চত॥ (১০।৬৪।৯)

'সরস্বতী, সরযূ, সিন্ধু—এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী প্রবাহশালিনী নদী (আমাদিগকে) রক্ষা করিতে আসুন। জলপ্রেরণকারিণী

জননীস্বরূপা এই সকল দেবী আমাদিগকে ঘৃতবৎ এবং মধুমৎ জল অর্পণ করুন।' (রঃ দঃ)

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তটি সম্পূর্ণই নদীর স্তব; সেখানেও বলা হইয়াছে,—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি
শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়া-
র্জীকীয়ে শৃণু হ্যা সুষোময়া॥ (১০।৭৫।৫)

'হে গঙ্গা! হে যমুনা, সরস্বতি, শতদ্রু ও পরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী-সংগত মরুৎবৃধা নদি! হে বিতস্তা ও সুষোমা-সংগত আর্জীকীয়া নদি! তোমরা শ্রবণ কর।' (রঃ দঃ)

মাতৃস্থানীয়া নদীদের সহিত মানুষের আত্মীয়তা মধুর হইয়া উঠিয়াছে বিপাশা (বিপাশ) ও শতদ্রু (শুতদ্রু) নদীদ্বয়ের সহিত বিশ্বামিত্র ঋষির কথোপকথনে। এই জলবতী বিপাশা ও শতদ্রু নদীদ্বয় শৈলের উৎসঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া সাগরসঙ্গমে গমনাভিলাষিণী হইয়া অশ্বশালা হইতে বিমুক্ত অশ্বদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর স্পর্ধা করত—শুভ্র দুইটি গাভীর ন্যায়—বৎসলেহনাভিলাষিণী (গাভীদ্বয়ের) ন্যায়—বেগে প্রবাহিত হইতেছিল (৩।৩৩।১)। বিশ্বামিত্র ঋষি পিজবনের পুত্র সুদাস রাজার যজ্ঞ করাইয়া ধন-গবাদিসহ ফিরিতেছিলেন; জলভারে স্ফীত নদীদ্বয়কে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—

ইন্দ্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমাণে
অচ্ছা সমুদ্রং রথ্যেব যাথঃ।

সমারাণে ঊর্মিভিঃ পিন্বমানে
অন্যা বামেন্যামপ্যেতি শুভ্রে ॥
অচ্ছা সিন্ধুং মাতৃতমাময়াসং
বিপাশমুর্বীং সুভগামগন্ম।
বৎসমিব মাতরা সংরিহাণে
সমানং যোনিমনু সঞ্চরন্তী ॥ (৩৷৩৩৷২-৩)

'ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার (ইন্দ্রের) প্রার্থনা রক্ষা করিবার জন্য তোমরা রথিদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছ। তোমরা একযোগে প্রবাহিত হইয়া, তরঙ্গদ্বারা (পরিসর প্রদেশে) বর্ধিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকটে গমন করিয়া শোভা পাইতেছ। আমি মাতৃসমা সিন্ধুর (শতদ্রুর) নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, মহতী সৌভাগ্যবতী বিপাশা নদীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মাতৃদ্বয় বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় একই স্থান (সমুদ্র) লক্ষ্য করিয়া সঞ্চরমাণা।'

বিশ্বামিত্রের এই সকল স্তবস্তুতি শুনিয়া নদীদ্বয় বুঝিতে পারিল, ঋষির নিশ্চয়ই বিশেষ কোন প্রার্থনা রহিয়াছে; তাহারা বলিয়া উঠিল,—

এনা বয়ং পয়সা পিন্বমানা
অনু যোনিং দেবকৃতং চরন্তীঃ।
ন বর্তবে প্রসবঃ সর্গতক্তঃ
কিংযুর্বিপ্রো নদ্যো জোহবীতি ॥ (৩৷৩৩৷৪)

'আমরা এই জলদ্বারা বর্ধিত হইয়া দেবকৃত স্থানের অভিমুখে গমন করিতেছি। গমনে প্রবৃত্ত আমাদের এই উদ্যোগ নিবৃত্ত

হইবার নহে ; কি ইচ্ছা করিয়া এই বিপ্র বার বার নদীদিগকে আহ্বান করিতেছে ?'

তখন বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন,—

রমধ্বং মে বচসে সোম্যায়
ঋতাবরীরুপ মুহূর্তমেবৈঃ।
প্র সিন্ধুমচ্ছা বৃহতী মনীষা-
বস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ ॥ (৩।৩৩।৫)

'হে জলবতী নদীদ্বয়, আমার সোমসম্পাদক বাক্যের জন্য মুহূর্তের জন্য গমন হইতে বিরত হও। আমি কুশিকের পুত্র, আমি প্রসাদাভিলাষে মহতী স্তুতি দ্বারা নদীকে আমার উদ্দেশে আহ্বান করিতেছি।'

নদীদ্বয় বলিল,—'নদীগণের পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করিয়া বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদিগকে খনন করিয়াছেন—জগৎপ্রেরক সুহস্ত দ্যুতিমান ইন্দ্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন,—তাঁহার আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হইয়া গমন করিতেছি।' (৩।৩৩।৬)।

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—'ইন্দ্র যে অহিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বীরকর্ম সর্বদা কীর্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দিকে আসীন (অবরোধকারীদিগকে) বজ্র দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। গমনাভিলাষে জল সমূহ আগমন করিয়াছিল।' (৩।৩৩।৭)

নদীদ্বয় বলিল,—'হে স্তোতা, তুমি এই যে বাক্য ঘোষণা করিতেছ, তাহা বিস্মৃত হইও না ; ভবিষ্যৎ যজ্ঞদিবসে তুমি উক্‌থ রচনা করিয়া আমাদিগকে সেবা করিও। আমরা তোমাকে সেবা করিতেছি, আমাদিগকে পুরুষের ন্যায় (প্রগল্‌ভ) করিও না।' (৩।৩৩।৮)

নদীদ্বয়কে কিঞ্চিৎ প্রসন্নমনা দেখিয়া বিশ্বামিত্র মুনি তখন তাঁহার প্রার্থনা জানাইলেন,—

ও ষু স্বসারঃ কারবে শৃণোত
যযৌ বো দূরাদনসা রথেন।
নি ষু নমধ্বং ভবতা সুপারা
অধো অক্ষাঃ সিন্ধবঃ স্রোত্যাভিঃ॥ (৩।৩৩।৯)

'হে ভগিনীদ্বয় স্তবকারী আমার কথা শোন,—আমি অতি দূর হইতে অশ্ব ও রথ লইয়া তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি; তোমরা সু-অবনত হও, সুপারা হও (অর্থাৎ আমি যেন অনায়াসে অশ্ব-রথাদি লইয়া ওপারে যাইতে পারি),—হে নদীদ্বয়, তোমরা স্রোতের জল লইয়া রথচক্রের অক্ষের অধোদেশে গমন কর।'

তখন নদীদ্বয় বলিল,—

আ তে কারো শৃণবামা বচাংসি
যথাথ দূরাদনসা রথেন।
নি তে নংসৈ পীপ্যানেব যোষা
মর্যায়েব কন্যা শশ্বচৈ তে॥ (৩।৩৩।১০)

'হে স্তোতা, আমরা তোমার কথা শুনিব, অশ্ব এবং রথের সহিত গমন কর; তুমি দূর হইতে আসিয়াছ,—সুতরাং আমরা তোমার জন্য অবনত হইতেছি; স্তন্য পান করাইবার জন্য মায়ের মতন অবনত হইতেছি,—যুবতি যেরূপ মনুষ্যদিগকে আলিঙ্গন করায় সেইরূপ অবনত হইতেছি।' এখানকার 'পীপ্যানেব যোষা' এই একটি উপমার ভিতর দিয়া বৈদিক কবির ভাবদৃষ্টি একটি অপূর্ব প্রকাশ লাভ করিয়াছে। মা যেমন শিশুকে স্তন্য পান করাইবার জন্য অবনত

হয়,—সে অবনতির ভিতরে যেমন কোন অপমান নাই, রহিয়াছে মাতৃত্বের অসীম গৌরব, নদীদ্বয়ও স্তবকারী বিশ্বামিত্রের নিকটে ঠিক তেমন করিয়াই অবনত হইবে।

বেদ পড়িলে অনেক স্থানে মনে হয়, কুলুকুলুনাদিনী নদীদিগের সত্যই একটা ভাষা রহিয়াছে—তাহাদের একটা বলিবার কথা রহিয়াছে ; বেদের কবি যেন নদীর এই ভাষা কিছু কিছু জানিতেন। এক স্থানে দেখিতে পাই, কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

এতা অর্ষংত্যললাভবন্তী-
ঋতাবরীরিব সংক্রোশমানাঃ।
এতা বি পৃচ্ছ কিমিদং ভনন্তি
কমাপো অদ্রিং পরিধিং রুজন্তি॥ (৪।১৮।৬)

"অ-ল-লা" এইরূপ শব্দ করিতে করিতে এই জলবতী (নদীগণ) হর্ষসূচক শব্দ করত গমন করিতেছে। উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহারা কি বলিতেছে। জল সমূহ আবরক কোন্ মেঘকে ভেদ করে ?'

ঋষি-কবিগণ রাত্রির নিকটেও আহ্বান জানাইয়াছেন,—'হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেসিনীং'—জগতের উপবেশনস্থল রাত্রিকে আহ্বান করিতেছি। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তে অতি চমৎকার রাত্রির স্তব দেখিতে পাই,—রাত্রি আসিয়া চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, নক্ষত্র সমূহের দ্বারা অশেষ শোভা সম্পাদন করিয়াছে,—যাহারা নিম্নে থাকে এবং যাহারা উর্ধ্বে থাকে, রাত্রি তাহাদের সকলকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ; গ্রাম সমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে,—পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্যেনগণ—সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া শয়ন করিয়াছে। এই রাত্রির নিকট ঋষিকবি প্রার্থনা করিতেছেন,—

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ॥

*　　　　*　　　　*

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব॥

*　　　　*　　　　*

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে॥ (১০।১২৭।৪, ৬, ৮)

'পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ যাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদিগের শুভঙ্করী হউন।… হে রাত্রি, বৃকী ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও; চোরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদের পক্ষে বিশিষ্টরূপে শুভঙ্করী হও।…হে আকাশের কন্যা রাত্রি! তুমি যাইতেছ, তোমাকে গাভীর ন্যায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর।' (রঃ দঃ)[১]

বেদের ভিতরে বহু স্থানেই দ্যাবা-পৃথিবী—অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবীর নিকট স্তব এবং প্রার্থনা দেখিতে পাই। প্রায় সর্বত্রই এই দ্যাবা-পৃথিবী প্রাণিগণের পিতামাতারূপে বর্ণিত হইয়াছে। এক স্থানে বলা হইয়াছে—

(১) যাং দেবাঃ প্রতিনন্দন্তি রাত্রিং ধেনুমুপায়তীং।
সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তু সুমঙ্গলী।
(অথর্ববেদ-সংহিতা, ৩।১০।২)

আরও তুঃ—অথর্ববেদ-সংহিতা, (১৯।৪৭।১-২, ১৯।৪৯।১, ৪, ৮)

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং
পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥

* * *

ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা
অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে
পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ ॥ (১।১৮৫।২,১০)

'পাদরহিতা, অবিচলা দ্যাবা-পৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণিসমূহকে) পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। হে দ্যাবা-পৃথিবি! আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।... আমি প্রজ্ঞাবান্, আমি দ্যাবা-পৃথিবীর উদ্দেশে চারিদিকে প্রকাশের জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্র করিয়াছি, পিতামাতা নিন্দনীয় পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে সর্বদা নিকটেই রাখিয়া তৃপ্তিকর বস্তুদ্বারা পালন করুন।' (রঃ দঃ)

দশম মণ্ডলের ১৪৬ সূক্তে যে অরণ্যানীর বর্ণনা ও স্তব রহিয়াছে সে বর্ণনার সহিত কবির অন্তরঙ্গতা লক্ষণীয়। প্রথমেই কবি বলিতেছেন,—

অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিংদতী ॥ (১০।১৪৬।১)

'হে অরণ্যানি! হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্ধান হইয়া যাও (অর্থাৎ কত দূর চলিয়াছ, স্থির করা যায় না)।

তুমি গ্রামে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না? তোমার কি একাকী থাকিতে ভয় করে না?' (রঃ দঃ) এই অরণ্যানীর ভিতরে মাঝে মাঝে যে দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত সে যুগের কবির তাহার সহিত পরিচয় রহিয়াছে। ভয়বিহ্বল কবির মনে প্রকৃতির এই রুদ্র রূপের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের আগ্রহ দেখা যায়!—

যদযুক্‌থা অরুষা রোহিতা রথে
বাতজূতা বৃষভস্যেব তে রবঃ।
আদিন্বসি বনিনো ধূমকেতু-
নাগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥
অধ স্বনাদুত বিভ্যুঃ পতত্রিণো
দ্রপ্সা যত্তে যবসাদো ব্যস্থিরন্।
সুগং তত্তে তাবকেভ্যো রথেভ্যো-
ঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥

(১।৯৪।১০-১১)

'হে অগ্নি, যখন তোমার রোচমান লোহিত এবং বায়ুগতি অশ্বদ্বয় রথে সংযোজিত কর, তখন তোমার রব বৃষভের ন্যায় হয়; তাহার পর বনভূমির বৃষ সকলকে ধূমরূপ কেতুর দ্বারা আচ্ছন্ন কর। তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হই না। হে অগ্নি, অনন্তর দগ্ধ করিতে করিতে বনে প্রবেশানন্তর তোমার গম্ভীর শব্দ শুনিয়া পক্ষিগণ ভীত হয়, তোমার জ্বালার এক দেশ অরণ্যের তৃণগুলির ভক্ষক হইয়া তখন বিবিধ প্রকারে অবস্থিত করে, তখন তোমার এবং তোমার রথের পথ সুগম হয়। তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হই না।'

চতুর্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে 'ক্ষেত্রপতি' দেবতার স্তব দেখিতে পাই। ইনি শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। ইহার কাছে প্রার্থনা করিয়া কবি বলিতেছেন,—

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো
মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্ব-
রিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম॥
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ
শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং
শুনমষ্ট্রামুদিংগয়।
শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং
শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ
শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্॥ (৪।৫৭।৩-৪,৮)

'ওষধী সমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ, জলসমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিব। বলীবর্দ সমূহ সুখে (বহন করুক), মনুষ্যগণ সুখে (কার্য করুক), লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হউক, এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর।...ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জন্য মধুর জল দ্বারা (পৃথিবী সিক্ত করুন)। হে শুনাসীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।' (রঃ দঃ)

এই সকল প্রার্থনারই পূর্ণতম রূপ দেখিতে পাই নিম্নোক্ত প্রার্থনায়—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসঃ।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥

'বাতাস সকল ঋতুতেই মধু বহন করে, নদীসকল মধুক্ষরণ করে, আমাদের ওষধিগুলি মধুময় হউক; রাত্রি মধুময় হউক, ঊষা মধুময় হউক। পৃথিবীর ধূলি মধুময় হউক, আমাদের পিতা ও দ্যুলোক মধুময় হউক; আমাদের বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য মধুমান্ হউক আমাদের গোরুগুলিও মধুময় হউক।'

বিশ্বসৃষ্টির পানে তাকাইয়া বেদের ঋষি সকলের নিকটেই প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

শৃণোতু নঃ পৃথিবী দ্যৌরুতাপঃ
সূর্যো নক্ষত্রৈরুর্বন্তরিক্ষং ॥
শৃণ্বন্তু নো বৃষণঃ পর্বতাসো
ধ্রুবক্ষেমাস ইলয়া মদন্তঃ।
আদিত্যৈর্নো অদিতি শৃণোতু
যচ্ছন্তু নো মরুতঃ শর্ম ভদ্রং ॥ (৩।৫৪।১৯-২০)

'পৃথিবী, দ্যুলোক, জলসমূহ, সূর্য ও নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরিক্ষ আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ করুন। অভীষ্টবর্ষী (মরুৎগণ) এবং নিশ্চল পর্বতগণ হব্য দ্বারা হৃষ্ট হইয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন।

আদিত্যগণের সহিত অদিতি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন, মরুদ্‌গণ আমাদিগকে কল্যাণকর সুখ দান করুন।' (রঃ দঃ)

প্রৈষ স্তোমঃ পৃথিবীমন্তরিক্ষং
বনস্পঁতী রোষধী রায়ে অশ্যাঃ।
দেবোদেবঃ সুহবো ভূতু মহ্যং
মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ॥
(৫।৪২।১৬)

'ধনের নিমিত্ত মৎকৃত এই স্তোত্র পৃথিবী, স্বর্গ, বৃক্ষ, ওষধিবর্গের নিকট উপস্থিত হউক ; আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করিয়া কৃতার্থ হই ; মাতা পৃথিবী যেন আমাদিগকে নিগ্রহ বুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন।' (রঃ দঃ)

অবন্তু মামুষসো জায়মানা
অবন্তু মা সিন্ধবঃ পিন্বমানাঃ।
অবন্তু মা পর্বতাসো ধ্রুবাসো-
ঽবন্তু মা পিতরো দেবহূতৌ॥
... ...
পর্জন্যো ওষধীভির্ময়োভু-
রগ্নিঃ সুশংসঃ সুহবঃ পিতেব॥ (৬।৫২।৪,৬)

'জায়মানা উষা আমাদিগকে রক্ষা করুন, স্ফীত সিন্ধুগুলি আমাকে রক্ষা করুক, নিশ্চল পর্বতগণ আমাকে রক্ষা করুক।...ওষধিগণের সহিত পর্জন্য যেন আমাদিগের সুখদাতা হন, অগ্নি যেন পিতার ন্যায় অনায়াসে স্তুত্য ও আহ্বানযোগ্য হন।' বেদের কতগুলি সূক্ত এই সমগ্র বিশ্বেদেবতাগণের স্তুতিতে মুখরিত।

ক্রিয়াকাণ্ড-প্রধান যজুর্বেদেও দেখিতে পাই, অশ্বমেধ যজ্ঞে এক-দিকে যেরূপ সমস্ত দেবতার আহ্বান এবং বন্দনা রহিয়াছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনই সমস্ত দিক্, সব রকমের জল (প্লাবনের জল, স্থির স্রোতোহীন জল, স্রবণশীল জল, স্যন্দমান জল, কূপের জল, ঝরণার জল, সমুদ্রের জল প্রভৃতি), বায়ু, ধূম, অভ্র, মেঘ, (বিদ্যুতের মেঘ, গর্জনকারী মেঘ, স্ফূর্জৎ মেঘ, বর্ষণশীল মেঘ, ধারাসার বর্ষণশীল মেঘ, উগ্র বর্ষণশীল মেঘ, শীঘ্র বর্ষণশীল মেঘ, গুড়ি গুড়ি বর্ষণশীল মেঘ প্রভৃতি) নক্ষত্র, নক্ষত্রিয়, অহোরাত্র, অর্ধমাস, মাস, ঋতু, সংবৎসর, দ্যাবা-পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, রশ্মি, বনস্পতি, পুষ্প, ফল, শাখা, ওষধি প্রভৃতির আহ্বান ও বন্দনা রহিয়াছে। (শুক্ল যজুর্বেদ ২২।২৪-২৮; আরও তুলনীয়, ৩৯।২)। যজ্ঞে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, প্রাচ্যাদি দিক্‌সমূহ, বৎসর, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর প্রভৃতিকে আহুতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। (কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ৭।৭।১।১৫) অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে বিশ্বসৃষ্টির সহিত মিলাইয়া লইবার চেষ্টা রহিয়াছে। উষা এই অশ্বের শির, সূর্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, চন্দ্র কর্ণ, দিক্‌গুলি পদ, অহোরাত্র চক্ষুর উন্মেষ নিমেষ, পক্ষগুলি হস্তপদের পর্ব, ঋতুগুলি অঙ্গ-সকল, সংবৎসর আত্মা, রশ্মি সমূহ কেশ, নক্ষত্র রূপ, ওষধি সমূহ এই অশ্বের লোম, অগ্নি মুখ, সমুদ্র ইহার উদর। (কৃষ্ণযজুর্বেদ ৭।৭।৫।২৫)। পরবর্তী কালের বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই, এই যে বিশ্বসৃষ্টির বিরাট অশ্ব ইহাকে ধ্যান করিলেই ইহার ভিতর দিয়া বিশ্বদেবতার মহিমা উপলব্ধি করা যায়।

অথর্ববেদের বহু স্থানে দেখিতে পাই, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্রমা, ভূমি, আপ, দ্যৌ, অন্তরীক্ষ, দিক্, ঋতু, বাক্, পর্জন্য, অহোরাত্র, বনস্পতি,

ওষধি ও বীরুধ সমূহের নিকট প্রার্থনা রহিয়াছে।[১] চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চদশ সূক্তে একটি চমৎকার বর্ষার আহ্বান রহিয়াছে এবং তাহার নিকট প্রার্থনা রহিয়াছে। কবি বলিতেছেন,—বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত মেঘাবৃত দিক্‌গুলি ছুটিয়া আসুক; বায়ুর সহিত জলপূর্ণ মেঘগুলি এক হইয়া আসুক; মহাবৃষের ন্যায় গর্জনকারী বায়ু-প্রেরিত মেঘগুলির শব্দায়মান জলধারা পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক, শোভনদান যুক্ত মহৎ মরুৎ সমূহ এই বৃষ্টিকে দেখুক অর্থাৎ বৃষ্টির সহিত মরুদ্‌গণ আমাদিগকে মহাদানে অনুগৃহীত করুক; বৃষ্টি-জলের রস সমূহ ওষধির ভিতর দিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করুক, এই বর্ষাধারা নিম্নভূমিকে পূজা করুক, নানাবিধ ওষধি সমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জাত হইয়া পৃথিবীকে ভূষিত এবং সমৃদ্ধ করুক। স্তবগানকারী আমাদিগকে অভ্রগুলি দেখাও; বেগযুক্ত বর্ষাধারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চলিতে থাকুক, বৃষ্টিধারা ভূমিভাগকে মহনীয় করুক,—নানা প্রকারের আরণ্য তরুলতা জাত হউক। হে পর্জন্যদেব, গর্জনকারী মরুদ্‌গণ তোমার সমীপে আসিয়া গান করুক, বর্ষার পৃথক্ পৃথক্ ধারাগুলি নিম্নে মিলিত হইয়া পৃথিবীকে আর্দ্র করুক। হে পর্জন্য, তুমি গর্জন কর, মেঘগুলিকে শব্দযুক্ত কর, জলধিকে পীড়িত কর, ভূমিকে দুগ্ধসম জল দ্বারা সংসিক্ত কর। তোমার প্রেরিত বহুল বর্ষণ-সমর্থ অভ্রগুলি ছুটিয়া আসুক, ধারাসম্পাতকামী সূর্য কৃশ গোরুর ন্যায় অস্ত গমন করুক। শোভনদানশীল মরুদ্‌গণ তোমাদের মঙ্গল দান করুন, অজগরের ন্যায় স্থূল বারিধারা নামিয়া আসুক; মরুদ্‌গণ দ্বারা প্রেরিত মেঘগুলি

(১) অথর্ববেদ-সংহিতা, ৫।২৮।২, ৮।২।২২, ১১।৬ (৮)।১, ১১।৬(৮)।৫, ১১।৬(৮)।৬-৭, ১০, ১৭ প্রভৃতি।

পৃথিবীর উপর বর্ষণ করুক। দিকে দিকে বিদ্যুৎ দ্যোতিত হইয়া উঠুক, দিকে দিকে বাতাস প্রবাহিত হউক, মরুদ্‌গণ কর্তৃক প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীর সঙ্গে নামিয়া আসুক। জাতবেদা অগ্নি আকাশ হইতে প্রজাগণের জন্য অমৃত ক্ষরণ করুন। সৎ ব্রতচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় যে দার্দুরীকুল সমস্ত বৎসর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, প্রচুর জলধারা বর্ষণে সেই দার্দুরীকুল এখন মুখর হইয়া পর্জন্যপ্রীতিকর রবে ভরিয়া দিক।[১]

(১) সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ
সমভ্রাণি বাতজূতানি যন্তু।
মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো
বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু॥
সমীক্ষয়ন্তু তবিষাঃ সুদানবো-
ঽপাং রসা ওষধীভিঃ সচন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং
পৃথগ্ জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ॥
সমীক্ষয়স্ব গায়তো নভাংস্যপাং
বেগাসঃ পৃথগুদ্ বিজন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং
পৃথগ্ জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ॥
গণাস্ত্বোপ গায়ন্তু মারুতাঃ পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্।
সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো বর্ষন্তু পৃথিবীমনু॥
... ...
অভি ক্রন্দ স্তনয়ার্দয়োদধিং
ভূমিং পর্জন্য পয়সা সমঙ্গ্ধি।
ত্বয়া সৃষ্টং বহুলমৈতু বর্ষ-
মাশারৈষী কৃশগুরেত্বস্তম্॥

অথর্ববেদের দ্বাদশকাণ্ডের প্রথম সূক্তে যে পৃথিবীর বন্দনা রহিয়াছে তাহা একদিকে যেমন সহজ কবিত্বময়, অন্যদিকে সেই বন্দনার ভিতর দিয়া মাতা বসুন্ধরার সহিত মানুষের নাড়ীবন্ধন অতি দৃঢ় হইয়া দেখা দিয়াছে। নদ-নদী, মাঠ-ঘাট, অরণ্য-পর্বত, বৃক্ষলতা, ওষধি—সকলের ভিতর দিয়া সেই জননীর স্নেহ শতরূপে আমাদের উপরে বর্ষিত হোক, ইহাই কবির প্রার্থনা।

উপরে আলোচিত বৈদিক গাথাগুলি হইতে বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় মনের আদিম ধারাটির সন্ধান মিলিবে। এই ধারাটিই প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে পরবর্তী যুগে। এই গুলির সহিত বাল্মীকির ও কালিদাসের কাব্য মিলাইয়া পড়িলে মনে হইবে, বাল্মীকির কাব্য যেমন দাঁড়াইয়া আছে কালিদাসের কাব্যের পটভূমি-রূপে, বৈদিক সাহিত্য তেমনইভাবে দাঁড়াইয়া আছে বাল্মীকির কাব্যের পটভূমি-রূপে। বৈদিক যুগে যাহা দেখা গিয়াছিল মানুষের একটা সহজ সরল বিশ্বাসরূপে, বাল্মীকির যুগে তাহারই সহিত এখানে-সেখানে কিছু কিছু কবিকল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। কালিদাসের যুগে আসিয়া দেখিতে পাই, সেই আদিম বিশ্বাস কবিমানসের অবচেতনে মগ্ন হইয়াছে; তাহার উপরে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি-কল্পনা এবং কবিকল্পনাশ্রিত বিবিধ মণ্ডনশ্রী। ইহাই অতি স্বাভাবিক হইয়াছে,—একদিকে যেমন যুগের সহিত যুগের যোগ অব্যাহত

সং বোবন্তু সুদানব উৎসা অজাগরা উত।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু॥
আশামাশাং বি দ্যোততাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ।
মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সং যন্তু পৃথিবীমনু॥ ইত্যাদি
(৪।১৫।১-৪, ৬-৮)

রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি যুগের সহিত যুগের ব্যবধানও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাস ও বাল্মীকির কাব্যে বর্ণিত প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আর একটি জিনিষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—উহা উভয় কবির ঋতু-বর্ণনা। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যে ষড়্-ঋতুর বর্ণনা রহিয়াছে, অন্যান্য কাব্যের ভিতরেও বিশেষ করিয়া বসন্ত, বর্ষা এবং শরৎ ঋতুর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা পাই। বাল্মীকির রামায়ণের তিনটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা পাইতেছি।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে' যে অকাল বসন্তের প্রসিদ্ধ বর্ণনা রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই বসন্ত ঐ নাটকীয় সর্গটির ভিতরে একটা জীবন্ত চরিত্র হইয়া উঠিয়াই চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত 'রঘুবংশের' নবম সর্গে রাজা দশরথের শিকারে ভ্রমণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে যে বসন্তের বর্ণনা রহিয়াছে এবং 'ঋতুসংহার' কাব্যে যে বসন্তের বর্ণনা রহিয়াছে, ইহার কোন বর্ণনার ভিতর দিয়াই কবির কোন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে নাই। এই বসন্ত ঋতুকে কালিদাস্ নিছক সম্ভোগ-বিলাসী রসিকের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন; এই শৃঙ্গারের বিভাব স্থানীয় বসন্তের সহিত মানুষের যোগও ভোগ-তরল; বসন্তের অপর্যাপ্ত মণ্ডনকলাতেই এখানকার

যেটুকু চমৎকারিত্ব। 'ঋতুসংহারে' শুধু বসন্ত ঋতু নহে, সব ঋতুই শুধু মানুষের শৃঙ্গার-উদ্দীপক; এই এক দৃষ্টিতেই কবি সকল ঋতুর পানে তাকাইয়াছেন। ঋতুগুলির এই শৃঙ্গার উদ্দীপনার ভিতরে আমরা কবিমনের বিশেষ কোন রং লক্ষ্য করিতে পারি না। কিন্তু বাল্মীকির বসন্ত-বর্ণনায় মানুষের মনের রং লাগিয়াছে। বিরহী রামচন্দ্রের নিকট পম্পাসরোবরের চারিদিকে যে বসন্ত আসিয়া দেখা দিয়াছিল, সে রামচন্দ্রের মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল।

অশোকস্তবকাঙ্গারঃ ষট্পদস্বননিস্বনঃ।
মাং হি পল্লবতাম্রার্চির্বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি ॥ (কি-১।২৯)

'অশোকস্তবকগুলিই অঙ্গার, ভ্রমরগুঞ্জনই অগ্নিনিস্বন; পল্লবের তাম্র-অর্চি লইয়া বসন্তের আগুন আমাকে প্রদগ্ধ করিতেছে।'[১] এই অবস্থাতে—

পদ্মকোশপলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টির্হি মন্যতে।
সীতায়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ ॥
পদ্মকেসরসংসৃষ্টো বৃক্ষান্তরবিনিঃসৃতঃ।
নিশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ ॥ (ঐ-১।৭০-৭১)

(১) কিন্তু কালিদাস বলিয়াছেন,—

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ
সর্বত্র কিংশুক-বনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
সদ্যো বসন্ত-সময়ে হি সমাচিতেয়ং
রক্তাংশুকা নব-বধূরিব ভাতি ভূমিঃ ॥

ঋতুসংহার; (ষষ্ঠ, ১৯)

'বসন্ত সময়ে সদ্য আদীপ্ত বহ্নিসদৃশ সমীরণ-কম্পিত কুসুম-ভারাবনত পলাশবনের দ্বারা সমাচ্ছাদিত এই ভূমি রক্তাংশুক পরিহিতা নববধূর ন্যায় শোভা পাইতেছে।'

পদ্মকোশ-দলগুলি দেখিতে সীতার দুইটি নেত্রকোশের মত বলিয়াই মনে হয়; আর পদ্মকেসর-সংস্পৃষ্ট বৃক্ষান্তর হইতে বিনিঃসৃত বায়ু সীতার মনোহর নিশ্বাসের ন্যায়ই বহিতেছে। বসন্তে বনের বাতাসের ভিতরে যে মত্ততা আসিয়াছে কবিগুরুর সে বর্ণনার ভিতরে স্বকীয়তা রহিয়াছে।

পাদপাৎ পাদপং গচ্ছন্ শৈলাৎ শৈলং বনাদ্বনম্।
বাতি নৈকরসাস্বাদসম্মোদিত ইবানিলঃ॥ (ঐ ১।৮৫)

বনের চারিদিকে নানা রকমের নানা স্বাদের মধু বুকে করিয়া ফুল ফুটিয়াছে,—আর বাতাসও অনেক রসাস্বাদে বর্ধিততৃষ্ণ হইয়াই যেন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে, পর্বত হইতে পর্বতে, বন হইতে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হিমান্তে বনতরুগুলিতে এমনভাবে ফুল ফুটিয়াছে, যেন মনে হয় তাহারা একে অন্যের সঙ্গে স্পর্ধা করিয়া ভ্রমর-গুঞ্জনের দ্বারা একে অপরকে ডাকিয়া প্রতিযোগিতায় ফুল ফুটাইতেছে।

আহ্বায়ন্ত ইবান্যোন্যং নগাঃ ষট্পদনাদিতাঃ।
কুসুমোত্তংসবিটপাঃ শোভন্তে বহু লক্ষ্মণ॥ (১।৯২)

এই বসন্ত সমাগমে পর্বতের সানুদেশে যে মৃগটি মৃগীর সহিত ভ্রমণ করিতেছে, পম্পা-সলিলে যে কারণ্ডব পক্ষীটি তাহার কান্তার সহিত অবগাহন করিয়া প্রণয় সম্ভাষণ জানাইতেছে তাহাদের সকলের সহিতই রামচন্দ্রের একটা কোমল সহানুভূতি ব্যঞ্জিত হইতেছে।

ঘন বর্ষার রূপ বর্ণনায় বাল্মীকি অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কালিদাসের মেঘদূতের ভিতরে ঘন বর্ষার তেমন কোন রূপ নাই। তবে মেঘদূতের বর্ষার সহিত এবং সেই বর্ষাকালীন সমগ্র প্রকৃতির সহিত মানুষের যে গভীর যোগ ব্যঞ্জিত হইয়াছে তাহার আলোচনা

আমরা পূর্বেই করিয়াছি। 'ঋতুসংহারে'র বর্ষার তেমন কোন অভিনব চমৎকারিত্ব নাই, সে মানুষের শৃঙ্গাররসের আলম্বন এবং উদ্দীপন রূপেই দেখা দিয়াছে, এবং সেই শৃঙ্গারের ভিতরে বিপ্রলম্ভের রেশ অতি ক্ষীণ—সম্ভোগের সুরই প্রধান।

বাল্মীকির বর্ষার গায়ে বিরহের রং লাগিয়াছে।[১] বর্ষার আকাশের দেহে যেন কোন দুষ্টব্রণের বেদনা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে; তাম্রবর্ণের সন্ধ্যারাগ, তাহার ভিতরে পাণ্ডুচ্ছায়া এবং চারিদিকে স্নিগ্ধ মেঘের পটচ্ছেদ যেন সেই বেদনারই আভাস দিতেছে।

সন্ধ্যারাগোত্থিতৈস্তাম্রৈরন্তেষ্বপি চ পাণ্ডুভিঃ।
স্নিগ্ধৈরভ্রপটচ্ছেদৈর্বদ্ধব্রণমিবাম্বরম্॥ (কি-২৮।৫)

বিরহাতুর রামচন্দ্রের চোখে আকাশের একটা আর্তি জাগিয়া উঠিয়াছে; মন্দমারুতের নিশ্বাস বহিতেছে, সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিত মেঘের ঈষৎ পাণ্ডুরতায় যেন এই বেদনা রূপ পাইয়াছে।

মন্দমারুতনিশ্বাসং সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিতম্।
আপাণ্ডুজলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্॥ (ঐ ২৮।৬)

শুধু তাহাই নহে,—

এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা।
সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি॥

* * * *

(১) ভট্টিকাব্যের সপ্তম সর্গে (৭।১-১৩) কবি বর্ষাগমে রামচন্দ্রের বিরহবর্ণনায় বাল্মীকিরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু দুই বর্ণনা পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে বাল্মীকির বর্ণনাই যে শ্রেষ্ঠ এ কথা সহজেই অনুভব করা যাইবে।

কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাড়িতম্।
অন্তস্তনিতনির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্॥
নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে।
স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী।

(ঐ-২৮।৭, ১২-১৩)

এই ঘর্মপরিক্লিষ্টা এবং নববারিপরিপ্লুতা পৃথিবী শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায়ই বাষ্প ত্যাগ করিতেছে। হৈম কশার ন্যায় বিদ্যুৎ কর্তৃক অভিতাড়িত হইয়া অন্তস্তনিতনির্ঘোষ আকাশ যেন সবেদন হইয়া উঠিয়াছে। নীলরেখাশ্রিতা বিদ্যুৎ বার বার স্ফুরিত হওয়ায় মনে হইতেছে, রাবণের অঙ্কে তপস্বিনী সীতা যেন আমার নিকট বার বার আত্মপ্রকাশ করিতেছে।'

বাল্মীকির এই বর্ষা-বর্ণনার ভিতরে আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার ভিতরে ঘন বর্ষার একটা মত্ত আবেগ আছে এবং তাহার ধারা-পতনের ধ্বনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দ এবং পদবিন্যাসের ভিতরেই এই বেগ এবং ধ্বনি নিহিত রহিয়াছে। প্রতি চরণের শেষে অন্ত্যানুপ্রাসের সমাবেশ করিয়া অথবা প্রত্যেক চরণে একই পদের পুনরুক্তি দ্বারা বর্ষার একটানা ধারা-পতন-ধ্বনিটির আভাস দিবার চেষ্টা হইয়াছে, আর দ্রুত ক্রিয়াপদের ব্যবহারে একটা আবেগ সঞ্চারিত করা হইয়াছে।

বর্ষোদকাপ্যায়িতশাদ্বলানি
প্রবৃত্তনৃত্যোৎসববর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি
পশ্যাপরাহ্নেষ্বধিকং বিভান্তি॥

... ...

নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি
দ্রুতং নদী সাগরমভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি
কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি॥
জাতা বনান্তাঃ শিখিসুপ্রনৃত্যা
জাতাঃ কদম্বাঃ সকদম্বশাখাঃ।
জাতা বৃষা গোষু সমানকামা
জাতা মহী শস্যবনাভিরামা॥
বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি
ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ
প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গাঃ।

(ঐ ২৮।২১, ২৫-২৭)

কালিদাসের বর্ষা-বর্ণনা বহু স্থানে আমাদিগকে বাল্মীকির বর্ষা-বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়, যেমন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় এ যুগের কবি রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-বর্ণনা কালিদাসের বর্ষা-বর্ণনাকে। আমরা এই সব সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে পংক্তিতে পংক্তিতে ভাবে ভাষায় হুবহু মিল আশা করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল', 'নববর্ষা' প্রভৃতি পাঠ করিলে যেমন মনে হয়, কালিদাসের অনেক ভাবের টুকরা, অনেক দৃশ্য, উপমা, ভাষা যেন কীর্ণ হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে, তেমনি কালিদাসের কাব্যে বর্ষা-বর্ণন পাঠ করিলে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে স্মরণ হইতে থাকে—এখানে সেখানে যেন বাল্মীকির

চিত্র, সুর এবং কথা ভাসিয়া আসিতেছে। বাল্মীকির বর্ণনাতেও যে পূর্ববর্তীদের স্মরণ ঘটে না তাহা নহে; তিনি যেমন বলিয়াছেন,—

গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা
মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ ॥

(ঐ ২৮।২০)

'দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অবতীর্ণ মত্ত গজেন্দ্র সমূহের ন্যায় সমুদীর্ণনাদ মেঘগুলি গর্জন করিতেছে'; আমরা কিছু পূর্বেই দেখিয়াছি, অথর্ববেদে মেঘ সমূহকে গর্জনকারী মহাবৃষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,—'মহঋষভস্য নদতো নভস্বতঃ'।

বাল্মীকি এই যে মেঘকে মত্তগজের সহিত উপমিত করিলেন, এই গজেন্দ্র—

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ। (২৮।২০)

এই মেঘ গজেন্দ্র, সুতরাং তাহার রাজজনোচিত ভূষণ চাই। বিদ্যুতে তাহার পতাকা, বলাকায় তাহার মালা, আর শৈলেন্দ্র শিখরের ন্যায় তাহার আকৃতি। কালিদাস বলিয়াছেন,—

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর-
স্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনি-
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥

(ঋঃ সঃ-২।১)

এই বর্ষাগম একেবারে 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির্'। জলকণাবর্ষী

মেঘ ইহার মত্ত মাতঙ্গ, তড়িৎ ইহার পতাকা আর বজ্রধ্বনি ইহার মাদলধ্বনি।[১] বাল্মীকিতে দেখিতে পাই,—

বালেন্দ্রগোপান্তরচিত্রিতেন
বিভাতি ভূমির্নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুপৃক্তেন শুকপ্রভেণ
নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন॥ (কি-২৮।২৪)

নববর্ষায় ভূমিতে নবশাদ্বল জাগিয়া উঠিয়াছে, এই নবশাদ্বলের হরিতকান্তি মাঝে মাঝে বাল ইন্দ্রগোপের দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে; এই ভূমিকে দেখিলে মনে হয়, শুকপাখীর বর্ণসম বর্ণের একখানি কম্বল লাক্ষারসের দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছে এবং একটি নারী এই কম্বলে আবৃতা হইয়া বসিয়া আছে। কালিদাসে দেখিতে পাই,—

প্রভিন্নবৈদূর্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ
সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলী-দলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা
বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্রগোপকৈঃ॥ (ঋঃ সঃ—২।৫)

'দলিতবৈদূর্যমণির ন্যায় তৃণাঙ্কুরে, নবোদ্গত কন্দলী-দলে, এবং

(১) আরও তুলনীয়—

তড়িৎপতাকাভিরলঙ্কৃতানা-
মুদীর্ণগম্ভীরমহারবাণাম্।
বিভান্তি রূপাণি বলাহকানাং
রণোৎসুকানামিব বারণানাম্॥

(রামায়ণ, কি—২৮।৩১)

তুলনীয়—তড়িৎপতাকা ইব তোয়দেভ্যঃ। অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ, ১০।৩৯

ইন্দ্রগোপে সমাবৃতা হইয়া ক্ষিতি নীলাদিরত্নভূষিতা বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছে।' বাল্মীকি বলিয়াছেন,—

সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং
বলাকিনো বারিধারা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং
বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি॥ (কি ২৮।২২)

'সলিলের অতিভার বহন করিতে করিতে এবং গর্জন করিতে করিতে বারিধর মেঘগুলি পর্বত সকলের বড় বড় শৃঙ্গে বিশ্রাম করিয়া করিয়া পুনরায় প্রয়াণ করিতেছে।' কালিদাসের 'মেঘদূতে'ও দেখিতে পাই, যক্ষ মেঘকে বলিয়া দিতেছে,—

খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য॥
(মেঘদূত পূ ১৩)

'পথে বার বার পরিশ্রান্ত হইলে পর্বতের উপরে বিশ্রাম করিয়া এবং বার বার ক্ষীণ হইলে স্রোতের স্বাস্থ্যকর জল পান করিয়া গমন করিবে।'

তার পরে সেই বলাকাপংক্তি, তৃষার্ত চাতক, মানসোৎসুক রাজহংস দল, সেই প্রথম মুকুলিত নীপবনে ময়ূরের নৃত্য, সেই শ্যামজম্বুবন, বননির্ঝরের প্রপাতধ্বনি, সেই কেতকীর জলসিক্ত সুরভি—ইহা বাল্মীকি ও কালিদাস উভয়ের বর্ণনায়ই ছড়াইয়া আছে।

'ঋতু-সংহারে'র শরৎবর্ণনায়ও কালিদাস বাল্মীকির নিকট হইতে অনেক ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। কালিদাসের বর্ণনায় প্রথমেই দেখিতে পাই,—

কাশাংশুকা বিকচ-পদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদ-হংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্ক-শালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা॥

(ঋঃ সঃ ৩।১)

আজ রূপরম্যা শরৎ যেন নববধূর ন্যায় কান্তি ধারণ করিয়াছে; কাশকুসুমে ইহার সুচিক্কণ পরিধেয় বস্ত্র, প্রস্ফুটিত পদ্মে মনোজ্ঞ মুখ, মন্দমুখর হংসের নাদে রম্য নূপুরনাদ এবং আপক্ক শালিধান্য-শোভিত ইহার তনুগাত্রযষ্টি।[১] বাল্মীকির ভিতরে দেখিতে পাই,—

সচক্রবাকানি সশৈবলানি
কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি।
সপত্ররেখাণি সরোচনানি
বধূমুখানীব নদীমুখানি॥

(কি-৩০।৫৫)

এই শরতে নদীমুখগুলিকে বধূমুখের মত মনে হইতেছে; কাশ-কুসুমের দুকূলবস্ত্রে সে মুখ অবগুণ্ঠিত, আর চক্রবাক এবং শৈবালে

(১) তুলনীয়—

বিকচকমলবক্ত্রা ফুল্লনীলোৎপলাক্ষী
বিকসিতনবকাশশ্বেতবাসো বসানা।
কুমুদরুচিরকান্তিঃ কামিনীবোন্মদেয়ং
প্রতিদিশতু শরদ্বশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্॥

(ঋঃ সঃ ৩।২৬)

মিলিয়া মুখের রমণীয় পত্রলেখা রচনা করিয়াছে।[১] আবার কালিদাসের বর্ণনায় দেখিতে পাই,—

চঞ্চন্মনোজ্ঞশফরীরসনাকলাপাঃ
পর্যন্ত-সংস্থিতসিতাণ্ডজ-পংক্তিহারাঃ।
নদ্যো বিশালপুলিনান্তনিতম্ববিম্বা
মন্দং প্রয়ান্তি সমদাঃ প্রমদা ইবাদ্য॥ (ঋঃ সঃ ৩।৩)

নদীগুলি আজ সমদা প্রমদাগণের ন্যায় অতি মন্দ মন্দ চলিতেছে ; শরতে প্রকাশিত বিশাল পুলিনই তাহার নিতম্বদেশ, চঞ্চল মনোজ্ঞ শফরীমাছগুলি তাহার কাঞ্চীদাম,—আর উভয়তটে শোভিত শুভ্র হংসপংক্তিতেই তাহার হার। ইহার সঙ্গে আমরা তুলনা করিতে পারি বাল্মীকির বর্ণনা,—

মীনোপসন্দর্শিতমেখলানাং
নদীবধূনাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ।
কান্তোপভুক্তালসগামিনীনাং
প্রভাতকালেষ্বিব কামিনীনাম্॥ (কি-৩০।৫৪)

মীনোপসন্দর্শিত-মেখলা নদীবধূগণের গতি আজ মন্দ,—যেন প্রভাতকালে কান্তোপভুক্তা অলসগামিনী কামিনীগণের গতির মত।

(১) আরও অতুলনীয়,—

নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈ-
র্ব্যাধূয়মানৈর্মৃদুমারুতেন।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ
কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি॥ (রামায়ণ, কি ৩০।৫১)

শরতে নদীর জল শুকাইয়া যাওয়ায় যে পুলিন প্রকাশিত হয় কালিদাস পূর্বোক্ত শ্লোকে তাহাকেই নদীর নিতম্ব দেশ বলিয়াছেন। বাল্মীকিও বলিয়াছেন—

দর্শয়ন্তি শরন্নদ্যঃ পুলিনানি শনৈঃ শনৈঃ।
নবসঙ্গমসব্রীড়া জঘনানীব যোষিতঃ॥ (কি-৩০।৫৮)

কালিদাসের পূর্ব-বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা বাল্মীকিতে আরও দেখিতে পাই—

প্রকীর্ণ-হংসাকুলমেখলানাং
প্রবুদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্।
বাপ্যুত্তমানামধিকাদ্য লক্ষ্মী-
র্বরাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্॥ (ঐ ৩০।৪৯)

আকুল হংসগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া থাকিয়া মেখলার শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং উৎপলের মালা রচিত হইয়াছে, এই সকল সহ উত্তম সরোবরগুলির শ্রী আজ ভূষিতা বরাঙ্গনাদের শ্রীর ন্যায় পরিবর্ধিত হইয়াছে।

তার পরে কালিদাসে দেখিতে পাই,—

তারাগণ-প্রবর-ভূষণমুদ্বহন্তী
মেঘাবরোধ্ব-পরিমুক্ত-শশাঙ্ক-বক্ত্রা।
জ্যোৎস্না-দুকূলমমলং রজনী দধানা
বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা॥ (ঋঃ সঃ ৩।৭)

তারাগণের বহির্ভূষণ বহন করিয়া, মেঘাবরোধ-পরিমুক্ত চন্দ্রের মুখ বিকাশ করিয়া আর জ্যোৎস্নার অমলদুকূল বসন পরিধান করিয়া শরতের রজনী বালা প্রমদার মত অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

বাল্মীকির ভিতরে দেখিতে পাই—

রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত্রা
তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি
নারীব শুক্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী॥ (কি-৩০।৪৬)

'উদিত চন্দ্রে সৌম্যমুখকান্তি, তারাগণে উন্মীলিত-চারুনেত্র, আর জ্যোৎস্নার অংশুক বস্ত্র পরিহিত শরতের রাত্রি শুক্ল-অংশুকে সংবৃতাঙ্গী নারীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।

কালিদাস বলিয়াছেন,—

স্ফুট-কুমুদচিতানাং রাজহংসশ্রিতানাং
মরকতমণিভাসা বারিণা ভূষিতানাম্।
শ্রিয়মতিশয়রূপাং ব্যোমতোয়াশয়ানাং
বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্॥ (ঋঃ সঃ ৩।২১)

এই শরৎকালে ঊর্ধ্বের আকাশ যেমন মেঘমুক্ত হইয়া এবং চন্দ্র তারকায় অবকীর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে, তেমনই নিম্নের জলাশয়-গুলিও ঐ আকাশের মত শোভা পাইতেছে; মেঘবিমুক্ত আকাশ যেমন স্বচ্ছ নির্মল মরকত-মণির তুল্যকান্তি বারিরাশি দ্বারা ভূষিত, এই জলাশয়ও তেমনি স্বচ্ছ নির্মল; আকাশে যেমন চন্দ্রতারকা ছড়াইয়া আছে—স্বচ্ছ জলাশয়েও তেমনই চন্দ্রতারকার ন্যায় কুমুদ এবং রাজহংস ছড়াইয়া রহিয়াছে।

বাল্মীকির ভিতরে দেখিতে পাই,—

সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং
মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।

ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্ণমিবান্তরীক্ষম্ ॥ (কি-৩০।৪৮)

মহাহ্রদস্থ সলিলে হংস ঘুমাইয়া আছে, কুমুদ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—দেখিলে মনে হয় সে যেন মেঘমুক্ত রাত্রির পূর্ণচন্দ্রযুক্ত এবং তারাগণাকীর্ণ অন্তরীক্ষ।

এইরূপে কালিদাসের শরৎ-বর্ণনা বাল্মীকির শরৎ বর্ণনাকেই নানা ভাবে স্মরণ করাইয়া দিবে। বাল্মীকির শরৎ বর্ণনার ভিতরে একস্থানে দেখিতে পাই,—

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্ ॥ (কি—৩০-৪৫)

চন্দ্রের চঞ্চল করস্পর্শে (কিরণরূপ হস্তস্পর্শে) হর্ষোন্মীলিত-তারকা (তারকারূপ চোখের তারকা) রাগবতী (আরক্তিম, অনুরাগবতী) সন্ধ্যা আপনিই অম্বর (আকাশ, বস্ত্র) ত্যাগ করিতেছে। এই শ্লোকটিকে সম্মুখে রাখিয়াই যে পরবর্তী কালে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি রচিত হইয়াছে, তাহাতে আর কোনও সংশয় নাই।—

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং
তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া
পুরোঽপি রাগাদ্ গলিতং ন লক্ষিতম্ ॥

'ঈষদুদ্বুদ্ধ রাগ বশতঃ চন্দ্র বিলোলতারক নিশামুখকে এমন ভাবে গ্রহণ করিল যে তাহার (নিশার) সমস্ত তিমিরাংশুক যে পূর্বেই রাগবশতঃ স্খলিত হইয়া পড়িল তাহা সে লক্ষ্যই করিতে পারে নাই।'

এখানেও রাগ অর্থ আরক্তিম আভা এবং অনুরাগ, বিলোল-তারক অর্থে এখানেও তারকারূপ চোখের তারকাকেই বুঝাইতেছে, 'গৃহীত' শব্দের দ্বারা প্রাপ্ত এবং চুম্বিত এই উভয় অর্থই ব্যঞ্জিত হইতেছে, তিমিরাংশুক এখানে পাত্‌লা অংশুকের ন্যায় অন্ধকারও বটে, আবার পাতলা অন্ধকারের ন্যায় রেশমী বস্ত্রও বটে, পূর্ব (পুরঃ) এখানে আগে এই অর্থেও গ্রহণ করা যায়, পূর্বদিক্ অর্থেও গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু ঋতু-সংহারের শরৎ-বর্ণনায় বাল্মীকির বিশেষ প্রভাব বর্তমান থাকিলেও শরৎ-বর্ণনায় কালিদাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে 'রঘুবংশে'র চতুর্থ সর্গের শরৎ-বর্ণনায়। এই বর্ণনার চমৎকারিত্ব মূল প্রসঙ্গের সহিত ইহার গভীর সাহিত্যে বা সঙ্গতিতে। এখানে মূল প্রসঙ্গ রাজা রঘুর মাহাত্ম্য বর্ণনা ; সেই মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য কবি যে শরৎ-বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন শরৎ-ঋতুরও অতি সংযত অথচ যথাযথ বর্ণনা, অন্যদিকে তাহা রাজা রঘুর পক্ষেও অতি নিপুণ ভাবে প্রযুক্ত।

নির্বৃষ্টলঘুভির্মেঘৈর্মুক্তবর্ত্মা সুদুঃসহঃ।
প্রতাপস্তস্য ভানোশ্চ যুগপদ্‌ব্যানশে দিশঃ॥ (৪।১৫)

বৃষ্টিহীন লঘু মেঘের দ্বারা পথ উন্মুক্ত হওয়াতে দিক্‌সকল সূর্য এবং (শরৎকালে দিগ্বিজয়ী) রঘুর সুদুঃসহ প্রতাপ যুগপৎ ব্যাপ্ত করিয়া দিল।

বার্ষিকং সংজহারেন্দ্রো ধনুর্জৈত্রং রঘুর্দধৌ।
প্রজার্থসাধনে তৌ হি পর্যাযোদ্যতকার্মুকৌ॥ (৪।১৬)

ইন্দ্র বার্ষিক ধনু ত্যাগ করিলেন, রঘু জয়শীল ধনু গ্রহণ করিলেন ;

কারণ ইঁহারা উভয়েই প্রজাগণের হিতসাধনের নিমিত্ত পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ ধনু ধারণ করিয়া থাকেন।

পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকসৎকাশচামরঃ।
ঋতুর্বিড়ম্বয়ামাস ন পুনঃ প্রাপ তচ্ছ্রিয়ম্॥ (৪।১৭)

পুণ্ডরীকের আতপত্র লইয়া এবং বিকশিত কাশকুসুমের চামর লইয়া শরৎ ঋতু রাজা রঘুর অনুকরণ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার (রঘুর) শ্রীকে লাভ করিল না।

প্রসাদসুমুখে তস্মিন্ চন্দ্রে চ বিশদপ্রভে।
তদা চক্ষুষ্মতাং প্রীতিরাসীৎ সমরসা দ্বয়োঃ॥ (৪।১৮)

তৎকালে রঘুর প্রসন্ন মুখচ্ছবি এবং বিশদপ্রভ চন্দ্র এই উভয়ে চক্ষুষ্মান্ লোকদিগের প্রীতি সমানই ছিল।

হংসশ্রেণীষু তারাসু কুমুদ্বৎসু চ বারিষু।
বিভূতয়স্তদীয়ানাং পর্যস্তা যশসামিব॥ (৪।১৯)

শরতের হংসশ্রেণীতে, তারাগুলিতে, কুমুদ ফুলে, নির্মল সলিলে রঘুর যশোবিভূতিই যেন প্রসারিত ছিল।

ইক্ষুচ্ছায়নিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তু্র্গুণোদয়ম্।
আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্যো জগুর্যশঃ॥ (৪।২০)

শালিধান্য রক্ষণে নিযুক্ত কৃষককামিনীগণ ইক্ষুচ্ছায়ায় বসিয়া প্রজারক্ষক রঘুর শৈশবকাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া যশ গান করিতে লাগিল।

প্রসসাদোদয়াদম্ভঃ কুম্ভযোনের্মহৌজসঃ।
রঘোরভিভবাশঙ্কি চুক্ষুভে দ্বিষতাং মনঃ॥ (৪।২১)

মহৌজস অগণ্য নক্ষত্রের উদয় হওয়ায় জল সকল নির্মল হইয়া উঠিল;

কিন্তু ওদিকে মহৌজস রঘুর উদয় হেতু শত্রুগণের পরাভবাশঙ্কি মন কলুষতা প্রাপ্ত হইল।

মদোদগ্রাঃ ককুদ্মন্তঃ সরিতাং কূলমুদ্রুজাঃ।
লীলাখেলমনুপ্রাপুর্মহোক্ষাস্তস্য বিক্রমম্॥ (৪।২২)

মদোদ্ধত প্রশস্ত-ককুদ্‌শালী প্রকাণ্ড বৃষ সকল নদীতট উৎপাটিত করিয়া রঘুর চিত্তাকর্ষক বিক্রমলীলার অনুকরণ করিতে লাগিল।

বর্ণনার ভিতরে এই জাতীয় একটা ব্যাপক এবং সুষ্ঠু 'সাহিত্য' কালিদাসের কবি-প্রতিভার একটা বৈশিষ্ট্য।

সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাসের উপমা একটা প্রবাদরূপে পরিণত হইয়াছে। সত্য সত্যই কালিদাসের কবি-প্রতিভার একটা উজ্জ্বল পরিচয় তাঁহার উপমা-প্রয়োগে। তাঁহার রচিত কাব্য পড়িতে গেলে বহুস্থানেই দেখিতে পাই, সমুদ্রের তরঙ্গের মত একটার পর একটা উপমা শুধু আসিতেছেই, উপমা ছাড়া যেন কবি কথাই বলিতে পারেন না। কালিদাসের এই উপমা-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, এ উপমা তাঁহার কাব্যে কোথাও বহিরাভরণমাত্র হইয়া ওঠে নাই; সে সুকুমার কবিচিত্তের সুষ্ঠুতম বাহনরূপেই কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখানে অবশ্য উপমা-শব্দটিকে আমরা ব্যাপক ভাবে সমস্ত অর্থালঙ্কারের অর্থেই গ্রহণ করিতেছি, আর উপমাই প্রায় সকল প্রকারের অর্থালঙ্কারের মূলে। কালিদাসের উপমা সত্যই রসের আক্ষেপেই আক্ষিপ্ত এবং তাহা একান্ত ভাবেই 'অপৃক্-যত্ন-নির্বর্ত্য';

সুতরাং কালিদাসের উপমা-প্রয়োগের কৌশল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্নিহিত ভাবকে কাব্যদেহে রূপায়ণেরই কৌশল। এই কৌশলে সিদ্ধিলাভ করিয়াই কালিদাস তাঁহার কাব্যে 'বাক্য' এবং 'অর্থ'কে পার্বতী-পরমেশ্বরের ন্যায়ই অভিন্ন করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমি গ্রন্থান্তরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে আর এ-বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাই না।[১]

মোটের উপরে এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, উপমা-প্রয়োগ কালিদাসের কবি-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কালিদাসের কবি-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যের মূলেও বাল্মীকির দান উপেক্ষণীয় নহে। উপমা-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এবং নৈপুণ্যের দ্বারা কবিচিত্তগত ভাবকে সুন্দরতম করিয়া প্রকাশ করিবার প্রতিভা বাল্মীকিরও অপ্রচুর নহে। রামায়ণের ভিতরে বহু স্থানে দেখিতে পাই, এক একটি গোটা অধ্যায়ে কবি শুধু উপমার পর উপমা প্রয়োগ করিয়াই স্বীয় বক্তব্যকে স্পষ্ট এবং রসস্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা পূর্বে বাল্মীকির যে সকল ঋতুবর্ণনা লইয়া আলোচনা করিয়াছি, রামায়ণের সেই সকল অধ্যায়গুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, কবি উপমা ছাড়া কথা অতি কদাচিৎ বলিয়াছেন। আর এই সকল উপমা নিতান্ত সাধারণও নহে, অথবা অযথা ভারে এবং ঝঙ্কারে সে কাব্যের ভিতরে কোন উৎপাতরূপেও দেখা দেয় নাই। বর্ষার বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন,—

শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপংক্তিভিঃ।
কুটজার্জুনমালাভিরলঙ্কর্তুং দিবাকরঃ॥ (কি-২৮।৪)

(১) লেখকের 'উপমা কালিদাসস্য' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আজ জলভারে মেঘগুলি এমনভাবে থরে থরে ভূমিভাগের দিকে নামিয়া আসিয়াছে, যেন মনে হয়, এই মেঘের সোপান-পংক্তি বাহিয়া গিয়া কুটজ এবং অর্জুনের মালাগুলি সূর্যের গলায় পরাইয়া দিয়া আসা যায়।

আর—মেঘোদরবিনির্মুক্তাঃ কর্পূরদলশীতলাঃ।
শক্যমঞ্জলিভিঃ পাতুং বাতাঃ কেতকগন্ধিনঃ॥ (কি ২৮।৮)

মেঘের ভিতর হইতে বাহিরে প্রবাহিত হইতেছে যে কেতকীর সুরভিমাখা কর্পূরদলের ন্যায় শীতল ও সুগন্ধি বাতাস তাহাকে আজ অঞ্জলি ভরিয়া পান করা যায়।

আর—মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোপবীতিনঃ।
মারুতাপূরিতগুহাঃ প্রধীতা ইব পবতাঃ॥ (ঐ ২৮।১০)

মেঘের কৃষ্ণাজিনধারী এবং বর্ষাধারার যজ্ঞোপবীতধারী পর্বতগুলি মারুতাপূরিতগুহাসহ বটু ব্রাহ্মণের ন্যায় রূপধারণ করিয়াছে।

ঋতু-বর্ণনা উপলক্ষে আমরা বাল্মীকির বহু উপমা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি; বাল্মীকির যুগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গেও আমরা তাঁহার বহু উপমা উদ্ধৃত করিয়াছি; তাহার ভিতর দিয়াই তাঁহার উপমা প্রয়োগের কৃতিত্ব লক্ষিত হইবে। যে স্থানেই কাব্যবর্ণিত বিষয়ের ভিতরে একটা আবেগ বা গাম্ভীর্য আসিয়াছে, সেইখানেই কবির বর্ণনায় উপমার পর উপমা দেখা গিয়াছে। একই বস্তুকে লইয়া বহু উপমা দিবার ভিতরে কবির যেন একটা স্ফূর্তি রহিয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই, ভরত রামচন্দ্রকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিবার পরে রামশূন্য এবং দশরথশূন্য অযোধ্যাকে তিনি কিরূপে দেখিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা

করিতে গিয়া কবি একসঙ্গে শ্লোকের পর শ্লোকে শুধু উপমাই দিয়া গিয়াছেন (অযো-১১৪।২-১৭)। হনূমান্ সীতার অন্বেষণের জন্য লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া প্রভাতে যে ক্ষীণতেজ পাণ্ডুর চন্দ্রকে দর্শন করিয়াছিল তাহার বর্ণনায়ও কবি শুধু শ্লোকের পর শ্লোক উপমাই দিয়াছেন (সুন্দর-৫।৩-৭)। ইহার ভিতরে দুই একটি উপমা বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সূর্যোদয়ের পরে ক্ষীণপ্রভ চন্দ্র—

হংসো যথা রাজতপঞ্জরস্থঃ
সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ।
বীরো যথা গর্বিতকুঞ্জরস্থ-
শ্চন্দ্রোঽপি বভ্রাজ তথাম্বরস্থঃ ॥ (সুন্দর-৫।৬)

চন্দ্রের সঙ্গে এই রাজতপঞ্জরস্থ হংস এবং মন্দরকন্দরস্থ আপাণ্ডুর ধূসর সিংহের উপমা কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যের সূচনা করে। লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া হনূমান্ রাবণের অন্তঃপুরে সুপ্তা যে নারীগণকে দেখিয়াছিল তাহাদের ভিতরে—

মুক্তাহারবৃতাশ্চান্যাঃ কাশ্চিৎ প্রস্রস্তবাসসঃ।
ব্যাবিদ্ধরসনাদামাঃ কিশোর্য ইব বাহিতাঃ ॥
অকুণ্ডলধরাশ্চান্যা বিচ্ছিন্না মৃদিতস্রজঃ।
গজেন্দ্রমৃদিতাঃ ফুল্লা লতা ইব মহাবনে ॥
চন্দ্রাংশুকিরণাভাশ্চ হারাঃ কাসাঞ্চিদুদ্গতাঃ।
হংসা ইব বভুঃ সুপ্তাঃ স্তনমধ্যেষু যোষিতাম্ ॥
অপরাণাং চ বৈদূর্যাঃ কাদম্বা ইব পক্ষিণঃ।
হেমসূত্রাণি চান্যাসাং চক্রবাকা ইবাভবন্ ॥

(সু—৯।৪৬—৪৯)

কোন কোন রমণীর মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কাহারও কাহারও স্তনবাস, কাহারও মেখলা বিক্ষিপ্ত;—তাহাদিগকে মনে হইতেছে, অতি ভারবহনে শ্রান্ত পথিপার্শ্বে কিশোরী গবাদির মত। কাহারও কুণ্ডল খুলিয়া গিয়াছে, দলিত মালা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে,—যেন মহাবনে গজেন্দ্র-দলিতা লতা; কাহারও বুকের ভিতরে চন্দ্রাংশু-কিরণহার,—যেন স্তনমধ্যে সুপ্ত হাঁসগুলি,—কাহারও বুকের কাছে বৈদূর্যমণি—যেন জলের বেলে হাঁস,—কাহারও বুকের কাছে হেমসূত্র—যেন চক্রবাকগুলি। এমনি করিয়াই চলিতে লাগিল কবির বর্ণনা। তাহার পরে গিয়া যখন হনূমান্ ধৃতৈকবেণী ধ্যানশোকপরায়ণা সীতাকে দেখিতে পাইল, তখন সীতাকে দেখা গেল—

ক্ষীণামিব মহাকীর্তিং শ্রদ্ধামিব বিমানিতাম্।
প্রজ্ঞামিব পরিক্ষীণামাশাং প্রতিহতামিব॥
আয়তীমিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব।
দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামপহৃতামিব॥
পৌর্ণমাসীমিব নিশাং তমোগ্রস্তেন্দুমণ্ডলাম্।
পদ্মিনীমিব বিধ্বস্তাং হতশূরাং চমূমিব॥
প্রভামিব তমোধ্বস্তামুপক্ষীণামিবাপগাম্।
বেদীমিব পরামৃষ্টাং শান্তামগ্নিশিখামিব॥

* * *

একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।
নীলয়া নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব॥

(সুন্দর—১৯।১১—১৪, ১৯)

'সীতা যেন ক্ষীণ হইয়া যাওয়া মহাকীর্তি, যেন অবমানিত শ্রদ্ধা,

পরিক্ষীণ প্রজ্ঞা, প্রতিহত আশা, বিধ্বস্ত সম্পদ্, প্রতিহত আজ্ঞা, উৎপাতকালে দীপ্ত দিক্, অপহত পূজা ; সে যেন চন্দ্রমণ্ডল তমসাবৃত হইলে পূর্ণিমা রজনী, যেন বিধ্বস্ত পদ্মিনী, যেন হতশূর চমূ (অর্থাৎ সেনাপতি হত হইয়াছে এমন সেনা), তমোধ্বস্ত প্রভা, উপক্ষীণ স্রোতস্বতী, অপবিত্রীকৃত যজ্ঞবেদী, নিবিয়া যাওয়া অগ্নির শিক্ষা।··· একটি দীর্ঘ বেণী ধারণ করিয়া অযত্নেই সে শোভা পাইতেছিল—যেমন মেঘ অপসৃত হইলে (শরৎকালে) অযত্নরক্ষিত নীলবনরাজি-শোভিত পৃথিবী।' অন্যত্রও দেখিতে পাই, নিবিড় শোকজালের অন্তরালে ভূমিপতিতা দীপ্তিময়ী তপস্বিনী সীতা ধূম্রজালে আবৃত অগ্নিশিখার মত,—সে যেন সন্দিগ্ধ স্মৃতি, নিপতিত ঋদ্ধি, বিহত শ্রদ্ধা, প্রতিহত আশা, সোপসর্গ সিদ্ধি, সকলুষ বুদ্ধি, অলীক অপবাদে নিপতিত কীর্তি।[১]

হনূমান্ সীতার বার্তা লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিবার জন্য সাগর-লঙ্ঘন মানসে যখন উত্তুঙ্গ পর্বত-শিখরে আরোহণ করিল, তখনকার সেই পর্বতের বর্ণনাটিও সার্থক উপমাপ্রাচুর্যে চমৎকার হইয়াছে।—

(১) শোকজালেন মহতা বিততেন ন রাজতীম্।
সংসক্তাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥
তাং স্মৃতিমিব সন্দিগ্ধামৃদ্ধিং নিপতিতামিব।
বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব ॥
সোপসর্গাং যথা সিদ্ধিং বুদ্ধিং সকলুষামিব।
অভূতেনাপবাদেন কীর্তিং নিপতিতামিব ॥

(সুন্দর—১৫;৩২—৩৪)

সোত্তরীয়মিবাম্ভোদৈঃ শৃঙ্গান্তরবিলম্বিভিঃ।
বোধ্যমানমিব প্রীত্যা দিবাকরকরৈঃ শুভৈঃ॥
উন্মিষন্তমিবোদ্ধূতৈর্লোচনৈরিব ধাতুভিঃ।
তোয়ৌঘনিঃস্বনৈর্মন্দ্রৈঃ প্রাধীতমিব সর্বতঃ।
প্রগীতমিব বিস্পষ্টং নানাপ্রস্রবণস্বনৈঃ।
দেবদারুভিরুদ্ধূতৈরূর্ধ্ববাহুমিব স্থিতম্॥
প্রপাতজলনির্ঘোষৈঃ প্রাক্রুষ্টমিব সর্বতঃ।
বেপমানমিব শ্যামৈঃ কম্পমানৈঃ শরদ্বনৈঃ॥
... ...
নীহারকৃতগম্ভীরৈর্ধ্যায়ন্তমিব গহ্বরৈঃ।
মেঘপাদনিভৈঃ পাদৈঃ প্রক্রান্তমিব সর্বতঃ॥
জৃম্ভমাণমিবাকাশে শিখরৈরভ্রমালিভিঃ।
কূটৈশ্চ বহুধাকীর্ণং শোভিতং বহুকন্দরৈঃ॥
(সুন্দর—৫৬।২৭-৩০, ৩২-৩৩)

শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিলম্বিত শুভ্রবর্ণের মেঘগুলিই সে পর্বতের শুভ্র উত্তরীয়, —দিবাকরের শুভ্র কররাশি দ্বারা সম্যক্ প্রকাশিত হওয়ায় গিরি যেন সেই কররাশি দ্বারা প্রীতিপূর্বক বোধ্যমান বলিয়া মনে হইতে লাগিল; শিখরস্থ ধাতুরাশির বিস্তৃত নয়নের দ্বারা যেন পর্বত নিমেষ ফেলিতেছিল,—সম্মুখস্থ সমুদ্রের নিস্বনের দ্বারা যেন সে বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছিল; নানা প্রস্রবণের সুরে সে যেন অস্ফুট গান ধরিয়াছিল,—আর দীর্ঘ দেবদারুর বাহু তুলিয়া সে যেন ঊর্ধ্ববাহু তপস্বীর ন্যায় বসিয়াছিল; জলপ্রপাতধ্বনিতে সে যেন চারিদিকে রোষ প্রকাশ করিতেছিল,—কম্পমান শ্যাম শরদ্বনের দ্বারা সে যেন

কম্পমান্; নীহারের দ্বারা গহ্বরগুলি গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে—সেখানে মনে হয় পর্বত ধ্যানস্থ;—মেঘের চরণে যেন গিরি পদসঞ্চরণ করে, অভ্রমালী শৃঙ্গের দ্বারা যেন আকাশে হাই তোলে।

ইহার পরে হনূমান্ যখন আকাশে লম্ফ দিল তখন সেই 'গগনার্ণবে'রও একটি সাঙ্গরূপক বর্ণনা রহিয়াছে।[১] এই জাতীয় সাঙ্গরূপক বর্ণনা রামায়ণের ভিতরে আরও অনেক পাওয়া যায়।[২]

বাল্মীকিও বহুল ভাবে উপমা ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেই ব্যবহারের ভিতর কবির যথেষ্ট রসজ্ঞান শিল্পনৈপুণ্য উভয়েরই পরিচয় আছে; কিন্তু শুধু এই বলিয়াই যে আমরা কালিদাসের উপমা-প্রয়োগ-প্রতিভায় বাল্মীকির প্রভাবের সম্ভাবনা অনুমান করিতেছি তাহা নহে; কালিদাসের কতগুলি প্রসিদ্ধ উপমা আমাদিগকে স্পষ্টতঃই বাল্মীকির উপমা স্মরণ করাইয়া দেয়। কালিদাস আকাশ-গামী শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র সারস-মালাকে অস্তম্ভ তোরণমালার সহিত তুলনা করিয়াছেন,—

---

(১) আপ্লুত্য চ মহাবেগঃ পক্ষবানিব পর্বতঃ।
ভুজঙ্গযক্ষগন্ধর্বপ্রবুদ্ধকমলোৎপলম্ ॥
সচন্দ্রকুমুদং রম্যং সার্ককারণ্ডবং শুভম্।
তিষ্যশ্রবণকাদম্বমভ্রশৈবলশাদ্বলম্।
পুনর্বসুমহামীনং লোহিতাঙ্গং মহাগ্রহম্ ॥
ঐরাবতমহাদ্বীপং স্বাতীহংসবিলাসিতম্ ॥
বাতসঙ্ঘাতজালোর্মিচন্দ্রাংশুশিশিরাম্বুমৎ।
হনূমানপরিশ্রান্তঃ পুপ্লুবে গগনার্ণবম্ ॥ (সুন্দর—৫৭।১-৪)

(২) দ্রষ্টব্য (অযোধ্যা—৫৯।২৮-৩১)

শ্রেণীবন্ধাদ্ বিতন্বদ্‌ভিরস্তম্ভাং তোরণ-স্রজম্।
সারসৈঃকলনির্হ্রাদৈঃ ক্বচিদুন্নমিতাননৌ॥ (রঘু—১।৪১)

বাল্মীকির রামায়ণে দেখিতে পাই ;—

মেঘাভিকামা পরিসংপতন্তী
সম্মোদিতা ভাতি বলাকপংক্তিঃ।
বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী
লম্বেব মালা রুচিরাম্বরস্থ॥ (কি ২৮।২৩)

'বর্ষাগমে মেঘাভিলাষী আকাশে-সঞ্চরমাণ বলকাশ্রেণী অতি সম্মোদিত হইয়া শোভা পাইতেছে,—যেন বাতাসের দ্বারা কম্পিত আকাশের লম্বমান্ শ্রেষ্ঠ শ্বেতপদ্মের মালা।' শরৎ-বর্ণনা স্থলেও দেখিতে পাই—

বিপক্কশালিপ্রসবানি ভুক্ত্বা
প্রহর্ষিতা সারসচারুপংক্তিঃ।
নভঃ সমাক্রামতি শীঘ্রবেগা
বাতাবধূতা গ্রথিতেব মালা॥ (কি ৩০।৪৭)

'বিপক্কশালিধান্য আহার করিয়া প্রহৃষ্ট সারসের চারু পংক্তিগুলি শীঘ্রবেগে আকাশে ছুটিয়া চলিয়াছে, যেন বাতাসে বিধূনিত গ্রথিত (শ্বেত পুষ্পের) মালা।'

কালিদাসের ভিতর দেখিতে পাই, পূতচরিত্রসম্পন্না নারীকে তিনি বহুস্থানে যজ্ঞের হবি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস প্রায়ই দেশকালপাত্রের সহিত একটা গভীর ঔচিত্য রক্ষা করিবার জন্যই এই উপমাটি ব্যবহার করিতেন। 'দেবতাত্মা' নগাধিরাজ হিমালয় তাঁহার কন্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

ঋতে কৃশানোর্নহি মন্ত্রপূত-
মর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্ ॥
(কুঃ সঃ ১।৫১)

মন্ত্রপূত হবি যেমন কখনও অগ্নিব্যতীত অন্য কোন তেজোবস্তুতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না, উমাও সেইরূপ মহাদেব ব্যতীত আর কাহারও নিকটে অর্পিতা হইতে পারে না।

শকুন্তলা নাটকেও দেখিতে পাই, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া আকাশবাণীতে দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার প্রণয়-কাহিনী জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—'ধূমাউলিঅদিট্‌ঠিণো বি জজমাণস্স পাবএ আহুই পড়িদা'—যজ্ঞায় ধূমের দ্বারা আকুলিতদৃষ্টি যাজ্ঞিকের ঘৃতাহুতিও অগ্নিতেই পড়িয়াছে।

রামায়ণের ভিতরেও দেখিতে পাই, সতীত্বের মহিমায় দীপ্ত সীতা যেদিন চরিত্রের পরীক্ষার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সকলে তাহাকে যজ্ঞের অগ্নিতে অর্পিত মন্ত্রপূত হবির ন্যায়ই দেখিয়াছিলেন—

দদৃশুস্তাং মহাভাগাং প্রবিশন্তীং হুতাশনম্।
ঋষয়ো দেবগন্ধর্বা যজ্ঞে পূর্ণাহুতীমিব ॥
প্রচুক্রুশুঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তাং দৃষ্ট্বা হব্যবাহনে।
পতন্তীং সংস্কৃতাং মন্ত্রৈর্বসোর্ধারামিবাধ্বরে ॥
(যু ১১৬।৩১-৩২)

সীতার বিবাহের সময়ও জনকরাজা বলিয়াছেন,—

কৃতকৌতুকসর্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ।
মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চিষঃ ॥ (বাল-৭৩।১৫)

'হে মুনিশ্রেষ্ঠ, বিবাহের যথাবিধি মাঙ্গল্য অনুষ্ঠানের পর বেদিমূলে সমাগতা আমার কন্যাগণ অগ্নির শিখার ন্যায়ই দীপ্তা'।[১]

কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, রাজা দিলীপ সারাদিন ধেনুকে বনে চরাইয়া দিনান্তে যখন আশ্রমে ফিরিতেছিল, তখন রাজপত্নী সুদক্ষিণা উপোষিত অনিমেষ নয়নের দ্বারা দিলীপের রূপ পান করিতেছিল।—

পপৌ নিমেষালস–পক্ষ্ম-পংক্তি-
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্॥ (২।১৯)

রামায়ণে দেখিতে পাই, কুশ এবং লব দুই ভাই যখন রামায়ণ গান করিবার জন্য রামের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল তখন—

হৃষ্টা মুনিগণাঃ সর্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসাঃ।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভিঃ পশ্যন্তিস্ম মুহুর্মুহুঃ॥ (উত্তর-৯৪।১২)

'হৃষ্ট মুনিগণ এবং মহাবল রাজগণ সকলে চক্ষুদ্বারা পান করিবার মত বার বার তাহাদিগকে দেখিতেছিল।' রামচন্দ্র যখন বনে গমন করতেছিল তখন প্রজাগণও সকলে তাহার পশ্চাৎ গমন করিতেছিল; তখন—

অবেক্ষমাণঃ সস্নেহং চক্ষুষা প্রপিবন্নিব।
উবাচ রামঃ সস্নেহং তাঃ প্রজাঃ স্বাঃ প্রজা ইব॥
(অযোধ্যা—৪৫।৫)

'রামচন্দ্রকে প্রজাগণ যখন চক্ষুদ্বারা পান করিবার মতই সস্নেহে

---

(১) তুঃ—ন সা ধর্ষয়িতুং শক্যা মৈথিল্যোজস্বিনঃ প্রিয়া॥
দীপ্তস্যেব হুতাশস্য শিখা সীতা সুমধ্যমা॥
(আরণ্য—৩৭।২০)

তাকাইয়া দেখিতেছিল, তখন রামচন্দ্রও সস্নেহে স্বপ্রজাতুল্য (নিজের সন্তানের তুল্য) প্রজাগণকে এই কথা বলিয়াছিল।'

ভূষণ-বিরহিতা বিষণ্ণা নারীর সহিত নক্ষত্রহীন তমসাবৃত রজনীর তুলনা বাল্মীকি বহু স্থানে করিয়াছেন। অযোধ্যাকাণ্ডে বিমনা কৈকেয়ীর বর্ণনায় দেখিতে পাই—

উদীর্ণসংরম্ভতমোবৃতাননা
তদাবমুক্তোত্তমমাল্যভূষণা।
নরেন্দ্রপত্নী বিমনা বভূব সা
তমোবৃতা দ্যৌরিব মগ্নতারকা॥ (অযোধ্যা—৯।৬৬)

ইহারই সমজাতীয় একটি উপমায় অভিনব অর্থ এবং মহিমার সঞ্চার করিয়াছেন কালিদাস তাঁহার 'রঘুবংশে' আসন্নপ্রসবা সুদক্ষিণার বর্ণনায়।—

শরীরসাদাদসমগ্রভূষণা
মুখেন সালক্ষ্যত লোধ্রপাণ্ডুনা।
তনুপ্রকাশেন বিচেয়তারকা
প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী॥ (৩।২)

রাণীর দেহ কিঞ্চিৎ কৃশ হইয়া গিয়াছে, তাই আর সমগ্র ভূষণ দেহে রাখিতে পারিতেছেন না,—মুখখানিও লোধ্রকুসুমের ন্যায় পাণ্ডুতা অবলম্বন করিয়াছে;—দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন অল্প-প্রকাশিত চন্দ্রমার সহিত লুপ্ততারকা প্রভাতকল্পা যামিনী।

রামায়ণে দেখিতে পাই, রাবণ যখন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায় তখন হেমবর্ণা সীতা নীলাঙ্গ রাবণের পার্শ্বে নীলবর্ণ গজের দেহে স্বর্ণকাঞ্চীর মত শোভা পাইতেছিল।—

সা হেমবর্ণা নীলাঙ্গং মৈথিলী রাক্ষসাধিপম্ ।
শুশুভে কাঞ্চনী কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা ॥

(আরণ্য—৫২।২৩)

সমজাতীয় একটি উপমায় কালিদাস আরও রসমাধুর্য এবং সৌকুমার্য দেখাইয়াছেন 'কুমারসম্ভবের' তৃতীয়সর্গে যেখানে তিনি পিতা হিমালয়ের ধূসর কর্কশবুকে ভয়-সঙ্কুচিতা উমার বর্ণনা করিয়াছেন সুরগজের দন্তলগ্না পদ্মিনীরূপে।

চন্দ্রোদয় এবং উদ্বেল সমুদ্র লইয়া বাল্মীকি বহু উপমা দিয়াছেন। রামের অভিষেকের বর্ণনা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই, রামচন্দ্র পিতা দশরথের কাছে গমন করিলে বাহিরে প্রজাগণ উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল--যেমন করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে সমুদ্র চন্দ্রের উদয়ের জন্য।—

তস্মিন্ প্রবিষ্টে পিতুরন্তিকং তদা
জনঃ স সর্বো মুদিতো নৃপাত্মজে ।
প্রতীক্ষতে তস্য পুনঃ স্ম নির্গমং
যথোদয়ং চন্দ্রমসঃ সরিৎপতিঃ ॥ (অ ১৭।২২)

বহুস্থানেই পর্বদিনের সমুদ্র (সমুদ্র ইব পর্বণি) বাল্মীকির একটি অতি প্রিয় উপমা। সূর্যোদয়ে সমুদ্রের আনন্দের কথাও দুই এক স্থানে দেতিতে পাই।[১] চন্দ্রোদয়ে উদ্বেল সমুদ্র কালিদাসেরও একটি অতি প্রিয় উপমা—এবং এই উপমার চমৎকারিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক

(১) যথা নন্দতি তেজস্বী সাগরো ভাস্করোদয়ে।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তথা নন্দয় নস্ততঃ ॥

(অযোধ্যা—১৪।৪৭)

ফুটিয়া উঠিয়াছে উমার সান্নিধ্যে শিবের চিত্তচাঞ্চল্য বর্ণনার সেই প্রসিদ্ধ উপমায়—

হরস্তু কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য-
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥ (৩৷৬৭)

'চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে জলরাশির ন্যায় মহাদেবও কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত-ধৈর্য হইয়া উমার বিম্বফলের ন্যায় অধর-ওষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।'

নদীকে নানাভাবে নারীর সহিত উপমা দেওয়া কালিদাসের বর্ণনার একটা অতি লক্ষণীয় রীতি। আমরা ইতিপূর্বে নানাপ্রসঙ্গে কালিদাসের এই-জাতীয় বহু বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি। বর্ষার নদী বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস বলিয়াছেন,—

নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতস্তটদ্রুমান্
প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্মলৈঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুদুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ
প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতং পয়োনিধিম্॥ (ঋঃ সঃ ২৷৭)

'চারিদিকের তটতরুগুলি অধঃপাতিত করিয়া আবিল জলের দ্বারা প্রবৃদ্ধবেগ হইয়া সুদুষ্টা স্ত্রীগণের ন্যায় বিভ্রম সহকারে নদীগুলি তাড়াতাড়ি সমুদ্রের দিকে ছুটিয়াছে।'

'মেঘদূতে'র ভিতরে কালিদাস নদীর যত বর্ণনা দিয়াছেন সকলই নারীর উপমায়, কারণ, তাহারা প্রায় সকলেই মেঘের নায়িকারূপেই কল্পিত হইয়াছে। বেত্রবতী নদীর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি ॥ (পূ।২৪)

'বেত্রবতী নদীর সভ্রূভঙ্গ মুখের ন্যায় চঞ্চল উর্মি সমন্বিত সুমধুর জল তীরের নিকট গিয়া গর্জন সহকারে পান করিবে।'

তারপরে নির্বিন্ধ্যা—

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ। (পূ।২৮)

বীচিক্ষোভহেতু শব্দায়মান বিহগশ্রেণীই তাহার কাঞ্চীদাম, আর আবর্তই তাহার নাভি। এই নির্বিন্ধ্যা মেঘবিরহিণী; তাহার ক্ষীণজলধারাই তাহার একবেণী,—তটতরুর জীর্ণ পত্রেই তাহার বিরহের পাণ্ডুচ্ছায়া।—

বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥ (২৯)

তাহার পরে গম্ভীরা নদী,—

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্যাৎ
মোঘীকর্তুং চটুলসফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ (পূ।৪০)

এই গম্ভীরা নদীর নির্মল জল যেন ধীরা নায়িকার প্রসন্নচিত্ত; চটুল সফরীর উদ্বর্তনই এই গম্ভীরার কুমুদশুভ্র চাহনি।

এমনি করিয়াই নদীগুলির বর্ণনা করিয়াছেন কালিদাস। শুধু

যে নদীর বর্ণনাই নারীর উপমায় করিয়াছেন তাহা নহে, নারীর বর্ণনাও বহুস্থানে করিয়াছেন নদীর উপমায়। বাল্মীকির রামায়ণেও এই জাতীয় বর্ণনা এবং উপমার প্রাচুর্য দেখিতে পাই। আমরা ঋতু-বর্ণনা প্রসঙ্গে বাল্মীকির যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার ভিতরে এ-জাতীয় উপমা বহু পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া বাল্মীকির শরৎ-বর্ণনা এ-জাতীয় উপমায় ভরা। অযোধ্যাকাণ্ডে দেখিতে পাই রামচন্দ্র বনে যে সকল নদী দেখিয়াছিলেন তাহাদের ভিতরে

জলাঘাতাট্টহাসোগ্রাং ফেননির্মলহাসিনীম্।
ক্বচিদ্বেণীকৃতজলাং ক্বচিদাবর্তশোভিতাম্॥
ক্বচিৎ স্তিমিতগম্ভীরাং ক্বচিদ্বেগসমাকুলাম্।
ক্বচিদ্ গম্ভীরনির্ঘোষাং ক্বচিদ্ভৈরবনিস্বনাম্॥

*　　*　　*

ক্বচিত্তীররুহৈর্বৃক্ষৈর্মালাভিরিব শোভিতাম্।
ক্বচিৎ ফুল্লোৎপলচ্ছন্নাং ক্বচিৎ পদ্মবনাকুলাম্॥
ক্বচিৎ কুমুদখণ্ডৈশ্চ কুট্মলৈরুপশোভিতাম্।
নানাপুষ্পরজোধ্বস্তাং সমদামিব চ ক্বচিৎ॥

(অযোধ্যা—৫০।১৬-১৭, ২০—২১)

কোনটি জলাঘাতের অট্টহাসিতে উগ্রা রমণীর ন্যায়, কোনটি ফেননির্মলহাসিনী,—কোথাও বেণীকৃতজলা, কোথায়ও আবর্তশোভিনী; কোথাও স্তিমিতগম্ভীরা, কোথাও বেগসমাকুলা, কোথাও গম্ভীর-নির্ঘোষা —কোথাও ভৈরবনিস্বনা।······কোথাও তীরতরুর মালা দ্বারা শোভিতা, কোথাও প্রফুল্ল উৎপলে আচ্ছন্না, কোথাও পদ্মবনাকুলা;

কোথাও কুমুদখণ্ড এবং স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পকলিশোভিত, কোথাও নানাপুষ্পরজোধ্বস্তা সমদা নারীর ন্যায়।

নদী পুলিনের সহিত নারী-নিতম্বের উপমা বাল্মীকি (দ্রঃ—কি ৩০।৫৮, সুন্দর—৯।৫১) এবং কালিদাস উভয়ের ভিতরেই পাওয়া যায়। কালিদাস ইহা লইয়াই একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন মেঘদূতে—

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্। (৪১)

কালিদাসের 'রঘুবংশে' দেখিতে পাই, তাড়কা রাক্ষসীর বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,—

জ্যানিনাদমথ গৃহ্নতী তয়োঃ
প্রাদুরাস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ।
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা
কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী॥ (১১।১৫)

'তারপরে কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির ন্যায় তাড়কা তাহাদের জ্যানিস্বন শুনিতে পাইয়া কপালকুণ্ডল দোলাইয়া বকপংক্তি-শোভিত ঘনকৃষ্ণ মেঘের ন্যায় আবির্ভূতা হইল।'

রামায়ণে দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবের কণ্ঠে শুভ্রকুসুমযুক্ত গজপুষ্পী লতা পরাইয়া দিল, তখন—

স তয়া শুশুভে শ্রীমান্ লতয়া কণ্ঠসক্তয়া।
মালয়েব বলাকানাং সসন্ধ্য ইব তোয়দঃ॥ (কি—১২।৪১)

সেই শুভ্রফুলের লতাকণ্ঠে সুগ্রীব বলাকার মালাযুক্ত সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ক্রুদ্ধ রাবণের বর্ণনাতেও এই উপমাটি দেখিতে পাই ;—

কামগং রথমাস্থায় শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ।
বিদ্যুন্মণ্ডলবান্ মেঘঃ সবলাক ইবাম্বরে॥
(আরণ্য—৩৫।১০)

কালিদাসের মেঘদূতে অলকাপুরীর বর্ণনায় দেখিতে পাই—

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাম্— (পৃ৷৬৩)

কৈলাস শিখরের কোলে অলকা যেন প্রণয়ীর কোলে প্রণয়িনী এবং স্রস্ত গঙ্গা তাহার স্রস্ত দুকূলবসন। বাল্মীকির ভিতরে দেখিতে পাই, পর্বত হইতে নিপতিত নদীকে তিনি প্রিয়ের অঙ্ক হইতে পতিতা প্রিয়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং তাহার জলধারা ভূমিপতিত বৃক্ষের সহিত মিলিত হওয়ায় মনে হইতেছিল, ক্রুদ্ধা প্রমদা যেন প্রিয়বন্ধুদ্বারা বার্যমাণা।—

দদর্শ চ নগাৎ তস্মান্নদীং নিপতিতাং কপিঃ।
অঙ্কাদিব সমুৎপত্য প্রিয়স্য পতিতাং প্রিয়াম্॥
জলেন পতিতাগ্রৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
বার্যমাণামিব ক্রুদ্ধাং প্রমদাং প্রিয়বন্ধুভিঃ॥
(সুন্দর ১৫।২৯-৩০)

কালিদাস কিংশুক পুষ্পকে বসন্তসম্ভুক্তা বনভূমির নখক্ষত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (কুমারসম্ভব, ৩।২৯ ; তুঃ রঘুবংশ ৯।৩১) ; বাল্মীকি বাতাস কর্তৃক মর্দিত বনের বৃক্ষগুলিকে সম্ভুক্তা রমণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (সুন্দর—১৪।১৫-১৮)। কালিদাস সমুদ্রের বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, এই সমুদ্র হইতেই সূর্যরশ্মিসমূহ গর্ভ ধারণ করে,— 'গর্ভং দধত্যর্কমরীচয়োঽস্মাৎ' (রঘু ১৩।৪) বাল্মীকি বলিয়াছেন যে ঘনরাজি সমুদ্র হইতে গর্ভধারণ করে (উত্তর—৪।২৩)। 'মেঘদূতে'

কালিদাস অলকাপুরীর বর্ণনায় মেঘের সহিত তাহার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, মেঘের যেমন বিদ্যুৎ আছে, অলকার ঘরে ঘরে তেমনি বিদ্যুৎসম-প্রভা 'ললিত-বনিতা' সকল রহিয়াছে,—আর মেঘে যেমন ইন্দ্রধনু রহিয়াছে অলকায়ও তেমনই চিত্রিত সৌধাবলী রহিয়াছে,—

বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ (উ।১)।

রাবণের পুরী বর্ণনায় বাল্মীকি বলিয়াছেন—

স বেশ্মজালং বলবান্ দদর্শ
ব্যাসক্তবৈদূর্যসুবর্ণজালম্।
যথা মহৎপ্রাবৃষি মেঘজালং
বিদ্যুদ্বিনদ্ধং সবিহঙ্গজালম্॥ (সুন্দর ৭।১)

বৈদুর্যমণি এবং সুবর্ণের জালসংযুক্ত গৃহগুলি যেন ঘনবর্ষার বিদ্যুদ্-যুক্ত এবং বিহঙ্গজালযুক্ত মেঘরাশির ন্যায় দেখা যাইতেছিল।

'রঘুবংশে' রাজা দিলীপের বর্ণনায় দেখি,—

আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাশ্রিতঃ॥ (১।১৩)

দিলীপের আত্মকর্মক্ষম দেহ,—সে যেন দেহবদ্ধ ক্ষাত্রধর্ম। রামায়ণে রাজধর্মে প্রতিষ্ঠিত ভরতের বর্ণনায় দেখি—

তং ধর্মমিব ধর্মজ্ঞং দেহবদ্ধমিবাপরম্॥

(যুদ্ধ—২২৫।৩০)

রামচন্দ্রের পাদুকাধারী ভরত নিজেই যেন দেহবদ্ধ ধর্ম।

উপরে আমরা বাল্মীকির যে সকল উপমা লইয়া কালিদাসের উপমার পাশাপাশি রাখিয়া রাখিয়া বাল্মীকির উপমার সহিত কালিদাসের উপমার সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিলাম তাহা ব্যতীতও বাল্মীকির রামায়ণে এমন অনেক উপমা রহিয়াছে যাহা স্পষ্টতঃ

কালিদাসের কাব্যে কোথাও না পাইলেও পড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতে থাকে, কালিদাসের উপমার সহিত ইহাদের একটা সজাতীয়ত্ব রহিয়াছে। বাল্মীকির এইজাতীয় উপমাগুলি লইয়া আলোচনা করিলে এই কথা মনে হইবে, এই দিকে কালিদাসের প্রতিভা এবং বাল্মীকির প্রতিভার ভিতরে সাধর্ম্য রহিয়াছে; সেই সাধর্ম্যবোধের সঙ্গে বাল্মীকি পূর্ববর্তী বলিয়া তাঁহার 'গুরু'ত্ব এবং কালিদাসের শিষ্যত্বের কথা স্বতঃই মনে আসে। আমরা নিম্নে বাল্মীকির এই জাতীয় কয়েকটি উপমা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিতেছি।

যুবরাজ রাম রূপে এবং গুণে সকল অযোধ্যাবাসীরই অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল; এই জনপ্রিয়তার বর্ণনা দিলেন বাল্মীকি একটিমাত্র উপমায়—

বহিশ্চর ইব প্রাণো বভূব গুণতঃ প্রিয়ঃ॥ (অযো-১।১৯)

রাজ্যের প্রজাগণের দেহের ভিতরে একটি অন্তশ্চর প্রাণ ছিল,—আর তাহাদের বহিশ্চর প্রাণ ছিল রাম। রামের অভিষেক-দিবসে প্রজাগণের আনন্দ-চাঞ্চল্য ও তাহার ভাষা প্রকাশ পাইয়াছে একটি উপমায়—

জনবৃন্দোর্মিসংঘর্ষহর্ষস্বনবতস্তদা।
বভূব রাজমার্গস্য সাগরস্যেব নিস্বনঃ॥ (অযো-৫।১৭)

রাজপথ হইতে যেন সমুদ্রের নিস্বন উঠিতেছিল; ঊর্মিমালার ন্যায় জনসঙ্ঘের সংঘর্ষে এবং হর্ষনিনাদেই রাজপথের এই সমুদ্র-রূপ। এই অভিষেকের মঙ্গল দিবসে কৈকেয়ী যখন অপ্রত্যাশিতভাবে বিষ উদ্গীর্ণ করিয়াছিল তখন অনুতপ্ত দশরথ বলিয়াছিলেন,—

রমমাণস্ত্বয়া সার্ধং মৃত্যুং ত্বাং নাভিলক্ষয়ে।

বালো রহসি হস্তেন কৃষ্ণসর্পমিবাস্পৃশম্ ॥ (অ —১২।৮১)

তোমার সহিত এতদিন রমণ করিয়া তুমিই যে মৃত্যু তাহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই ;—বালকের ন্যায় নিভৃতে আমি হস্তদ্বারা কৃষ্ণ-সর্পকে স্পর্শ করিয়াছি।

দশরথ যখন বনগামী রামের সহিত বহু লোকজন পাঠাইবার জন্য অমাত্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন রাম বিনীত-বচনে বলিয়াছিল ;—

যো হি দত্ত্বা দ্বিপশ্রেষ্ঠং কক্ষ্যায়াং কুরুতে মনঃ।

রজ্জুস্নেহেন কিং তস্য ত্যজতঃ কুঞ্জরোত্তমম্ ॥ (অযো-৩৭।৩)

দ্বিপশ্রেষ্ঠকে দান করিয়া যে লোক তাহার গলবন্ধের জন্য মন করে, কুঞ্জরোত্তম ত্যাগ করিবার পর সেই রজ্জুস্নেহের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে গমনকালে এই সব অনুচরের প্রয়োজন কি ?

রামচন্দ্র বনে চলিয়া গেলে অনুতপ্ত দশরথ নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিতেছেন,—

কশ্চিদাম্রবণং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ নিষিঞ্চতি।

পুষ্পং দৃষ্ট্বা ফলে গৃধ্নুঃ স শোচতি ফলাগমে ॥

অবিজ্ঞায় ফলং যো হি কর্ম ত্বেবানুধাবতি।

স শোচেৎ ফলবেলায়াং যথা কিংশুকসেচকঃ ॥

(অযো-৬৩।৮-৯)

'যদি কোন লোক আম্রবণ ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষে জল ঢালিতে থাকে,—তবে ফুল দেখিয়াই অনুরূপ ফলের লোভ করিয়া

সে লোক ফলাগমে শোক করিতে থাকে। ফল (কর্মফল, বৃক্ষফল) না জনিয়া যে লোক কর্মের পশ্চাদ্ধাবন করে ফলের বেলায় কিংশুক-সেচক যেমন করিয়া শোক করে সেও তেমন করিয়াই শোক করে।' এখানে আপাতরমণীয়া কৈকেয়ীই কিংশুক, রাম আম্রবণ।

ভরত রামকে বন হইতে ফিরাইয়া লইবার জন্য বনে আসিয়া রামকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে তাহারই (রামেরই) ফিরিয়া রাজ্যগ্রহণ করা উচিত; কারণ, রাজা দশরথ রামকে অনেক করিয়া একটি শিশু বৃক্ষ হইতে অতি যত্নে গবাদি পশু এবং অন্যান্য উৎপাত হইতে রক্ষা করিয়া আজ মহাদ্রুমরূপে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন; সে মহাদ্রুম আজ যদি যৌবনলাভে পুষ্পিত হইয়া আর কোন ফল প্রসব না করে তবে রোপণকারী যে-আনন্দলাভের আশায় তাহাকে রোপণ করিয়াছিল কিছুতেই সে আনন্দ উৎপাদন করিতে পারিবে না।—

যথা তু রোপিতো বৃক্ষঃ পুরুষেণ বিবর্ধিতঃ।
হ্রস্বকেন দুরারোহো রূঢ়স্কন্ধো মহাদ্রুমঃ॥
স যদা পুষ্পিতো ভূত্বা ফলানি ন বিদর্শয়েৎ।
স তাং নানুভবেৎ প্রীতিং যস্য হেতোঃ প্ররোপিতঃ॥

(অযো—১০৫।৮-৯)

ভরত যখন বনে গমন করিয়া গুহের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল তখন রামের কথা বলিতে বলিতে—

প্রস্রুতঃ সর্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদং শোকাগ্নিসম্ভবম্।
যথা সূর্যাগ্নিসন্তপ্তো হিমবান্ প্রস্রুতো হিমম্॥ (ঐ-৮৫।১৮)

সূর্যাগ্নিসন্তপ্ত হইয়া হিমালয়ের দেহ হইতে যেমন করিয়া হিম

গলিয়া পড়ে ভরতের সর্বদেহ হইতেও তেমন করিয়া শোকাগ্নিসম্ভব স্বেদ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অরণ্যকাণ্ডে দেখিতে পাই, অপমানিতা শূর্পণখা রামলক্ষ্মণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া ভোগবিলাসে মত্ত রাবণকে বলিয়াছিল—

সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্।
লুব্ধং ন বহুমন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ॥ (৩৩।৩)

'গ্রাম্য ভোগসমূহে আসক্ত লুব্ধ এবং কামবৃত্ত মহীপতিকে শ্মশানাগ্নির ন্যায় কখনও প্রজাগণ শ্রদ্ধা করে না।'

সীতাকে হরণ করিতে আসিয়া সীতার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ রাবণ বলিয়াছিল,—

চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি।
মনো মে হরসি রামে নদীকূলমিবাম্ভসা॥ (ঐ ৪৬।২১)

'হে চারুস্মিতা চারুদতী চারুনেত্রা বিলাসিনী সীতা, নদীজল যেমন করিয়া (তাহার ছলচ্ছল লাবণ্যে) কূলের মন হরণ করে তুমি তেমন করিয়াই আমার মন হরণ করিতেছ।'

অশোকবনে বন্দিনী সীতার বর্ণনায় দেখিতে পাই,—

অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং শোকভারাবপীড়িতাম্।
বায়ুবেগৈরিবাক্রান্তাং মজ্জতীং নাবমর্ণবে॥

অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা শোকভারপীড়িতা সীতা যেন সমুদ্রমধ্যে বায়ুবেগে আক্রান্ত ডুবু ডুবু নৌকা।

সুন্দরকাণ্ডে একস্থানে চন্দ্রের বর্ণনায় দেখিতে পাই,—

শঙ্খপ্রভং ক্ষীরমৃণালবর্ণম্
উদ্‌গচ্ছমানং ব্যবভাসমানম্।

দদর্শ চন্দ্রং স কপিপ্রবীরঃ
পোপ্লূয়মানং সরসীব হংসম্॥ (২।৫৫)

শঙ্খধবল ক্ষীরমৃণালবর্ণ চন্দ্র আকাশের উপরে উঠিয়া শোভা পাইতেছিল—যেন নির্মল সরসিজলে একটি শুভ্র হংস সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতেছিল।[১]

লঙ্কায় ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণের ভিতরে যখন তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল তখন উভয়ের অস্ত্রাঘাতে উভয়ের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কবিগুরু এই উভয় বীরের বীরত্বের গৌরবোজ্জ্বল মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন একটি মাত্র উপমায়—

ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গৌ লক্ষ্মণেন্দ্রজিতাবুভৌ।
রণে তৌ রেজতুর্বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ॥

রক্তাক্তকলেবর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়েই সে যুদ্ধে শোভা পাইতেছিল—দুইটি পুষ্পিত কিংশুকবৃক্ষের ন্যায়। বীরত্বের মহিমায় বাল্মীকির চোখে রক্তাক্ত ক্ষতগুলি তাজা লাল ফুল হইয়া দেখা দিয়াছে।

বাল্মীকির এইজাতীয় উপমাগুলি আলোচনা করিলে কালিদাসের উপমাগুলির সহিত যাঁহার ঘনিষ্ঠ-পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার নিকটেই এই উভয় কবির সাধর্ম্য অতি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। অবশ্য এখানে একটা সংশয়ের অবকাশ থাকিয়াই যায়, আমরা একেবারে গ্রন্থারম্ভেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি ; এ সংশয় বাল্মীকির রামায়ণে

---

(১) তু—ততঃ কুমুদষণ্ডাভো নির্মলং নির্মলোদয়ঃ।
প্রজগাম নভশ্চন্দ্রো হংসো নীলমিবোদকম্॥ (সুন্দর—১৭।১)

পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ লইয়া। তবে আমরা উপরে বাল্মীকি ও কালিদাসের যে সকল উপমা লইয়া আলোচনা করিয়াছি তাহার ভিতরেই দেখিতে পাই, উভয় কবির উপমা প্রয়োগে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও বাল্মীকির অনেক উপমা একটু প্রাচীনোচিত অস্পষ্ট এবং আড়ষ্ট—কালিদাসের সেই জাতীয় প্রয়োগ একেবারে নিখুঁত। সুতরাং মোটের উপরে রামায়ণোদ্ধৃত উপমাগুলিই প্রাচীনতর এই মতকে গ্রহণ করিয়া আলোচনা করিলে সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িবার ভয় আছে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা নানাদিক্ হইতে বাল্মীকি এবং কালিদাসের কবি-প্রতিভাকে পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম। আলোচনার অন্তে আবার আলোচনার প্রারম্ভে যে কথা বলিয়াছি, সেই কথায় ফিরিয়া যাইতে হয়। কালিদাস বাল্মীকির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী; বাল্মীকি হইতে শ্রদ্ধাবনত হইয়া দুই হাতে তিনি অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাকে পটভূমিতে রাখিয়া তাঁহার ভাস্বর প্রতিভাবলে অনেক কিছু আবার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের জন্যেও তিনি দুই হাত ভরিয়া সম্পদ্ বিলাইয়া গিয়াছেন। এই দেওয়া-নেওয়া উভয়ের ভিতর দিয়াই তাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণতা প্রকাশ পাইয়াছে, কবিগুরু বাল্মীকির লোকোত্তর বিগ্রহও তাহাতে অপূর্ব গৌরবে মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। যুগে যুগে দেশে দেশে এইরূপ প্রতিভার নিবিড় সম্বন্ধ,—তাহারা বলে—'সহবীর্যং করবাবহৈ—মা বিদ্বিষাবহৈ'—আমরা একসঙ্গে যেন বীর্যলাভ করি—কখনও যেন একে অন্যকে বিদ্বেষ না করি।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

সংসার-প্রবাহের ভিতরে 'নতুন কালে'র ঠিক রূপটি কি সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

কোন্ সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
"এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।"
(নতুন কাল, সেঁজুতি)

একদিকে অতীতের গঙ্গা—অন্যদিকে ভবিষ্যতের গঙ্গা—আর মাঝখানে জাগিয়াছে বর্তমানের চর। জলের উপরিভাগে এ-চরের যে পরিধিটুকু একবারে চোখে পড়িতেছে—তাহাই চরের সবটুকু কথা নহে,—অতীতের গঙ্গা—ভবিষ্যতের সম্ভাবনার গঙ্গা—ইহাদের জলের ভিতরে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে তাহার ভিত।

বাল্মীকি ও কালিদাসের সম্বন্ধে আলোচনার সময়েই আমরা এ কথা বলিয়া আসিয়াছি, কোন যুগই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে ; সে যদি আত্ম-সম্পূর্ণ হইত তবে তাহার একটা স্পষ্ট অবসানও ঘটিতে পারিত ; কিন্তু মানুষের সাধনা কালের সমগ্রতা জুড়িয়া ; একযুগের সাধনার অপূর্ণতা অপেক্ষা করে পরবর্তী যুগের সাধনাকে—এইখানেই একের সহিত অপরের নিরবচ্ছিন্ন যোগ—এইখানেই বিশ্ব-জীবনের অখণ্ডতা। তাই 'অতীত কাল' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

সেই ভালো প্রতিযুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তা'র গান ;
অতৃপ্তির দীর্ঘ-শ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।

তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তা'র মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কি বলে সে বুঝিতে কে পারে ;
(অতীত কাল, পূরবী)

এই যে দেশ-কালকে অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-জীবনের সহিত অখণ্ড যোগ রবীন্দ্রনাথ সে সত্যটিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এত গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তাকেও তিনি একটা বর্তমানের 'আমি-সত্তা'র ভিতরে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিতে পারেন নাই। এই 'আমি'র জীবন-ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে বহু পূর্বে— সেই সুদূর অতীতের অন্ধকারের ভিতরে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে তাহার অগ্রসরণের কাহিনী। আমরা ভাবি, এই জীবনের যত বলা—যত চলা—যত কলা তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে শুধু একটি এ-জীবনের আমি—যে আমির ইতিহাস রচনা করিয়াছে আমার জন্ম— অবসান ঘটাইবে আমার মৃত্যু।

আজি ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি
যাহার বলায় মোর বাণী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা,

যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরাণে।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা,
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা
গণ্ডী দিয়ে মোর মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে।
ভেবেছিনু সে আমারি আমি
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি।

কিন্তু পরক্ষণেই আসল সত্যটি কবির নিকটে উদ্ভাসিত হইয়াছে,---

জানি তাই, সে-আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।
সে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে,
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই-আমি আপনারে পেরেছে জানিতে

... ...

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে।

কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।

ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে-বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।

(আমি পরিশেষ)

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জুড়িয়া যে বিরাট অখণ্ড মানব-সত্তা তাহার সহিত ঐকাত্ম্যবোধই বড় প্রতিভার—বড় 'আমি'র লক্ষণ; এই বিরাট অখণ্ড হইতে যে বিচ্ছিন্ন সে-ই ছোট। দৈনন্দিন যে আত্মকেন্দ্রিক কর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়া আমরা জীবনের এই অখণ্ডতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি বিশেষ জন্মমৃত্যু দ্বারা অবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র 'আমি'র ভিতরে নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছি তাহার ভিতর দিয়াই আমাদের জীবন হইয়া উঠিতেছে লৌকিক; এই লৌকিক রাজ্যে প্রতিভার স্থান নাই; যেখানে আমরা বৃহতের সঙ্গে যোগে বড় হইয়া উঠিয়াছি সেইখানেই আমরা লোকোত্তর—সেইটাই প্রতিভার রাজ্য। রবীন্দ্রনাথের ছিল সেইজাতীয় লোকোত্তর প্রতিভা —বিশ্বজীবনের সহিত তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের যোগও ছিল তাই নিবিড়তম। অতীত জীবন তাই তাঁহার নিকটে মৃত নয়—সে নীরব গভীর; বাহিরে সে আজ কথা বলে না,—আজ 'কলকল ভাষ নীরব তাহার',—'তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন',—কিন্তু তাহার মৌন বাণীর মুখরতা জাগিয়াছে অন্তরের গভীরে।—

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও,
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা মাঝে স্থির হ'য়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও কথা কও॥

(অতীত, কথা)

অতীতের এই অদৃশ্য সক্রিয় রূপটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবি-জীবনে বহুবার সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বহুবার বহুভাবে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহার শিল্পিমনের নিলীয়মান উপচ্ছায়ায় অতীতের অদৃশ্য শক্তিকে। 'গহন গোপন-সঞ্চারিণী' এই অদৃশ্য শক্তি যে রবীন্দ্রনাথের 'অন্তর্যামী'র ভিতরে কিভাবে কতটুকু শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে আজ আর সে-কথাও স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া ওঠা সহজ নহে। জীবনের সন্ধ্যায় কবি অনুভব করিয়াছিলেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যে অতীতের শূন্যে অবলুপ্ত হইতেছে সেখানে তাহারা একেবারে হারাইয়া যাইতেছে না—বাহিরের স্থূলরূপ শুধু মনোময়রূপে পরিণত হইতেছে।

রূপময় বিশ্বধারা অবলুপ্তপ্রায়
গোধূলি-ধূসর আবরণে,
অতীতের শূন্য তার সৃষ্টি মেলিতেছে মোর মনে।

এ শূন্য তো মরুমাত্র নয়,
এ যে চিত্তময় ;
বর্তমান যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন,
অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল মাঝে তারি ফল শস্য ফলিছে নিয়ত।
(অতীতের ছায়া, বীথিকা)

কবির অনুভূতিতে অতীত তাই নিরাসক্ত শিল্পী—অন্ধকারের ভিতর দিয়াই নূতন কালের আকাশে কত উজ্জ্বল তারকা ছড়াইয়া দিতেছে ; নূতন কাল তাহার অনেকগুলিকে সাদরে গ্রহণ করিতেছে—কতগুলিকে আবার অশান্ত ফুৎকারে নিভাইয়া দিতেছে।

হে অতীত,
শান্ত তুমি নির্বাণ-বাতির
অন্ধকারে,
সুখ-দুঃখ-নিষ্কৃতির পারে।
শিল্পী তুমি, আঁধারের ভূমিকায়
নিভৃতে রচিছ সৃষ্টি নিরাসক্ত নির্মম কলায়,
স্মরণে ও বিস্মরণে বিগলিত বর্ণ দিয়া লিখা
বর্ণিতেছ আখ্যায়িকা ;
পুরাতন ছায়াপথে নূতন তারার মতো
উজ্জ্বলি উঠিছে কত,

কত তার নিভাইছ একেবারে
যুগান্তের অশান্ত ফুৎকারে।

(অতীতের ছায়া, বীথিকা)

ভারতীয় দার্শনিকগণের ভিতরে পূর্ব-মীমাংসকগণ মনে করিতেন, মানুষের এক জীবনের সকল কর্ম তাহাদের স্থূল রূপ বদলাইয়া একটা সূক্ষ্ম শক্তিরূপে অবস্থান করে,—পরবর্তী জীবনে কর্মের এই সূক্ষ্ম রূপই 'অদৃষ্ট' রূপ ধারণ করিয়া মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। একটু ব্যাপক ভাবে এই মতটি সমগ্র জাতীয় জীবনের উপরেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পূর্বতন যুগের কৃত সকল কর্ম এইভাবে সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করিয়া 'অদৃষ্ট'রূপে অনেক খানি নিয়ন্ত্রিত করে জাতীয় জীবনধারাকে। এ-সত্য মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রের সত্য—সুতরাং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা সন্ধান লাভ করি সেই একই সত্যের।

আমরা আমাদের পূর্বভাগের আলোচনায় দেখিতে পাইয়াছি, কি করিয়া ভারতীয় প্রাচীন আরণ্যক ও কৃষি যুগের কবি বাল্মীকির কাব্য-সাধনা মধ্যযুগের কবি কালিদাসের কবি-প্রতিভাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে; প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, রামায়ণের কবি বাল্মীকিও কি করিয়া বৈদিক কবিগণের সাধনার ফলভাক্ হইয়াছিলেন। আমরা বর্তমান আলোচনায় দেখাইতে চেষ্টা করিব, ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে কবি রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া তাঁহার কাব্য-সাধনায় পূর্ববর্তী সকল কবিগণের সাধনার ফলকে গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু নিকটের জিনিস গ্রহণ করেন নাই—দূরের জিনিসও গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু দেশী জিনিস গ্রহণ করেন নাই—দুই হাত ভরিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছেন বিদেশ হইতেও;

তিনি মহাজনও অতি বড়—তাই তাঁহার লেন-দেনের পরিমাণ ও পরিধিও অনেক বড়।

কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ভাষায় এবং ভাবে শুধু পূর্ববর্তী বাঙালী কবিগণকেই গ্রহণ করেন নাই,—সংস্কৃত কবিগণকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন অকুণ্ঠিতচিত্তে—বিপুল বীর্যের পরিচয়ে। অবশ্য ইউরোপের ধনভাণ্ডারের চাবিও তিনি তাঁহার হাতের কাছে লইয়াছিলেন শৈশব হইতেই,—সেখান হইতেও গ্রহণ করিয়াছেন পর্যাপ্ত ভাবে। এ 'তরুণ গরুড়ে'র ছিল বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা—তাই গ্রহণও করিয়াছেন সকল যুগ হইতে সকল দেশ হইতে। আমরা এখানে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতরেও আবার বিশেষ করিয়া মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যের সহিত তাঁহার গভীর যোগের কথাই আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথের উপরে সংস্কৃত কবিতার প্রভাবের কথা আলোচনা করিতে গেলে এক-জাতীয় সাদৃশ্য বা মিলের কথা আমাদের মনে আসিতে পারে, যে-জাতীয় মিল প্রভাব-জনিতও হইতে পারে, আবার রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনকল্পনা-প্রসূতও হইতে পারে। যেমন—

একটি মাধবীলতা আপন ছায়াতে
দু'টি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন।

(হাসি, কড়ি ও কোমল)

এখানকার 'অধরের রাঙা কিশলয়-পাত' আমাদিগকে কালিদাসের 'অধরঃ কিশলয়রাগঃ' প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। অথবা—

নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী ;—
এমনি নিভৃত নিরালায়, মনে হয়
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান ক'রে যায় ; গভীর পূর্ণিমারাত্রে,
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শস্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত অঞ্চলে।

(চিত্রাঙ্গদা)

ইহাও আমাদিগকে বাল্মীকি, কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি বহু কবিকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় দেখিতে পাই—

বল দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বর-তল,
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে,

ইহা আমাদিগকে কাদম্বরীর সন্ধ্যাবর্ণনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। সেখানে দেখিতে পাই—

তেজঃপতিপতনাচ্চিতানলমিব সন্ধ্যারাগমপরাশয়া সহ বিশতি পশ্চিমে গগনভাগে, সন্ধ্যানলস্ফুলিঙ্গনিকর ইব স্ফুরতি তারাগণে,

দিবসবিরামান্মূর্চ্ছাগমেনেব তমসা নিমীল্যমানেষু দিঙ্মুখেষু—ইত্যাদি।

অর্থাৎ—সূর্য অস্তাচলে পতিত হইলে সন্ধ্যারাগ চিতানলের ন্যায় পশ্চিমদিকের সহিত পশ্চিম গগনে আবির্ভূত হইল, তারকাগণ এই চিতানলের স্ফুলিঙ্গনিকর; দিবসের অবসানে মূর্চ্ছাগমের ন্যায় অন্ধকারে দিঙ্মুখগুলি ঢাকিয়া গেল।

'চিত্রা'র 'প্রেমের অভিষেকে'র ভিতরে দেখিতে পাই,—

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ-মর্মরে; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি'
করপদ্মতল-লীন ম্লান মুখশশী
ধ্যানরতা; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দির তলে বসি' একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী; ভিখারী শিবের কোল

সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে ;..............
...............হাত ধ'রে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে।

এখানে প্রেমের ভিতরে বিশ্বমানবের সহিত এক হইয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতরেই যে কবি প্রেমের এবং সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছেন সে-কথা অতি স্পষ্ট ; কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া কবির সংস্কৃত-সাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ—তাহার সংস্কৃত-সাহাত্যানুরাগ এবং তাহার সহিত একটা অতীত-প্রীতিরই সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা কবি-প্রতিভার উপরে সংস্কৃত-সাহিত্যের কোন গভীর প্রভাবের পরিচয় নয়। 'খেয়া'র 'বিকাশ' কবিতাটির ভিতরে দেখিতে পাই—

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

ইহার সহিত বৈদিক ঊষা-বর্ণনা—

অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে
বক্ষ উস্রেব বর্জহং।

(ঋক্-১৷৯২৷৪)

অর্থাৎ—'নর্তকীর ন্যায় ঊষা রূপ ধারণ করিতেছে এবং দোহনকালে গাভী যেরূপ উধঃ প্রকাশ করে সেইরূপ ঊষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশ করিতেছে।'—প্রভৃতির মিল দেখান যাইতে পারে।

'নৈবেদ্যে'র 'মৃত্যু' কবিতাটির (৯০ নং) ভিতরে একটি উপমা দেখিতে পাই,—

স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে ॥

ইহার সহিত আমরা বিশখাদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে'র 'স্তনন্ধয়ো হত্যন্তশিশুঃ স্তনাদিব' (৪।১৪) প্রভৃতির মিল দেখাইতে পারি। 'বলাকা'র 'শা-জাহান' কবিতাটির ভিতরে—

তব সৈন্যদল
যাদের চরণ-ভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ু-ভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি-পরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবৎ মিলায় না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুর-নিক্বণ
ভগ্ন-প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।

প্রভৃতি বর্ণনা আমাদিগকে কালিদাসের 'রঘুবংশে'র কুশ-পরিত্যক্ত অযোধ্যাপুরীর বর্ণনার কথাই স্মরণ করাইয়া দিবে (১৬।১২-২০ ; এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য)।

রবীন্দ্রনাথ স্থানে স্থানে বসন্তের নবপল্লবকে অগ্নিবান বা অগ্নিশিখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

বর্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয় বাণ বন-শাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া।
(বসন্ত, মহুয়া)

আবার—

তব ধ্যান মন্ত্রটিরে
আনিল বাহির-তীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্য-হারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি' সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন পত্রে জ্বালি' দিলো অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।
(তপোভঙ্গ, পূরবী)

ইহার সহিত আমরা রামায়ণে বাল্মীকির বসন্ত বর্ণনার তুলনা করিতে পারি,—

মাং হি পল্লবতাম্রার্চির্বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি। (কি—১।২৯)

'পল্লবের তম্র-অর্চি লইয়া বসন্ত আমাকে দগ্ধ করিতেছে।' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি;
(শুভযোগ, মহুয়া)

বাল্মীকি লিখিয়াছেন,—'অশোকস্তবকাঙ্গারঃ', আর কালিদাস লিখিয়াছেন—

আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈর্মরুতাবধূতৈঃ
সর্বত্র কিংশুক-বনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।

(ঋতু-সংহার, ৬।১৯)

আমরা কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। রবীন্দ্রনাথের বিপুল কাব্যরাশির ভিতরে সংস্কৃত-কাব্যের সহিত এখানে সেখানে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট এ-জাতীয় বহুমিল দেখান যাইতে পারে; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই-জাতীয় মিলের উপরে আমরা বিশেষ জোর দিতে চাহি না; কারণ, এখানে কোন্‌টা রবীন্দ্রনাথ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে গ্রহণ করিয়াছেন আর কোন্‌টা স্বাধীন দৃষ্টিতে সৃষ্টি করিয়াছেন সে-কথা কিছু জোর করিয়া বলা চলে না। ইহার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের সহিত সংস্কৃত-সাহিত্যের যোগের পরিচয়টিও গভীর করিয়া পাওয়া যায় না।

সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের সহিতই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, এবং গ্রহণও হয়ত করিয়াছেন বহুস্থান হইতে বহু প্রভাব; কিন্তু তাঁহার গভীরতম যোগ ছিল কবি কালিদাসের সঙ্গে। মোটের উপরে কালিদাস তাঁহার নিকটে সমগ্র সংস্কৃত কবিগণের প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন। ভারতবর্ষের জাতীয় সাহিত্য রামায়ণ এবং মহাভারত রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল; 'প্রাচীন সাহিত্যে'র ভিতরে 'রামায়ণ' প্রবন্ধের ভিতরে তিনি যে কথা বলিয়াছেন তাহার ভিতরেই এই শ্রদ্ধার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। 'সোনার তরী'র 'পুরস্কার' কবিতার ভিতরে তিনি রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দুইখানির যে দুইটি রূপ দিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়াই কাব্য-হিসাবে এই গ্রন্থ দুইখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ধৃত রূপের

একটি আভাস রহিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই রামায়ণ এবং মহাভারতে বর্ণিত জীবন সহস্র সহস্র শতাব্দীর ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া আজিও আসিয়া আমাদের চিত্তের দ্বারে কি ভাবে আঘাত করিতেছে তাহারও মধুরতম পরিচয় দিয়াছেন এই কবিতাটির ভিতরে।—

সে-সকল দিন সে-ও চ'লে যায়,
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়,
যায় নি ত এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।

দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যাম-লেখা।

শুধু সেদিনের একখানি সুর
চির দিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে,
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহা সঙ্গীতে
বাজে মানবের কানে।'

'মহাভারত' সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা,—

কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতা-বহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তা'র,
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিক আর।

তবু কোথা হ'তে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমর-সাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে,
বিজয়ের শেষে সে মহা প্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান্,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চির-মানবের প্রাণে।

রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পত্তি—পরবর্তী কালের কবিগণ সকলেই এখান হইতে ভাব ভাষা উপাখ্যান এবং প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রহণ সম্বন্ধে আমরা বাল্মীকি-কালিদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছি, এক্ষেত্রেও সেই কথাই প্রযুজ্য। বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসদেবের মহাভারত হইতে রবীন্দ্রনাথ যেখানে যেটুকু গ্রহণ

করিয়াছেন সেখানে যে তিনি বাল্মীকি বা ব্যাসদেবের কাব্যাংশের পুনরাবৃত্তি মাত্র করেন নাই তাহা সহজবোধ্য ; এ গ্রহণের তাৎপর্য জীবনের নবলব্ধবাণীকে অতীত জীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবন-রসের 'সামরস্য' আস্বাদন করা। তা ছাড়া মানুষের জীবন-ইতিহাসের অতীত অংশটার একটা রহস্যঘন মহিমা রহিয়াছে, সেই মহিমার উদ্ভাসের উপরে বর্তমানের জীবনও সহজেই মহিমান্বিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা নূতন সাহিত্য রচনার জন্য তখনই অবলম্বন করি যখন আমাদের চিত্তের ভিতরে যে একটি বিশেষ জীবন-দর্শন রহিয়াছে প্রাচীন সাহিত্য বা সাহিত্যাংশের দ্বারা আমাদের সেই জীবন-দর্শনের একটা রসময় উদ্বোধ ঘটে। সেই যে রসময় উদ্বোধ তাহাতো কবির নিজস্ব—তাহা সম্পূর্ণ এ-কালের ; সুতরাং সেকালের বিষয়-বস্তুর দেহের ভিতরে যে প্রাণ-সঞ্চারণ ঘটে তাহা একালেরই জিনিস। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ মহাভারত—এমন কি উপনিষদ্, বৌদ্ধ-সাহিত্য প্রভৃতি হইতে যত কবিতার বিষয়-বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ভিতরকার প্রাণ-বস্তুও উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর।[১]

রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতি-নাট্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র কবি-প্রেরণা কিশোর কবি বাল্মীকি হইতে বা অন্য কোন সংস্কৃত কবি হইতে লাভ করেন নাই, করিয়াছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিকট হইতে। তবে রামায়ণে বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্ব লাভের উপাখ্যানটি রবীন্দ্রনাথের কবি-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া একটি নূতন রূপ লাভ করিয়াছিল কবির 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির ভিতরে। এই কবিতার ভিতরে কবি বলিয়াছেন,

(১) দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত-সাহিত্য—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, জয়ন্তী-উৎসর্গ।

যে-রামায়ণ কাব্য-সৃষ্টি সেই রামায়ণের রামের জন্মভূমি হিসাবে অযোধ্যার চেয়ে কবি বাল্মীকির মনোভূমিই বেশী সত্য ; সেই সুরেই সুর মিলাইয়া বলা যাইতে পারে, 'ভাষা ও ছন্দে'র ভিতরে আমরা যে কবি বাল্মীকির সাক্ষাৎ লাভ করি,—

যিনি—

বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ ;

আর নব ছন্দকে উচ্চারণ করিয়া যিনি বলিয়াছিলেন—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হ'য়ে আসে ক্ষীণ
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে,
... ...
মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—

সেই কবি বাল্মীকির জন্মভূমিও রবীন্দ্রনাথের চিত্তভূমিতেই সব চেয়ে বেশী। আদি কবির প্রথম ছন্দোলাভের তথ্যটিকে রবীন্দ্রনাথ

এখানে যে-সত্যে পরিণত করিয়াছেন সে-সত্য তাঁহার নিজস্ব। এই তথ্যের উপরে এই সত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে যে রবীন্দ্রনাথ প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন তাহার কারণ, এই তথ্যের ভিতরে তিনি আভাস পাইয়াছিলেন এই সত্যের; সে হয়ত বীজাকারে নিহিত ছিল—অনুকূল চিত্তভূমিতে সেই বীজই আত্ম-সম্প্রসারণ করিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন তথ্যের উপরে এক্ষেত্রে সত্যের আরোপ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ হইতে একেবারে দূরে সরিয়া পড়েন নাই; নারদ-মুনিকে কবি বাল্মীকি যে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহা দৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে, নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে, সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।"

ইহা মূল রামায়ণের অর্থকেও অনেকখানি সম্প্রসারিত এবং মহিমান্বিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।[১]

(১) তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্॥

কিন্তু রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে প্রলুব্ধ করিবার উপাখ্যানটিকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে 'পতিতা' রচনা করিয়াছেন তাহার সহিত রামায়ণের যোগ শুধু ঐ একটা উপাখ্যানের কাঠামোর; প্রাচীন তথ্য এখানে নবরূপে সত্য হইয়া ওঠে নাই,—সত্য এখানে তথ্যের উপরে সম্পূর্ণ ভাবেই আরোপিত। এই প্রসঙ্গেই 'মানসী'র ভিতরকার 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটির কথা মনে পড়িয়া যায়। এখানেও অহল্যাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়াছেন ঠিক অহল্যাকে অবলম্বন করিয়া এ-কথার আভাস রামায়ণে কোথায়ও নাই। কিন্তু তথাপি এ ক্ষেত্রে বাল্মীকির কবি-মানসের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের একটা গভীর মিল রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে-কথা এখানে বলিয়াছেন অহল্যাকে অবলম্বন করিয়া, আদি কবি বাল্মীকি সে-কথার আভাস দিয়াছেন সীতার ভিতর দিয়া। একথাটি সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব, অতএব এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া রাখিলাম।

কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ ।।
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ ।।
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে ।।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽপি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্ ।।

(রামায়ণ, আদি—১।১-৫)

রামায়ণের ন্যায় মহাভারত হইতেও রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু কবিতার বিষয়-বস্তু নির্বাচন করিয়াছেন, তাহার ভিতরে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘গান্ধারীর আবেদন’, ‘কর্ণকুন্তী-সংবাদ’ প্রভৃতি নাট্য-কাব্য। এ-গুলি সম্বন্ধেও নূতন করিয়া বলিবার নাই কিছু; একটি উপাখ্যানের সূত্রসার বা চরিত্রের গোটাকয়েক রেখাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা ভাবের দিক হইতেও তাঁহার নিজস্ব—প্রকাশভঙ্গীর দিক হইতেও নিজস্ব।

কিন্তু এহো বাহ্য! অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উপরে রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য কিছু কিছু সংস্কৃত সাহিত্যের অল্পবিস্তর প্রভাব থাকিলেও তাঁহার বিরাট কবি-প্রতিভার তুলনায় তাহা একরূপ নগণ্য,—সত্যকার রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব, অথবা সত্যকার রবীন্দ্রনাথের সহিত দেশ-কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের গূঢ়তম যোগ কালিদাসের। কালিদাসকে তিনি যেমন করিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন পূর্ববর্তী কবিগণের ভিতরে এমন আর কাহাকেও নহে। এই স্বীকরণের ও স্বীকৃতির কারণও রহিয়াছে। সে কারণ এই, কালিদাসের কবি-ধর্মের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের একটা সজাতীয়তা আছে।

কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এতখানি অনুরক্তির কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে পাই ভাষার সঙ্গীত-ধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আশৈশব অনুরক্তি। কৈশোরেই তাঁহার হৃদয়ের অফুরন্ত আকুতি লইয়া তিনি পদে পদে অনুভব করিয়াছেন, ‘মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে’ এবং এই সীমাবদ্ধ অর্থের বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্তি দিতে হইলে অবলম্বন করিতে হইবে শব্দের

ধ্বনি-সম্পদকে। এই ধ্বনি-সম্পদের দিক হইতে গরীয়সী সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষার এই ঐশ্বর্য শৈশবেই তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে কবি বলিয়াছেন,—

"আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিস বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা নাড়া দিয়াছে। আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ-ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।···

······একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দ খানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র

কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'—এই পদটি ঠিকমতো যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণতো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরও একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ॥

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিত-দেবদারু' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল।"

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র ছন্দ দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই ছিল স্বাভাবিক ; জয়দেবের ভাষা ও ছন্দের কারুকার্য অনেকখানি উজ্জ্বল রঙ-বেরঙের ছবি—কিশোরচিত্তকে অতি সহজে আকৃষ্ট করে এবং নাড়া দেয়। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভিতরে এই আকর্ষণ এবং লঘু চিত্তবিলোড়নের পরিচয় রহিয়াছে।

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষণ্ণ।

প্রভৃতি যে জয়দেবের উপরেই মক্‌সমাত্র তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। সংস্কৃতের এই ধ্বনি-সম্পদের প্রাচুর্যে মুগ্ধ এবং লুব্ধ হইয়া সংস্কৃত বহু কবিই সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছেন; সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রভৃতির শ্লেষ-প্রীতি চমৎকারিত্বের জন্য লোভনীয় হইলেও স্থানে স্থানে আবার মুদ্রাদোষে রূপান্তরিত হইয়া কাব্যের ব্যাধিভূত হইয়া পড়িয়াছে,—ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বিবিধবৃত্তি, বন্ধ এবং অনুপ্রাস-যমক সর্বত্র সাহিত্যের অঙ্গীভূত নহে, সাহিত্যের উপকণ্ঠে তাঁবু খাটাইয়া প্যাঁচ কষিয়া তাক লাগাইবার চেষ্টা; জয়দেব ধ্বনি-প্রবাহে ভাসিয়াই চলিয়াছেন—শক্তভূমিতে পা ছোঁওয়াইয়া দাঁড়ান নাই; কিন্তু এ-ব্যাপারে কালিদাস একেবারে নিখুঁত। তিনি ধ্বনি-সম্পন্ন ধনি-পরিবারের ছেলে—প্রতিভায় ছিল অনন্তযৌবনের প্রাচুর্য—কিন্তু আশ্চর্যভাবে সংযমী হইয়া পড়িয়াছিলেন,—উচ্ছৃঙ্খলতার মত্ততা নাই কোথায়ও। বিপুল সম্পদ্‌কে কি করিয়া অধিকার করিতে হয়, কি করিয়া তাহাকে সাধুতম এবং সুষ্ঠুতম উপায়ে ব্যবহার করিতে হয় সে কথাটি তাঁহার জানা ছিল। এই কারণে সংস্কৃত ভাষার যেখানে বৈশিষ্ট্য কালিদাসের হাতে তাহা লাভ করিল একটা সুস্থ সার্থক পরিণতি। এইখানে আসিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, ছন্দের দিক হইতে হোক, শব্দালঙ্কারের দিক হইতে হোক, অর্থালঙ্কারের দিক হইতে হোক এক একটি শ্লোক এক একটি নিটোল মুক্তার দানা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা

হইতে কোথায়ও একটি টুকরা ভাঙ্গিয়া খসাইয়া লইয়া সেখানে অন্য কিছু বসাইয়া দিবার জো নাই, আপনি খসিয়া পড়িয়া যাইবে।

শুধু বাঙলা ভাষার কবি হিসাবে নয়, আধুনিক যুগের ভারতীয় কবি হিসাবে কালিদাসের পরে কাব্য-কলার এই নিখুঁত পরিণতি দেখা গিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে, অন্ততঃ শেষ-দিকের রচনায়। সম্পদে অপ্রমত্ততা, প্রাচুর্যে অপূর্ব সংযম, বৈচিত্র্য-বিলাসের ভিতরে সুনিপুণ বৈদগ্ধ্য রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মকে কালিদাসের কবিধর্মের একান্ত সজাতীয় করিয়া তুলিয়াছিল, তাই উভয়ের আত্মীয়তাও এত গভীর।

শুধু এই দিক হইতে নয়, কবিধর্মের আরও অনেক মৌলিক উপাদানে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের সজাতীয়ত্ব লক্ষিত হইবে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে বলিয়াছেন 'মানস লোকে'র কবি; এই 'মানস' কৈলাস-শৃঙ্গের 'মানস লোক'ও বটে, নিখিল মানবের 'মানস লোক'ও বটে।

মানসকৈলাসশৃঙ্গে নির্জন ভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দির প্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি, কবি কালিদাস।
নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধ-নীল-ভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘনমেঘদলে,
জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।
আজিও মানসধামে করিছ বসতি,
চিরদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি,
শঙ্কর চরিতগানে ভরিয়া ভুবন।

(মানসলোক, চৈতালি)

রবীন্দ্রনাথের 'মানস লোকে'ও একটি অশরীরী কবি বিচরণ করিত —যাহার বাসনা ছিল—

এপারে নির্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্ধ্বে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদ-সৌধ, অনিন্দ্য নির্মল
চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা, ·····
··················অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

(আবেদন, চিত্রা)

এখানকার এই 'মানস লোক'টির সঙ্গে পূর্ববর্ণিত কবি-কল্পিত কালিদাসের বিহার ভূমি 'মানস-লোকে'র একটি প্রচ্ছন্ন মিল অল্পেই চোখে পড়িয়া যায়; দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথের 'মানস'-বিহারী অশরীরী কবিও কালিদাসের ন্যায় সংসারের ঊর্ধ্বে বহু দূরের একটি নির্জন মানস লোকে অবস্থান করিয়া নিখিল মানবের মানস লোকে অমর হইয়া থাকিবার বাসনা পোষণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কালিদাস ছিলেন সেই কবি যিনি সমসাময়িক দৈনন্দিন জীবনের সকল তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, মান-অপমান, লাভ-ক্ষতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া জীবন-মন্থনজাত বিষকে অঞ্জলি পুরিয়া নিজেই পান করিয়াছেন, আর অমৃত

যাহা কিছু উঠিয়াছিল তাহা গানে গানে নিখিল বিশ্বে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

তবু কি ছিল না তব সুখ দুঃখ যত
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমান ভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর, নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি'।
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্যপানে। তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ দৈন্য দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল ক'রে গেছ দান॥

(কাব্য, চৈতালি)

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতায়, নাটকে, প্রবন্ধে কাব্যের ও কবির যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তাহার সহিত কাব্য ও কবির এই আদর্শের গভীর মিল রহিয়াছে; কালিদাসকে রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন এবং সেই জন্যই গভীর হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের সম্পর্ক।

আসলে কালিদাস ছিলেন মধ্যযুগের রোম্যান্টিক কবি।

'রঘুবংশের' ক্ষেত্রে কিছু সংশয় থাকিলেও, 'মেঘদূত,' 'কুমাসম্ভব,' 'অভিজ্ঞান শকুন্তল', বা 'বিক্রমোর্বশী' প্রভৃতির ক্ষেত্রে মনে খুব বেশী সংশয় থাকে না। অন্যান্য আরও অনেক প্রবণতার সহিত কালিদাসের এই রোম্যান্টিক মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে একটা দূর-প্রীতিতে, সে দূরত্ব স্থানেরই হোক বা কালেরই হোক। প্রিয়া-বিরহের রহস্যের যবনিকার অন্তরালে মহনীয় করিয়া তুলিবার জন্য কবি তাই শাপের ভাণ করিয়া হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত অলকাপুরী হইতে নিজেকে সুদূর রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত করিয়া লইয়াছেন ও তারপরে শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিয়া শুধু কল্পনার জাল বুনিয়া এই সবটুকু দূরত্বের ফাঁক ভরিয়া দিয়াছেন। আসলে কবি এই দূরত্বের ফাঁকটুকুই একান্তভাবে চাহিয়াছিলেন বিচিত্র কল্পনার লীলাভূমি রূপে। 'কুমার-সম্ভবে'র ভিতরেও আমরা দেখিতে পাই, হিমালয়ের পার্বত্য বনপ্রদেশে আলো-অন্ধকারের ভিতরে চেতন-অচেতনের মেলামেশার ভিতর দিয়া কবি যে এক কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন সেখানে কোন স্পষ্ট বুদ্ধির দীপ-বর্তিকা লইয়া কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, সেখানে প্রবেশ করিতে হয় রসানুভূতির আলো-আঁধারি গোধূলিতে। শকুন্তলাকেও কালিদাস স্থাপন করিয়াছেন নগর হইতে অনেক দূরে—আরণ্য তপোবনের আশ্রম প্রাঙ্গণে; সেখানে তাহার যে জীবন তাহা নাগরিক সমাজ ও সমাজহীন আরণ্য জীবনের মাঝখানে তরুলতা, পশুপাখীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া একটা অনির্বচনীয় রহস্য লাভ করিয়াছে। বিরহোন্মত্ত রাজা পুরূরবাকেও কালিদাস এমনই একটি আরণ্য পরিবেষ্টনীর পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রেমকে পূর্ব চারুত্ব ও রহস্য দান করিয়াছেন। কালিদাসের রচনা সমূহের

ভিতরে আমরা যেটাকে মুখ্যতঃ ক্ল্যাসিক রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি সেই 'রঘুবংশে'র ভিতরেও দেখিতে পাই, কবির প্রতিভা একটা বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে যেখানে তিনি তাঁহার কল্পনাকে একটা স্বাধীন বিচরণ ক্ষমতা দান করিয়াছেন তপোবন জীবনের ভিতরে। 'রঘুবংশে'র দ্বিতীয় সর্গটি তাই এত সরস, সাবলীল এবং উজ্জ্বল,—ত্রয়োদশে রাম-সীতার বিমান-বিহার তাই এত বিচিত্র মধুর।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কল্পনা-বিলাসী 'সুদূরের পিয়াসী'; এই সুদূর—বিপুল সুদূরের কল্প-লোক তাই যখন 'ব্যাকুল বাঁশরী' বাজাইত তখন কবি তাঁহার 'ডানা নাই, আছি একঠাঁই' একথা ভুলিয়া যাইতেন এবং বাহির জীবনের সমস্ত কোলাহল হইতে নিজেকে গুটাইয়া লইয়া নির্জনে একাকী শুধু কল্পনার জাল বুনিয়া নিজেকেই বাঁধিতেন এবং ছাড়াইতেন। বহির্বিমুখ কল্পনার আত্মরতি—ইহাই একটি মৌলিক রোম্যান্টিক ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের যে-সকল কাব্য বা কাব্যোপন্যাস পাওয়া যায় তাহার ভিতরেই কবির এই রোম্যান্টিক ধর্ম প্রকট হইয়াছে। সেখানেই দেখিতে পাই, পারিপার্শ্বিক জীবনের কোলাহল হইতে কবি নিজেকে গুটাইয়া লইয়াছেন; সেখানে অন্তরের একটি নিভৃত নির্জন প্রদেশে নিজেকে স্থাপিত করিয়া মনকে পাঠাইয়াছেন শুধু কল্পলোকে। সেই কল্পলোকে কি দেখিতে পাই? সমাজ জীবনের অনেক দূরে নিভৃত নির্জন বন-কাননের ভিতরে শুধু অস্ফুট বিচিত্র রঙিন প্রেমের গুঞ্জরণ। তখন পর্যন্তও কালিদাসের সহিত তরুণ কবিমনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই; তাই কল্পনা-বিলাসী সে মন নিরালম্ব ভাবেই জাল বুনিয়া চলিয়াছে।

'ছবি ও গান' পর্যন্ত ও আমরা রবীন্দ্রনাথের মনের উপরে

কালিদাসের স্পষ্ট কোন প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি না। এখানেও মাঝে মাঝে কিশোর রোম্যাণ্টিক মনের হা-হুতাশ এবং আকুতির পরিচয় পাইতেছি—সে আকুতি এখন পর্যন্তও কালিদাসকে আশ্রয় করে নাই। কবি একেলা আকাশের পানে তাকাইয়া আছেন—আর সেই অবস্থায়—

বসন্ত-বাতাসে আঁখি মুদে আসে,
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
কুসুমের মৃদু বাস।
যেন সুদূর-নন্দন-কানন-বাসিনী,
সুখ-ঘুম-ঘোরে মধুর-হাসিনী,
অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ
ভেসে ভেসে বহে যায়,
অতি মৃদু মৃদু লাগে গায়।
বিস্মরণ-মোহে আঁধারে আলোকে
মনে পড়ে যেন তায়,
স্মৃতি-আশা-মাখা মৃদু সুখে দুখে
পুলকিয়া উঠে কায়।
ভ্রমি আমি যেন সুদূর কাননে,
সুদূর আকাশতলে,
আনমনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সরযূর কলকলে।

... ...

যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালা,
কুসুম-শয়নে আধেক মগনা
বাসক-বসনে আধেক নগনা,
সুখ দুখ গান গাহিছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা।

(জাগ্রতস্বপ্ন, ছবি ও গান)

এইখানেই কালিদাসের স্মরণ ঘটিতে পারিত, কিন্তু কল্পনা-বিলাসী কবির মানস-প্রিয়া এখন পর্যন্তও কালিদাসের মানস-প্রিয়ার সহিত এক হইয়া যায় নাই; পরবর্তী কালে দেখিতে পাই, এই-জাতীয় স্থলেই কালিদাস তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-জগৎ লইয়া রবীন্দ্রনাথের মানসে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং কবি অতীতের 'হিমানী-কুহেলীমাখা' কালিদাস-বিরচিত কল্পলোকে প্রবেশ করিয়া একটা তৃপ্তি এবং স্ফূর্তি লাভ করিয়াছেন। কালিদাস তাঁহার সাহিত্য-জগৎকে অনেকখানি কল্পলোকের স্বপ্ন করিয়া রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপরে আবার পড়িয়াছে বহুশত বৎসরের যবনিকা—সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছিল সেটা সোনায় সোহাগা। এই 'ছবি ও গানে'র ভিতরেই দেখিতে পাই, একটু মধুর স্বপ্নবিলাসের ভিতর দিয়া কবি অতীত জীবনের ভিতরে ভাসিয়া যাইবার প্রবণতার আভাস দিতেছেন। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় দেখি—

নীল শূন্যে ছবি আঁকা রবির কিরণমাখা,
সেথা যেন বাস করিতেছি,
জীবনের আধখানি যেন ভুলে গেছি আমি,
কোথা যেন ফেলিয়ে এসেছি।

আনমনে ধীরি ধীরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়,
কোথা যাব কোথা যাই সে কথা যে মনে নাই,
ভুলে আছি মধুর মায়ায়,
... ...
বুঝিরে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষি-বালিকারা,
পরিয়া বাকল-বাস, মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণ-শিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁষে,
মালিনী বহিত পদতলে,
দু-চারি সখীতে মেলি কথা কয় হাসি খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে।

'কড়ি ও কোমলে'র ভিতরেও রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে শুধু ছুঁইয়া ছুইয়া চলিয়াছেন। বর্ষা-বাদলে একেলা অন্ধকারে এখন পর্যন্তও রূপ-কথার রাজ্যই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়, কালিদাসের জগৎ এখনও কবিচিত্তকে গভীর ভাবে অধিকার করিতে পারে নাই (দ্রঃ- 'উপকথা')। কিন্তু কালিদাসের কবি-মানসের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের গভীর মিলের আভাস এখানেই ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। রোম্যান্টিক মনের একটা প্রধান ধর্ম এই, এ-মন বাহিরে যাহা কিছু দেখে—যাহা কিছু শোনে তাহাতেই তৃপ্ত হইতে পারে না—বহির্জগতের সকল রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শকে অবলম্বন করিয়া সে চলিয়া যায় তাহার অন্তর রাজ্যে ; এই অন্তর রাজ্যে বাসনায় বিধৃত

হইয়া আছে বিশ্ব-জীবনের যে রূপ-রস-মাধুর্য তাহার উদ্বোধের ফলেই বহির্জগতের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ একটা রহস্যালোকে মণ্ডিত হইয়া আস্বাদনীয়তা লাভ করে। 'অন্তরের মাধুরী'র দ্বারা যাহা কিছু সকলকে নূতন করিয়া এবং সরস করিয়া গড়িয়া তোলাই রোম্যান্টিক কবির কাজ। এই কথাটিরই আভাস দিয়াছেন কালিদাস শকুন্তলা-নাটকে রাজা দুষ্যন্তের মুখে। সেখানে বলা হইয়াছে—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি ॥

'রম্য দৃশ্য দেখিয়া অথবা মধুর শব্দ শুনিয়া যে সুখী প্রাণীর চিত্তও ব্যাকুল হইয়া ওঠে, তাহার কারণ, জীবগণ তখন বাসনায় ভাবরূপে স্থিরবদ্ধ জননান্তরের কোন সৌহার্দকেই অবোধপূর্বভাবে (অর্থাৎ চেতনার অজ্ঞাতেই) স্মরণ করে।' এই কথারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে—

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব জনমের স্মৃতি।
সহস্র হারাণ সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্ম-বিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুম কানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক।

কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।
(স্মৃতি, কড়ি ও কোমল)

ইহা কালিদাসেরই প্রতিধ্বনি কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, তবে ইহার ভিতর দিয়া কবি-মানসের যে সাধর্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সন্দেহাতীত।

'মানসীর যুগে রবীন্দ্র-কবিমানসের উপরে কালিদাস স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 'মানসী'তে তিনি যে শুধু মেঘদূত সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন তাহা নহে,—যেখানেই বাদলা-দিনের অন্ধকার কবির মনকে বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া অন্তর্মুখীন করিয়াছে সেখানেই তিনি অতীতের মায়াময় কাব্য-জীবনে ফিরিয়া গিয়াছেন। 'সুদূর বনান্ত হ'তে দক্ষিণ সমীর স্রোতে' কুহুধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া যখন কবি-চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে তখন কবির মনে পড়িয়াছে—

প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশ-লব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে,
ঘন সহকার-শাখে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।

লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্ত সনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,
তখনো সে কুহু-ভাষা রমণীর ভালবাসা
ক'রেছিলো সুমধুরতর।

(কুহুধ্বনি, মানসী)

আবার—

বৃষ্টি-ঘেরা চারিধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ, আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।

(পত্র, মানসী)

এই কবিতাগুলি লক্ষ্য করিলে একটা কথা চোখে পড়ে, একটা গভীর চিত্ত-বিলোড়নের ভিতর দিয়া কবির মন যখনই অন্তর্মুখীন হইয়াছে তখনই মানব-জীবনের অতীত রূপের সহিত বর্তমান রূপের ঐক্য তাঁহার চোখে পড়িয়াছে। বিরহ-মিলন স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে সকল দেশ-কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মানুষের চিত্তে একটা গভীর যোগ রহিয়াছে, সেই যোগেই আমরা এক হইয়া যাই। এ-কথাটি অতি সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছে 'মানসী'র 'একাল ও সেকাল' কবিতাটির ভিতরে।

বর্ষা এলায়েছে তা'র মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার
পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে॥

সেদিনো এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া।
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িৎ চকিতদৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া।

... ...

চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কা'রা,
ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরাণে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্ন-শিথিল বেশ;
সেদিনো এমনিতর অন্ধকার দিন।

আজও যে কালিদাসের যুগের—বৈষ্ণব কবিদের যুগের বিরহিণীরা আসিয়া কবির মনের চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছে তাহার কারণ—

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এবং 'এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।'

'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতার ভিতরেও এই কালের যোগ এবং কবি-ধর্মের যোগ প্রকাশ পাইয়াছে। বিরহ-বেদনার ভিতরে মানব-চিত্তের যে সর্বজনীনতা রহিয়াছে তাহা সর্বজনীন বলিয়াই সর্বকালিক। কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মেঘমন্দ্রস্বরে সেদিন বিশ্বের বিরহীর বেদনাই 'সঘন সঙ্গীতের মাঝে পুঞ্জীভূত' হইয়া উঠিয়াছিল। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নবীন মেঘের ঘনঘটায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সেদিন যেন 'জগতের যতেক প্রবাসী জোড় হস্তে মেঘপানে শূন্যে মাথা' তুলিয়া সমস্বরে বিরহের গাথা গাহিয়াছিল—সুদূরপ্রান্তে গৃহকোণে ভূতল-শয়না মুক্তকেশা তাহাদের বিরহিণী প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া। সেই সকল বিরহি-বিরহিণীর বাণীকে একটি সঙ্গীতে বাঁধিয়া লইয়া কালিদাস দেশদেশান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছেন; যুগযুগান্তের প্রবাহ বহিয়া সে সঙ্গীত আজিও আমাদের হৃদয়ের তটে আসিয়া আঘাত করিতেছে, যুগে যুগে নিত্য নূতন প্রতিধ্বনি সেই সঙ্গীতকে যেন নিরন্তর স্ফীত করিয়া তুলিতেছে।

সেদিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব-বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের 'পরে, করি' বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা; করিয়া বিস্তার
নবঘন স্নিগ্ধচ্ছায়া; করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের,—

সেই একদিন বহুপূর্বে উজ্জয়িনীর কবির নিকট নববর্ষা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল।

সেদিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে
কী না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরু গুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
একদিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝ'রে পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি।

আর আজ—

ভারতের পূর্বশেষে
আমি ব'সে আজি; যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে

দেখেছিলা দিগন্তের তমাল-বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

সুতরাং স্বভাবতই কালিদাসের সুর মেঘদূতের ভিতর দিয়া আসিয়া পৌঁছায় উনবিংশ শতাব্দীর কবির কানে ও প্রাণে—সেই সুরকে অবলম্বন করিয়া কবির মন ঘুরিয়া বেড়ায় কালিদাসের যুগের সেই প্রথমবর্ষায় সচকিত স্বপ্নমোহভরা জীবনের বিচিত্র লীলার ভিতরে।

বর্ষার কবিতার ভিতরে রবীন্দ্রনাথ এই কালের যোগটা অনুভব করিয়াছিলেন অতি নিবিড় ভাবে—শুধু কালিদাসের সঙ্গে নয় বৈষ্ণব-কবিদের সঙ্গেও। 'শ্যামলী'র স্বপ্ন' কবিতাটির ভিতরে দেখি, ঘন অন্ধকার রাত্রে বাদলের হাওয়া যখন এলোমেলো ঝাপটা দিতেছে চারিদিকে,—যখন মেঘ ডাকিতেছে গুরু গুরু—যখন—

থর্ থর্ করছে দরজা,
খড়্ খড়্ ক'রে উঠছে জানালাগুলো।
বাইরে চেয়ে দেখি
সার-বাঁধা সুপুরি নারকেলের গাছ
অস্থির হয়ে দিচ্ছে মাথা ঝাঁকানি।

দুলে' উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে
অন্ধকারের পিণ্ডগুলো
দল পাকানো প্রেতের মতো।

তখন—

মনে পড়েছে ঐ পদটা—
"রজনী সাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
······স্বপন দেখিনু হেনকালে।"
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়িধরা তার মন,
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল পরা,
ঘাটের থেকে নীলসাড়ি
"নিঙাড়ি নিঙাড়ি"-চলা।
আজ এই ঝোড়ো রাতে
তাকে মনে আনতে চাই
তার সকালে তার সাঁঝে,
তার ভাষায়, তার ভাবনায়
তার চোখের চাহনিতে,
তিন-শো বছর আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে।

••• ••• •••

শ্রাবণের রাত্রে এমনি ক'রেই বয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

'সোনার তরী'তেও দেখিতে পাই, যেদিন চারিদিকে অবিরল ঝরঝর বৃষ্টি জল এক প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র একখানি ঘরকে সমুদয় বহির্বিশ্ব হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দেয় তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সেই নিজের ঘরে অর্থাৎ সম্পূর্ণ তাঁহার নিজের জগতে নিজেকে টানিয়া লইয়া কালিদাস, জয়দেব, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সকল কবির সহিত এক হইয়া যান, কারণ বাহিরের বিশ্বে তাঁহারা দেশ-কালের দ্বারা যতই পৃথক থাকুন না কেন বাদলা দিনের নির্জন অন্তর-মন্দিরে বিরহখিন্ন তাঁহারা সকলেই এক।—

চারিদিকে অবিরল ঝর ঝর বৃষ্টিজল
এই ছোট প্রান্ত ঘরটিরে
দেয় নির্বাসিত করি— দশদিক অপহরি,—
সমুদয় বিশ্বের বাহিরে।
বসে বসে সঙ্গীহীন ভালোলাগে কিছুদিন
পড়িবারে মেঘদূত কথা ;—
—বাহিরে দিবসরাতি বায়ু করে মাতামাতি
বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা ;—
বহু পূর্ব আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন ভারতের
নগ-নদী-নগরী বাহিয়া

কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম
দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া।
ভালো করে দোঁহে চিনি, বিরহী ও বিরহিণী
জগতের দু'পারে দুজন,
প্রাণে প্রাণে পড়ে টান, মাঝে মহা ব্যবধান,
মনে মনে কল্পনা সৃজন।
যক্ষবধূ গৃহকোণে ফুল নিয়ে দিন গণে
দেখে শুনে ফিরে আসি চলি।
বর্ষা আসে ঘনরোলে, যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলী।

(বর্ষা যাপন, সোনারতরী)

'মেঘদূত,' 'ঋতু-সংহার' প্রভৃতি কাব্যের ভিতর দিয়া বর্ষাঋতু সম্বন্ধে কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে একটা ঐকাত্ম্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ষড়্-ঋতুর প্রত্যেক পরিবর্তনই কবি-চিত্তে স্পন্দন তুলিলেও রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা ঋতুর একটা পৃথক্ আবেদন ছিল। কালিদাস বলিয়াছেন, 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনো ঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ'; এই কথাটি রবীন্দ্রনাথের কবিমনেরও একটা মূল কথা।

বর্ষার মেঘে ঘনাইয়া-আসা অন্ধকার—অবিরল ধারাপতনের একটানা সুর—বহির্বিশ্বের সকল রূপ—সকল শব্দকে যেন একটা গভীর যবনিকার অন্তরালে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, মন কেবলই ফিরিয়া আসে অন্তর রাজ্যের কল্পলোকে। সেই কল্পলোকে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ যখন বর্ষার সঙ্গীত রচনা করিতে গিয়াছেন তখন রবীন্দ্রনাথ শুধু

রবীন্দ্রনাথ নহেন—সেখানে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া দিয়াছেন বর্ষার কবি কালিদাস—বর্ষার কবি জয়দেব এবং বাঙলার অন্যান্য বর্ষার কবি—বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব-কবিগণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-কথা স্পষ্টভাবে এবং অকুণ্ঠিতচিত্তেই স্বীকার করিয়াছেন। যেদিন—

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা,
গীতিময় তরুলতিকা।

সেদিন—

শতেক যুগের কবিদলে মিলি' আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা॥

(বর্ষামঙ্গল, কল্পনা)

বস্তুতঃ আমরা এই 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটিকে যদি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব, এখানে কালিদাস এবং বাঙলার বৈষ্ণব-কবিগণ কি করিয়া রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সুরের ঐক্যতান তুলিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ কোথায়ও ঢাকা পড়ে নাই—সুর কোথায়ও ম্লান হইয়া যায় নাই,—কালিদাস ও বৈষ্ণব-কবিগণ নেপথ্যে অবস্থান করিয়া বিচিত্র নেপথ্য-সঙ্গীত রচনা করিতেছেন—সেই নেপথ্য-সঙ্গীতের উপরে রবীন্দ্রনাথের সুর বিচিত্র ঔজ্জ্বল্য এবং গম্ভীর মহিমা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতিমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা॥

বর্ষার সমাগমে 'তরুণী পথিক-ললনা' আমাদিগকে কালিদাসের

ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
(মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ৮)

প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। এখানে আছে 'জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না'; কালিদাস বলিয়াছেন—

... ... ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
(ঐ-১৬)

'তড়িৎ-চকিত-নয়না' কথাটি মনে করাইতে পারে কালিদাসের 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈঃ' (ঐ-২৭)। 'মালতিমালিনী' প্রভৃতি 'প্রিয়-পরিচারিকা'গণ নিশ্চয়ই কালিদাসকে স্মরণ করাইবে এবং বর্ষার 'অভিসারিকা'গণ সংস্কৃত-কবিগণের সহিত বৈষ্ণব-কবিগণকেও স্মরণ করাইয়া দিবে। 'ঋতু-সংহারে' আছে—

তড়িৎপ্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ
প্রয়ান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

'ঘনবনতলে' জয়দেবের 'বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ' প্রভৃতি স্মরণ করাইতে পারে। 'এস ঘননীলবসনা'র সহিত জয়দেবের অভিসারকালে 'শীলয় নীলনিচোলম্' স্মরণ করুন। 'ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা'র সহিত তুলনা করুন কালিদাসের 'পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাঃ' অভিসারিকাগণের (পূর্বমেঘ ৩৫) কথা! বর্ষাগমে 'আনো বীণা মনোহারিকা'র সহিত কালিদাসের 'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং' (উত্তর মেঘ—২৫) প্রভৃতির তুলনা করুন। ইহার পরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ-পাতায় নবগীত করো রচনা,
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী ॥

প্রথমতঃ 'আনো মৃদঙ্গ' প্রভৃতির সহিত 'মেঘদূতে'র 'সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ' 'ললিতবনিতাঃ' প্রাসাদগুলির স্মরণ করুণ। বর্ষা-সমাগমে 'নব অনুরাগিণী' এবং 'প্রিয়সুখভাগিনী'গণকে আবাহন জানান ব্যাপারেও সংস্কৃত-কবি, বৈষ্ণব-কবি এবং রবীন্দ্রনাথের ভিতরে ঐকমত্য দেখা যাইতেছে। 'কুঞ্জকুটীরে ভাবাকুললোচনা'র

প্রেমের নবগীত রচনার কথা শকুন্তলা-নাটকের তৃতীয় অঙ্ক স্মরণ করাইতে পারে ; অবশ্য শকুন্তলা গান রচনা করিয়াছিল 'শুকোদর-সুকুমার-নলিনীপত্রে' ; ভূর্জপাতায় প্রেমগীত রচনা 'কুমার-সম্ভবে'র—

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র
ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ। (১।৭)

প্রভৃতি স্মরণ করাইতে পারে। আর 'মেঘ-মল্লার রাগিণী'তে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন সঙ্গীতকারগণের সহিতই 'সঙ্গত' করিয়াছেন সে কথার বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তারপরে দেখিতে পাই—

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দু'টি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত নয়নে।
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে॥

'কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী' প্রভৃতির সহিত স্মরণ করুন—'পুষ্পাবতংস-সুরভীকৃত-কেশপাশাঃ' (ঋতুসংহার), 'জনিত-রুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজোভিঃ' (ঐ), 'মালাঃ কদম্ব-নব-কেশর-কেতকীভিরাযোজিতাঃ শিরসি বিভ্রতি যোষিতোঽদ্যঃ' প্রভৃতি। 'তালে তালে দু'টি কঙ্কণ কনকনিয়া' প্রভৃতির সহিত তুলনীয়—

তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ॥ (উত্তরমেঘ ১৮)

আরও—

'কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো' ইত্যাদি। (উত্তরমেঘ ৩)

তারপরে—

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল আলস আবেশে।
শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী,
কোথা তোরা পুরকামিনী।
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী।
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী॥

ইহার সহিত তুলনা করুন 'মেঘদূতে'র—

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥ (পূর্বমেঘ, ৩৭)

তারপরে—

যূথী-পরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরী তমাল কুঞ্জ তিমিরে,
জাগো সহচরী আজিকার নিশি ভুলোনা,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা॥

ইহা পদে পদেই আমাদিগকে বৈষ্ণব-কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

আমরা প্রায় সমস্ত কবিতাটিই উদ্ধৃত করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম—বর্ষা-বর্ণনায় অতীত কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ দেখাইবার জন্য। কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে মিল এখানে আমরা দেখিলাম এ-বিষয়ে অনুরূপ মিল আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি বাল্মীকি ও কালিদাসের ভিতরে, আবার প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বর্ষা-বর্ণনায় কবিগুরু বাল্মীকিও যে বৈদিক কবিগণের সাহিত্য হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই এমন নহে। কাব্যের ক্ষেত্রে অনুকরণে ও স্বীকরণে যে পার্থক্য কতখানি এই কবিতাটি হইতে এ কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এখানে কালিদাস এবং বৈষ্ণব-কবিদের নিকট হইতে কত গ্রহণ করিয়াছেন!—আবার সেই পুরাতনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যাহা দিয়াছেন তাহাকে 'অপূর্ব' বলিতেও কোন বাধা দেখিতেছি না। প্রাচীনদের ভাবের টুকরাগুলি কবির মনে গিয়া নূতন করিয়া দানা বাঁধিয়াছে—নূতন সঙ্গীত আসিয়াছে—প্রকাশ-ভঙ্গি আসিয়াছে—সমস্ত জুড়িয়া পাইয়াছি একটা নূতন আস্বাদ; এবং সেই নূতন আস্বাদেই সমস্ত কবিতাটির সার্থকতা। পরবর্তী কালের 'ক্ষণিকা'র 'নববর্ষা' কবিতাটি আলোচনা করিলেও দেখিতে পাইব তাহার পশ্চাতেও একটি অস্পষ্ট অতীতের পটভূমিকা রহিয়াছে।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল রোম্যান্টিক কবিরই একটা গভীর অতীত-প্রীতি রহিয়াছে। তাহার কারণ এই, রোম্যান্টিক কবি বাহিরের জগৎটাকে চান না, চান তাঁহার মানস-জগৎকে। যে জীবনটা বর্তমানের সেটা এত কাছের এবং এত স্পষ্ট যে তাহার বাহিরের রূপটাকে সব সময় ইচ্ছা করিলেও অস্বীকার করিতে পারি

না ; তাহার সকল কুশ্রীতা, দৈন্য এবং অসম্পূর্ণতা চিত্তকে অনভিপ্রেতভাবে আসিয়া পীড়িত করে। কিন্তু যে-জীবন সুদূর অতীতের সে অনেক দূরের বলিয়া তাহার বাহিরের রূপটা আপনা হইতেই অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—তাই তাহাকে অবলম্বন করিয়া কল্পনায় কল্পলোক রচনা করিতে অসুবিধা হয় না। যাহা অনাগত তাহাও রহিয়াছে দূরে—ভবিষ্যের অন্ধকারে অস্পষ্ট রহিয়াছে তাহারও রূপ—তাই তাহাদ্বারাও রচনা করা যাইতে পারে আদর্শ কল্পলোক। রোম্যান্টিক কবিগণ তাই বর্তমান জীবন সম্বন্ধে একটা চিত্তের বৈরূপ্য বা ঔদাসীন্য লইয়া হয় ফিরিয়া চলিয়া যান অতীতের অস্পষ্ট লোকে অথবা তৃপ্তি খোঁজেন ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ আশার ভিতরে। রবীন্দ্রনাথ যে-যুগে যে-দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে-যুগ এবং সে-দেশ সম্বন্ধে তাহাকে স্বীকার করিতেই হইয়াছে,—

বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সন্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।

কিন্তু কালিদাসের যুগটির উপরে কল্পনার তূলিকার সাহায্যে যত ইচ্ছা রঙ্ বুলান যাইতে পারে। কালিদাস যে-যুগে যে-দেশে জন্মিয়াছিলেন সেই দেশে সেই যুগেও নিশ্চয়ই দুঃখ ছিল, দারিদ্র্য ছিল,—অবিচার ছিল, অত্যাচার ছিল—কুশ্রীতা ছিল, অপমান ছিল ; কিন্তু পারিপার্শ্বিক জীবনের রূঢ় বাস্তব রূপটি হয়ত কবিচিত্তকে পীড়িত করিয়াছে—অতএব তিনি কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া লইলেন হিমালয়ের কৈলাস শিখরের উৎসঙ্গে অবস্থিত একটি অলকা নগরী, যেখানে—

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।

চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥
যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পাঃ
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥
আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈ র্নিমিত্তৈঃ
নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রযোগোপপত্তিঃ
বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥

(মেঘদূত, উত্তরমেঘ ২-৪)

"রমণীগণের হস্তে লীলাকমল, অলকে কুন্দকলির মালিকা, লোধ্র ফুলের রেণুর দ্বারা আননশ্রী পাণ্ডুতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কেশচূড়াপাশে নবকুরবক, কর্ণে মনোহর শিরীষফুল,—আর সীমন্তে বর্ষাগমজাত কদম্ব ফুল।"

"যেখানে গাছগুলিতে নিত্য ফুল ফোটে এবং (সেই কারণেই) ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখর; হংসশ্রেণী দ্বারা রচিত হইয়াছে কাঞ্চি যাহাদের এমন সরোবরগুলিতে নিত্যই পদ্ম ফুটিয়া থাকে; কেকারবের জন্য উৎকণ্ঠিত ভবনশিখীগুলির কলাপ নিত্য-প্রকাশমান, রাত্রিগুলিতে নিত্য জ্যোৎস্না—তাই অন্ধকার প্রতিহত।"

"যেখানে আনন্দোত্থিত নয়ন-সলিল ব্যতীত অন্যকারণে অশ্রু নাই; যে তাপ পুষ্পধনু মদন হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রিয়মিলনে আবার প্রতিনিবৃত্ত হয় সে তাপ ছাড়া অন্য তাপ নাই, প্রণয়-কলহ ব্যতীত

অন্য কোন কারণে বিরহের উৎপত্তি নাই, যৌবন ছাড়া আর কোনও বয়স নাই।”

এইরূপ শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিয়া কালিদাস যে অলকাপুরীর বর্ণনা করিলেন তাহার কোথায়ও কোনও অপূর্ণতা নাই, কল্পনার দানে সে শুধু প্রেম-সুখ-সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ ধাম। কালিদাস উজ্জয়িনীতে বসিয়া তাঁহার এই স্বপ্নের অলকাপুরীকে যেমন করিয়া আস্বাদ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনই করিয়াই আবার কালিদাসের যুগটিকে আস্বাদ করিয়াছেন। কালিদাসের যুগটি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল একটি স্বপ্নলোক, যে-লোকে দুঃখ ছিল না দারিদ্র্য ছিল না—জীবন সংগ্রামের কোন কঠোরতা ছিল না—ছিল শুধু সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ। এই জন্যই কালিদাসের যুগের প্রতি এবং কালিদাসবর্ণিত যুগের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আর অনুরক্তির সীমা নাই। ‘প্রাচীন’ সাহিত্যের ভিতরে ‘মেঘদূত’ সম্বন্ধে আলোচনার ভিতরে এই অসীম অনুরক্তিই কত ব্যাকুলতা লইয়া দেখা দিয়াছে। কবি সেখানে বলিয়াছেন,—

“রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্যদিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের জন্য আমরা নির্বাসিত হইয়াছি। সেই যেখানকার উপবনে কেতকীর বেড়া ছিল, এবং বর্ষার প্রাক্কালে গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভুক্ পাখিরা নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং গ্রামের প্রান্তে জম্বুবনে ফল পাকিয়া মেঘের মতো কালো হইয়াছিল, সেই দশার্ণ কোথায় গেল! আর সেই যে অবন্তীতে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন

এবং বাসবদত্তার গল্প বলিত, তাহারাই বা কোথায়? আর সেই সিপ্রাতটবর্তিনী উজ্জয়িনী! অবশ্য তাহার বিপুলা শ্রী, বহুল ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের মন ভারাক্রান্ত নহে—আমরা কেবল সেই যে হর্ম্যবাতায়ন হইতে পুরবধূদিগের কেশ-সংস্কারধূপ উড়িয়া আসিতেছিল, তাহারই একটু গন্ধ পাইতেছি এবং অন্ধকার রাত্রে যখন ভবন শিখরের উপরে পারাবতগুলি ঘুমাইয়া থাকিত, তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং প্রকাণ্ড সুষুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি, এবং সেই রুদ্ধদ্বার সুপ্তসৌধ রাজধানীর নির্জন পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিত হৃদয়ে ব্যাকুল চরণক্ষেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে, তাহারই একটুখানি ছায়ার মতো দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে, তাহার পায়ের কাছে নিকষে কনক-রেখার মতো যদি অমনি একটুখানি আলো করিতে পারা যায়।”

এতখানি অতীত-প্রীতির সহিত অতি স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে একটা বর্তমানের প্রতি অবজ্ঞা,—ফলে অতীতের কালিদাসের যুগের যাহা কিছু সকলই দেখা দিয়াছে একটা ‘শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা’ লইয়া; আর তুলনায় বর্তমান কাল অনেক নীচে নামিয়া যাইতেছে তাহার ‘ইতরতা’ লইয়া।—

“আবার সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদীগিরি নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাস, দেবগিরি, রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটা শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, তাহার ভাষা ব্যবহার মনোবৃত্তির যেন জীর্ণতা এবং

অপভ্রংশতা ঘটিয়াছে। এখনকার নামকরণও সেই অনুযায়ী। মনে হয়, ঐ রেবা, সিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলী হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।"

'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতার ভিতরেও কালিদাস রচিত একটি কল্প-লোকের মোহ রবীন্দ্রনাথের গৃহত্যাগী উদাসী মনকে শুধু সুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে; মুক্তগতি-মেঘপৃষ্ঠে কবির মনও শুধু মন্থর গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহিতেছে সেই স্বপ্নরাজ্যে।—

কোথা আছে
সানুমান্ আম্রকূট, কোথা রহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি বেত্রবতীকূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম র'য়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা;
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে'
বনস্পতি। না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বরাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি' হ'তেছে বিকল;
ভ্রূ-বিলাস শেখে নাই কা'রা সেই নারী
জনপদ-বধূজন গগনে নেহারি'

ঘনঘটা, ঊর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ;—

এ-কথা রবীন্দ্রনাথের বহুবার মনে হইয়াছে, তিনিই যেন যুগান্তের পারে নির্বাসিত কবি কালিদাস—স্বপ্নে আজিও তাই তিনি আধুনিক কাল হইতে তাঁহার সেই পূর্বজন্মের জীবনে ফিরিয়া যান সেই প্রথম প্রিয়ার সন্ধান করিতে। স্বপ্নে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়—কিন্তু শুধু সকরুণ আঁখিতে উভয়েরই নীরব ভাষা, কারণ 'সে ভাষা ভুলিয়া গেছি', কালিদাসরূপে তাঁহার প্রিয়াকে যে ভাষায় তিনি প্রেম-সম্ভাষণ জানাইতেন এই ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে সে ভাষা আর তাঁহার জানা নাই, আর সে ভাষায় সম্ভাষণ না জানাইতে পারিলে স্বপ্ন-পুরীর সে প্রিয়ার সহিত যেন কথা বলাই চলে না।

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলা-পদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দ কলি, কুরুবক মাথে,
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেচিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে॥

মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীরমন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্যপরে সন্ধ্যারশ্মি রেখা।
প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সঙ্কীর্ণপথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি' দম্ভভরে॥ (স্বপ্ন, কল্পনা)

কখনো কবি মনে মনে কল্পনা করিয়াছেন, তিনি যদি কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে কি হইত। তিনি তখন কালিদাসের যুগটিকে ঘিরিয়া, কালিদাসের কাব্যেবর্ণিত—বিশেষ করিয়া মেঘদূত এবং শকুন্তলায় বর্ণিত জীবনযাত্রা ঘিরিয়া কত মোহময় কল্পনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কালিদাসের সেই যুগ—সেই জীবন—তাহাকে এমন করিয়া ভাবিতেও সুখ। উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কাননঘেরা একটি বাড়িতে মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে সংঘাত-আবর্তহীন মন্থর ধারায় কবির জীবনতরী বহিয়া যাইত। তখন—

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি, থাক্‌ত নাকো ত্বরা,
মৃদুপদে যেতেম, যেন নাইক মৃত্যুজরা।
ছ'টা ঋতু পূর্ণ ক'রে
ঘটত মিলন স্তরে স্তরে,
ছ'টা সর্গে বার্তা তাহার রৈত কাব্যে গাঁথা।

বিরহ-দুখ দীর্ঘ হ'ত,
তপ্ত অশ্রু নদীর মতো,
মন্দগতি চলত রচি' দীর্ঘ করুণ গাথা।
আষাঢ় মাসে মেঘের মতন মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকত নাক একটুমাত্র ত্বরা॥
(সেকাল, ক্ষণিকা)

এই দ্বন্দ্ববিহীন অনাবিল লঘুমন্থর জীবনের চারিপাশে—

অশোক কুঞ্জ উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হ'ত ফুল্ল, প্রিয়ার মুখের মদিরাতে।
প্রিয় সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি' করিত রব,
রেবার কূলে কলহংস-কলধ্বনির মতো।
কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোন নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী ঝঙ্কারিত কত।
আস্‌ত তারা কুঞ্জবনে চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক শাখা উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে॥

কুরবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রৈত হাতে কী জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে,
শিরীষ পর্‌ত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নব-নীপের মালা।

ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে॥

(সেকাল, ক্ষণিকা)

এই কবিতার শেষের দিকে কবি অবশ্য বর্তমান যুগকে লইয়াই সান্ত্বনা লাভ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু কবিতাটির প্রথম অংশের সহিত শেষ অংশের তুলনা করিলে দেখিতে পাইব কবির এই সান্ত্বনা কত লঘু এবং দুর্বল। যে সকল আধুনিক বিনোদিনী বেণী দোলাইয়া চলেন তাঁহাদের পানে তাকাইয়া কবি যতই সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা করুন, তাঁহার মন পড়িয়া রহিয়াছে মালবিকার দিকে—

কোন্ বসন্ত-মহোৎসবে বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরালে
কোন্ ফাগুনের শুক্ল নিশায়
যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম রাজার চিত্রশালে।

রবীন্দ্রাথের কল্পনায় কালিদাস শুধু কবি—তিনি ছিলেন চিরানন্দময় অলকার অধিবাসী।—

আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি' উমাপতি ভূমানন্দ ভরে

নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেইক্ষণে
গাহিতে বন্দনা-গান—গীতি সমাপনে
কর্ণ হ'তে বর্হ খুলি' স্নেহহাস্য ভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়াপরে॥ (কালিদাস, চৈঃ)

এই হরগৌরীর সহিতও কালিদাসের যেন একটি সুকুমার ঘনিষ্ঠতা ছিল; হর-গৌরীর প্রেম-গীতি রচনা করিয়া কবি নিজেই দেবদম্পতিকে তাহা শুনাইয়া আসিতেন—প্রমথগণ তখন চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। তখন—

শিখরের পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যা-মেঘস্তর,
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি' পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত-গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে, যবে অবশেষে
ব্যাকুল সরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে॥

(কুমারসম্ভব গান, ঐ)

আমরা পূর্বেই (প্রথম ভাগে) কালিদাসের 'ঋতু-সংহার' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, কালিদাসের নিকটে ছয়টি ঋতু যেন শুধু ভোগের উপকরণ লইয়া আসিয়া দেখা দিত,—কালিদাস যেন যৌবরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট রূপে শুধু নিরলস ভোগ-বিলাসের বাসনায় উন্মুখ থাকিতেন। কালিদাসের সেই যৌবরাজ্যের সম্রাট রূপটি অঙ্কিত করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ 'ঋতু-সংহার' কবিতাটিতে।—

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য সিংহাসন 'পরে।
মরকত পাদপীঠ বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণ রাজছত্র ঊর্ধ্বে ক'রেছে ধারণ
শুধু তোমাদের পরে। ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি',
নব নব পাত্র ভরি' ঢালি দেয় তা'রা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে। ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসর ভবন।
নাই দুঃখ নাই দৈন্য নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী॥ (চৈতালি)

শুধু প্রেমের দিক হইতে, নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিন্ত ভোগ-সম্ভাবনার দিক হইতেই নয়, খুঁটি-নাটি সমস্ত দিক হইতেই কালিদাসের যুগটা বর্তমান যুগ হইতে মধুর এবং শ্রেষ্ঠ মনে হইত। কালিদাসের যুগে

কাব্য রচিত হইলে মালবিকার দলকে কবি সেগুলি পড়িয়া শুনাইতেন,—প্রাপ্তি ছিল মালবিকাগণের স্বহস্তে পরাইয়া দেওয়া 'বেল ফুলের মালা'। আধুনিক মালবিকাগণের সঙ্গে কবির সেরূপ কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাঁহারা ছাপার বই কিনিয়া পড়ে—আর 'দোকানে পাঁচসিকে দিয়েই খালাস'। কিন্তু—

উপায় নেই,
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটল-ডাঙার অম্নিবাস্-এ চড়ে।
মন বলচে নিঃশ্বাস ফেলে—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য—
আর আমি যদি হতেম—কী হবে বলে।
জন্মেচি ছাপার কালিদাস হয়ে।

(পত্র, পুনশ্চ)

আজকার দিনের যাহা রমণীয়, যাহা চিত্তকে মুগ্ধ করে তাহাকেও কবি আজকার দিনের কিছু বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই,—তাহার রমণীয়তাকেও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কালিদাসের যুগের জিনিস বলিয়া। তাই আজকার দিনের 'পুষ্পচয়িনী' দেখিয়া তিনি যেখানে সত্যই মুগ্ধ হইয়াছেন সেখানে তিনি তাহাকে চিরন্তনের 'পুষ্পচয়িনী' করিয়া কালিদাসের যুগের 'পুষ্পলাবী' রমণীগণের সহিত যুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাই কবি এ-যুগের 'পুষ্পচয়িনী'কে প্রশ্ন করিয়াছেন,—

হে পুষ্পচয়িনী,
ছেড়ে আসিয়াছ তুমি কবে উজ্জয়িনী
মালিনী ছন্দের বন্ধটুটে'।

... ...

তুমি আজ
করেছ যে অঙ্গসাজ
নহে সদ্য আজিকার।
কালোয় রাঙায় তার
যে ভঙ্গীটি পেয়েছে প্রকাশ
দেয় বহুদূরের আভাস।
মনে হয় যেন অজানিতে
রয়েছ অতীতে।
মনে হয় যে প্রিয়ের লাগি
অবন্তী নগর-সৌধে ছিলে জাগি'
তাহারি উদ্দেশে,
না জেনে সেজেছ বুঝি সেযুগের বেশে।
মালতী শাখার 'পরে
এই যে তুলেছ হাত ভঙ্গীভরে
নহে ফুল তুলিবার প্রয়োজনে,
বুঝি আছে মনে
যুগ অন্তরাল হ'তে বিস্মৃত বল্লভ
লুকায়ে দেখিছে তব সুকোমল ও-কর-পল্লব।
(পুষ্পচয়িনী, বিচিত্রিতা)

সাধারণ কেরাণীর গৃহিণী চারুপ্রভাও যেদিন পাশের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুলে বেণী পাকাইয়া কাঁটা বিঁধায় সেদিনও কবি তাহার স্বামীকে দিয়া তাহাকে তাহার আটপৌরে 'চারু' নামে সম্ভাষিত করাইতে পারেন নাই ; সেখানেও দেখি—

আজ প্রথম আমার মনে হোলো
অল্প মজুরির দিন-চালানো
একটা মানুষের জন্যে
নিজেকে-ত সাজিয়ে তুলছে
আমাদের ঘরের পুরানো বউ
দিনে দিনে নতুন-দাম-দেওয়া রূপে।
এ তো নয় আমার আটপহুরে চারু।
ঠিক এমনি ক'রেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা
ভালোলাগার অপরূপবেশে
ভালোবাসার চকিত চোখে।
অমরুশতকের চৌপদীতে
—শিখরিণীতে হোক্ স্রগ্ধারায় হোক্—
ওকে ত ঠিক মানাত।
সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ঐ যে আসছে অভিসারিকা
ও যেন কাছের কালে আসছে
দূরের কালের বাণী।

(সম্ভাষণ, শ্যামলী)

আমরা উপরে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের অনেক কবিতা উদ্ধৃত

করিয়া রবীন্দ্রনাথের রোম্যাণ্টিক কবিধর্ম এবং তজ্জনিত অতীত স্মৃতি ও প্রীতির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। এই রোম্যাণ্টিক ধর্ম সম্বন্ধে কবি নিজেই সচেতন ছিলেন এবং নিজেই সে-কথাটার বহুপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। 'সানাই'র 'অনসূয়া' কবিতাটিতে কবি অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন,

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম রোম্যাণ্টিক
আমি সেই পথের পথিক
যে পথ দেখায়ে চলে দক্ষিণে বাতাসে,
পাখির ইশারা যায় যে পথের অলক্ষ্য আকাশে।
মৌমাছি যে পথ জানে--
মাধবীর অদৃশ্য আহ্বানে।
এটা সত্য কিংবা সত্য ওটা
মোর কাছে মিথ্যা সে তর্কটা।
আকাশকুসুম-কুঞ্জবনে,
দিগঙ্গনে
ভিত্তিহীন যে বাসা আমার
সেখানেই পলাতকা আসা-যাওয়া করে বার-বার।
আজি এই চৈত্রের খেয়ালে
মনেরে জড়াল ইন্দ্রজালে।
দেশকাল
ভুলে গেল তার বাঁধা তাল।
নায়িকা আসিল নেমে আকাশ-প্রদীপে আলো পেয়ে।

সেই মেয়ে
নহে বিংশ শতকিয়া
ছন্দোহারা কবিদের ব্যঙ্গ-হাসি-বিহসিত প্রিয়া।
সে নয় ইকনমিকস্-পরীক্ষাবাহিনী।
আতপ্ত বসন্তে আজি নিঃশ্বসিত যাহার কাহিনী।
অনসূয়া নাম তার, প্রাকৃত ভাষায়
কারে সে বিস্মৃত যুগে কাঁদায় হাসায়,
অশ্রুত হাসির ধ্বনি মিশায় সে কলকোলাহলে
শিপ্রাতটতলে।
পিনদ্ধ বল্কল-বন্ধে যৌবনের বন্দী দূত দোঁহে
জাগে অঙ্গে উদ্ধত বিদ্রোহে।
অযতনে এলায়িত রুক্ষ কেশপাশ
বনপথে মেলে চলে মৃদুমন্দ গন্ধের আভাস।
প্রিয়কে সে বলে "পিয়"
বাণী লোভনীয়,
এনে দেয় রোমাঞ্চ হরষ
কোমল সে ধ্বনির পরশ।

এই রোম্যান্টিক কবিধর্মের জন্যই দেখিতে পাই, কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই বেশী করিয়া দেখিয়াছেন জীবনের সেই অংশটা—যেটা সুন্দর, মোহময়, বরণীয়। কিন্তু জীবনের যে আরও একটা দিক্ পড়িয়া রহিয়াছে তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিকে তেমন বেশী আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

অতীত-প্রীতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই রোম্যান্টিক কবিধর্মের

আলোচনায় উল্লেখ করা যাইতে পারে কালিদাসের 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি কাব্যের সহিত আর একখানি কাব্য—তাহা বাণভট্টের 'কাদম্বরী'। এই 'কাদম্বরী'র ভিতরে বর্ণিত গভীর বনের নির্জন প্রান্তে মহাদেবের মন্দির এবং সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রেমপ্রতিমা মহাশ্বেতার অপূর্ব প্রেম-সাধনা শুধু রবীন্দ্রনাথের নহে, সকল কাব্যরসিকের চিত্তেই গভীর ভাবে দাগ কাটে। যে প্রদোষের আলো-আঁধারের ভিতরে কবি শিবমন্দিরে নির্জন প্রাঙ্গণে এই স্নিগ্ধস্নাতা শুভ্রবসনা প্রেম-তপস্বিনীকে বীণাযোগে সঙ্গীত-নিরতা রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা সকলেরই হৃদয় আকৃষ্ট করে। এখানকার এই দৃশ্যটির একটা আভাস রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা'র বহুস্থানে নির্জন শিবমন্দিরের বর্ণনায় ইহার আভাস আছে ; 'চিত্রা'র 'আবেদন' কবিতায় সংসারের ওপারে 'কাব্য লক্ষ্মী'র মন্দির বর্ণনায় আমরা ইহার আভাস লক্ষ্য করিয়াছি। 'কল্পনা'র 'স্পর্ধা' কবিতার ভিতরে, 'মহুয়া'র 'একাকী' কবিতায়, 'পরিশেষে'র 'জরতী'তে ইহার স্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে।

কিন্তু অন্য কবি এখানে সেখানে বিশেষ উপলক্ষ্যে দেখা দিয়াছেন, কালিদাস দেখা দিয়াছেন বিবিধ উপলক্ষ্যে! তিনি আসিয়াছেন রসিকতার ভিতরে—তিনি আসিয়াছেন ছোট্ট পাখীর প্রসঙ্গে—তিনি আসিয়াছেন বর্তমানের সহিত সকল দ্বন্দ্বে। আধুনিকাদের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতে গিয়াও কবি বলিয়াছেন—

> সেকালেও কালিদাস বররুচি-আদিরা,
> পুরসুন্দরীদের প্রশস্তিবাদীরা,

যাদের মহিমাগানে জাগালেন বীণারে,
তারাও সবাই ছিল অধুনার কিনারে।
(আধুনিকা, প্রহাসিনী)

আধুনিক 'নারী প্রগতি' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনা নেয়নি তো চিনে,
কেনেনি ইস্টিশনের টিকেট ;
হৃদয়ক্ষেত্রে খেলেনি ক্রিকেট্
চণ্ড বেগের ডাণ্ডাগোলায় ;
তারা তো মন্দ মধুর দোলায়
শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে
বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে।
(নারী প্রগতি, প্রহাসিনী)

'অনাদৃতা লেখনী' (প্রহাসিনী) যেই সম্ভাব্য পদ্য লিখিয়া পাঠাতে পারিত তাহার ভিতরেও উঁকি ঝুঁকি মারিয়াছেন কালিদাস।—

'স্বাধিকারে প্রমত্তা কি ছিলাম কোনদিন।'—ইত্যাদি ।

সে লেখনীটির নামও 'কালিদাসী', বোধহয় 'লেখনী' ঈ-কার যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া।

'অধীরা'র সঙ্গে কালিদাসের যুগের ধীরা নায়িকাগণের দ্বন্দ্বটুকু ফুটাইতে কবি বলিয়াছেন,—

করুণ ধৈর্য গণে না দিবস,
সহে না পলেক গৌণ ;
তাপসের তপ করে না মান্য,
ভাঙে সে মুনির মৌন।
মৃত্যুরে দেয় টিটকারী তার হাস্যে,
মঞ্জীরে বাজে যে ছন্দ তার লাস্যে,
নহে মন্দাক্রান্তা,
প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমল কান্তা।

(অধীরা, সানাই)

'রোগশয্যায়' বসিয়াও কবি চড়ুই পাখীকে বলিয়াছেন—

যখন প্রাতে দোয়েলরা দেয় শিস
কবির কাছে পায় তারা বক্‌শিশ,
সারা প্রহর একটানা এক পঞ্চম স্বর সাধি
লুকিয়ে কোকিল করে কী ওস্তাদি,
সকল পাখি ঠেলে
কালিদাসের বাহবা সেই পেলে।
তুমি কেয়ার কর না তার কিছু
মানে নাকো স্বরগ্রামের কোনো উঁচুনিচু।
কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে
ছন্দভাঙ্গা চেঁচামেচি
বাধাও কি কৌতুকে।

নবরত্ন সভায় কবি যখন করে গান
তুমি তারি থামের মাথায় কি কর সন্ধান।
কবিপ্রিয়ার তুমি প্রতিবেশী,
সারা মুখর প্রহর ধ'রে তোমার মেশামেশি। (৬নং)

কিন্তু 'এহো হয় আগে কহ আর'। পূর্বে আমরা যে-সকল আলোচনা করিলাম তাহার ভিতর দিয়া কালিদাসের সহিত নানাদিক হইতে রবীন্দ্রনাথের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তার সন্ধান পাওয়া যাইবে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উপরে কালিদাসের প্রভাব বিচার করিতে ইহাই যথেষ্ট নহে। সে প্রভাব আরও স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যেখানে কালিদাস আসিয়া রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভাবধারার ভিতরে নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যের ভিতরে বিশেষ করিয়া 'মেঘদূত' এবং 'কুমারসম্ভব' রবীন্দ্র-নাথের কবিমনে বিভিন্নযুগে বিভিন্ন প্রতিফলন লাভ করিয়াছে। আমরা গ্রন্থের প্রথমভাগের আরম্ভেই এ কথার আভাস দিয়া আসিয়াছি যে এই প্রতিফলনের ফলে যে কাব্য-সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ভিতরে প্রাচীনের দানকেও যেমন আমরা ছোট করিতে পারি না, বর্তমান কবির স্বকীয়তাকেও অস্বীকার করিতে পারি না। যৌথ সাধনার এইখানেই বৈশিষ্ট্য। এ-কথার আভাসও আমরা পূর্বেই দিয়া আসিয়াছি যে 'মেঘদূত' কাব্য রবীন্দ্রনাথের মানস-লোকে প্রবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার ভিতরে যে বিভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই অতীত 'মেঘদূতে'র পটভূমিকায় 'নব

মেঘদূত' এবং সত্যই 'অপূর্ব অদ্ভুত'! এ সব ক্ষেত্রে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, কালিদাসের কবি মনই সমানধর্মা রবীন্দ্রনাথের কবি-মনের ভিতরে আসিয়া যুগোপযোগী বিভিন্ন বিবর্তন লাভ করিয়াছে; আবার একথাও সত্য হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের কতগুলি নিজস্ব ভাবধারা রস-পরিপোষণের জন্য সায় খুঁজিয়া পাইয়াছে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্যে। এইজাতীয় প্রভাবের ভিতরে এই দুইটা সত্যই মিলিয়া আছে; অর্থাৎ কালিদাসও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা উদ্বোধিত এবং পরিপুষ্ট করিয়াছেন, আবার রবীন্দ্রনাথও কালিদাসের কাব্য-গুলির ভিতরে নিজের ভাবধারা আরোপিত করিয়া নূতন অর্থ-সঞ্চার করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে যে-কথা ছিল অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সম্প্রসারণের দ্বারা গভীর করিয়া তুলিয়াছেন; যে কথা ছিল না কালিদাসের কাব্যে তাহাকে কালিদাসের পরিবেষ্টনীর ভিতরেই নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। অথবা এ-কথাও বলা যাইতে পারে যে, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস তাঁহার মনের তারে যে সুর বাঁধিয়াছিলেন তাহা এত যুগের বায়ুকম্পনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের তারে নূতন নূতন ঝঙ্কার দিয়াছে। এ সুর অনেক খানিই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুর—কালিদাস শুধু অতীতের যবনিকার অন্তরাল হইতে নেপথ্য সঙ্গীত রচনা করিতেছেন; সেই নেপথ্য-সঙ্গীতের সহিত গভীর সঙ্গতিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের সুরও একটা নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে।

'মানসী'র ভিতরে রবীন্দ্রনাথ যে 'মেঘদূত' রচনা করিয়াছেন তাহার ভিতরেই অতীত নেপথ্য-সঙ্গীতের উপরে নূতন সুরের নূতন রাগিণী আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। কালিদাসের সৌন্দর্যপুরী

অলকার মধ্যস্থিতা বিরহিণী যক্ষবধূ নিতান্তই রক্তমাংসের প্রিয়া—সে বিরহিণী নারী মাত্র; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অলকা সৌন্দর্যের কল্প-লোক—আর সেখানকার বিরহিণী প্রিয়া কবির অশরীরী মানস প্রতিমা,—প্রেম-সৌন্দর্যের গভীর রহস্যালোকে সে কবির গহন ভাবলোকেই অবস্থান করিতেছে।

এই মতো মেঘরূপে ফিরি' দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি।.........
(অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবর-কূলে
মণিহর্ম্যে অসীম-সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা,
মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তা'রে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশি-রেখা
পূর্ব গগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হ'য়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক ; যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য মাঝে একাকী জাগিয়া।

আমাদের এই আটপৌরে ভাঙাচোরা সংসারের নেপথ্য-লোকে যে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্যলোক বিরাজ করিতেছে এবং সেখান হইতেই যে জীবনের সকল সৌন্দর্য-প্রেমের রহস্য উৎসারিত হইতেছে ইহা রবীন্দ্র-কাব্যের ভিতরে একটি মূল ভাব-বিশ্বাস। সেই অস্ফুট ভাব-বিশ্বাসই এখানে রূপায়ণ লাভ করিয়াছে কালিদাসের 'মেঘদূত'কে আশ্রয় করিয়া। কিন্তু এখানে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিলেন কালিদাসে তাহার অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। অলকাপুরীর এবং তন্মধ্যস্থিত বিরহিণী যক্ষবধূর কালিদাস যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার ভিতরকার একটি ব্যঞ্জনায় ভর করিয়া বাস্তবলোক হইতে ভাবলোকে উত্তরণ খুব সহজ এবং রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যঞ্জনাকেও অনেক দূর ছাড়াইয়া গেলেন; তাহার ফলে কালিদাস হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়া তিনি কালিদাসের কাব্য-মহিমার সাহায্য লইয়া সম্পূর্ণ 'নব মেঘদূত' রচনা করিয়াছেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে' এই 'মেঘদূতে'র আলোচনায় কবি বলিয়াছেন—

"কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই।"

এই প্রসঙ্গে কবি 'সর্বব্যাপী মনের' কথা আনিয়াছেন, বৈষ্ণবের আর্তি 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির' প্রভৃতির স্মরণ করিয়াছেন। দৃষ্টির অনেক দূরে অবস্থিত এই অসীম দয়িত এবং

তাহার সহিত 'গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান' মানুষের অতলস্পর্শ বিরহের কোন আভাসও কালিদাসের মধ্যে নাই। আমরা প্রথম ভাগে কালিদাসের 'মেঘদূত' আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি, 'মেঘদূতে'র কবি একান্ত রসিক সম্ভোগের বিলাসী কবি; 'মেঘদূতে' বিরহ একটা বিরহের বিলাস মাত্র—সে সম্ভোগকেই বিচিত্র এবং রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে; তাহার ভিতরে এই অধ্যাত্ম বিশ্বাসের ব্যঞ্জনামাত্রও কোথায়ও নাই—কবি এখানে ভাবব্যঞ্জনার সম্প্রসারণের ফলে কালিদাস হইতে দূরে সরিয়া নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

'চৈতালি'র 'মেঘদূত'-এ কবি বলিতেছেন, কবি কালিদাস যেদিন মিলনের মরীচিকার ভিতরে যৌবনের বিশ্বগ্রাসী অহমিকায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—যেদিন সম্ভোগের রঙ্গালয়ে আসীন তাঁহাকে ছয় ঋতু-সহচরী আসিয়া চামর-ছত্র দ্বারা সেবা করিত সেদিন কবি বহির্বিশ্ব হইতে একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন একটা উৎকট আত্মকেন্দ্রিকতায়; তারপরে দেবতার অভিশাপের মতন সেই সুখরাজ্যে বিচ্ছেদের শিখা নামিয়া আসিল—সেই বিরহের ভিতরে বিশ্বজগতের সহিত কবির অন্তরের মধুর যোগ স্থাপিত হইল—এবং সেই বিশ্বজগতের সহিত আন্তরিক যোগেই জাগিল 'মেঘদূতে'র বিরহ-গান—

> সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা
> আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।
> দেখা দিল চারিদিকে পর্বত কানন
> নগর নগরী গ্রাম। বিশ্বসভামাঝে
> তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে॥

ইহাও কালিদাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনা, এখানেও প্রচ্ছন্ন

রহিয়াছে আর একটি কথা—যে কথা রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য কবির সহিত এক কণ্ঠে তাঁহার বহু কবিতার ভিতরে বলিয়াছেন; সে কথাটি এই—প্রিয়মিলনে আমরা নিজেদের ভিতরে থাকি সঙ্কুচিত হইয়া—বিরহে চিত্তের ঘটে নিঃসীম প্রসার—সেই প্রসারিত চিত্তের ভিতর দিয়াই বিশ্বমানবের সহিত—তথা বিশ্বজগতের সহিত আমাদের গভীর যোগ। মিলনে আমরা চলি না—তখন বেষ্টনী পড়ে ছোট্ট একটি বাসকক্ষের চারিদিকে—সেই ক্ষুদ্র বেষ্টনীর ভিতরেও আমরা নিশ্চল; বিরহে ভাঙ্গিয়া যায় বেষ্টনী—সীমার বাহিরে তখন আমরা চলি—আমাদের প্রেম চলে। এই কথা কবি অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন 'পুনশ্চে'র 'বিচ্ছেদ' কবিতায়। যে কোন বর্ষার দিন 'মেঘদূতে'র দিন নয়; যে দিনটা চারিদিক হইতে অচলতায় বাঁধা—মেঘ চলে না, হাওয়া চলে না—টিপি টিপি বৃষ্টি ঘোমটার মতন পড়িয়া থাকে দিনের মুখের উপর, সেদিন 'মেঘদূতে'র দিন নয়।

যে দিন মেঘদূত লিখেচেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীলপাহাড়ের গায়ে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেচে মেঘ,
পূবে হাওয়া বয়েচে শ্যামজম্বু-বনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।
যক্ষ নারী বলে উঠেচে
মাগো, পাহাড়সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।
মেঘদূতে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল না তার পরে,
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েচে জয়ী।

(বিচ্ছেদ, পুনশ্চ)

এইটাই যেন মেঘদূতের বড় কথা। মিলনে প্রেম চলে না—তাই সে আনে আমাদের চিত্তের বন্ধন। মেঘদূতের দিনে বাহিরের সংসারটা একান্ত অস্থির ভাবে চলমান হইয়া ওঠে—সংসারের সেই চলমানতার সহিত যোগ দেয় আমাদের বিরহের চলা—ব্যথার ভারকে পরাজিত করে চলার মুক্তি।

সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝর্ণায়, উদ্বেল নদীস্রোতে,
মুখরিত বন-হিল্লোলে,
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেচে
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বাণী।

একদা যখন মিলনে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে,
বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়েছিল
নিভৃত বাসকক্ষের বাইরে।

যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরলো
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।
অবশেষে ব্যথার রূপ দেখা গেল
যে কৈলাসে যাত্রা হোলো শেষ। (ঐ)

যক্ষের প্রেম যতক্ষণ বিরহে চঞ্চল হইয়া মেঘের মতন চলিয়াছে, ততক্ষণ বেদনা নাই—সে প্রেম চলার আনন্দে উচ্ছল; কিন্তু বেদনা

দেখা দিল কৈলাসের অলকাপুরীর বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে—কারণ, অলকার নিরন্তর প্রতীক্ষমাণ প্রেম চলে না—। নিত্য পুষ্প, নিত্য জ্যোৎস্নার ভিতরেও সেখানে যক্ষবধূ নিত্যই একা—সে একান্ত বিরহিণী। যক্ষের প্রেম এখানে অপূর্ণ—যে অপূর্ণ সেই চলিয়াছে অভিসারিকার বেশে পূর্ণের দিকে নব নব আনন্দের পর্যায়ে ; কিন্তু যে পূর্ণ সে একা—সে পায় না পথ চলার আনন্দ—সে নিরন্তর অপেক্ষা করে শুধু 'দুই'এর জন্য।

যেখানে অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা।
অপূর্ণ যখন চলেচে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করচে স্থির হয়ে ;
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা, সেই তো একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে। (ঐ)

কিন্তু পূর্ণ যে সেও ত শুধু নিশ্চল বসিয়া নাই,—তাহার প্রতীক্ষার ভিতরেই আছে চলার আহ্বান—সে আহ্বান আগাইয়া আসে অপূর্ণের অভিসার পথে ; 'বিরহী অপূর্ণে'র চলা আর 'একাকী পূর্ণে'র আহ্বান এই দুইত মিলিয়া মিশিয়া এক সুরে এক তালে চলে সৃষ্টির ভিতরে। তাই—

ভুল বলা হ'ল বুঝি।
সেও ত নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,—
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলচে একই তালে।
তাই নদী চলেচে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে। (ঐ)

'শেষ-সপ্তকে'র আটত্রিশ সংখ্যক কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, একদিন যক্ষের প্রেম ছিল আপনার ভিতরেই বদ্ধ—যেমন গন্ধ থাকে পদ্মকুঁড়ির ভিতরে। সেদিন সঙ্কীর্ণ সংসারের একান্তে ছিল যক্ষের প্রেয়সী 'যুগলের নির্জন উৎসবে'; যক্ষ সেদিন তাহার সম্ভোগের আলিঙ্গনের ভিতরেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহার প্রিয়াকে, যেমন করিয়া চাঁদকে হারাইয়া ফেলে শ্রাবণের ঘন মেঘ আপনার আলিঙ্গনের আচ্ছাদনে। তারপরে—

এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে'।
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাঁপড়ি গুলি,
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।

বৃষ্টির জলে ভিজে' সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।

শুধু তাহাই নয়, মিলনের আশ্রয় যে প্রিয়া, সে ছিল শুধু রক্ত-মাংসের প্রিয়া; বিরহে যক্ষ হইয়াছে কবি, সে তাই নিজের 'অন্তর আঙিনায়' গড়িয়া তুলিয়াছে অপূর্ব মূর্তি—'স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী'। এই মানসপ্রতিমা নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী মানব-প্রতিমারই রসরূপ—সে আজ আসন পাইয়াছে 'অনন্তের আনন্দমন্দিরে'। 'শেষ-সপ্তকে'র পরিশিষ্টে যে কবিতাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড) তাহার ভিতরে 'যক্ষ' কবিতাটিতেও কবি ঠিক এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

'নবজাতকে'র 'সাড়ে ন'টা' কবিতাটির ভিতরে কবি 'মেঘদূত' কাব্যের কাব্যরূপের একটি চমৎকার পরিচয় দিয়াছেন। বহু দেশান্তরের গান যখন আমরা রেডিওতে শুনি তখন মনে হয় বহুদূরের বিদেশিনীর গান আমার কাছে একটি অরূপ সুর মাত্র; সে বহুদূর হইতে বহু গিরিনদী পার হইয়া আসিয়াছে—পথে পথে কত বিচিত্র ভাষার কোলাহলের ভিতর দিয়া সে বহিয়া আসিয়াছে—সংসারের কত জন্ম মৃত্যু বিলাপ উৎসব—রণক্ষেত্রের নিদারুণ হানাহানি—'লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি' সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে—কিন্তু সে একান্তই নির্লিপ্ত এবং নিরাসক্ত, ঠিক সেইভাবেই—

যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত
সেও জানি এমনি অদ্ভুত।
বাণীমূর্তি সেও একা।
শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা।

তার পাশে চুপ

সেকালের সংসারের সংখ্যাহীন রূপ।

সেদিনের যে প্রভাতে উজ্জয়িনী ছিল সমুজ্জ্বল

জীবনে উচ্ছল

ওর মাঝে তার কোন আলো পড়ে নাই।

রাজার প্রতাপ সেও ওর ছন্দে সম্পূর্ণ বৃথাই।

যুগ যুগ হয়ে এল পার

কালের বিপ্লব বেয়ে, কোন চিহ্ন আনে নাই তার।

'পুনশ্চে'র 'বিচ্ছেদ' কবিতার ভিতরে যে কথা বলিয়াছেন কবি 'মেঘদূতে'র প্রসঙ্গে, তাহারই নবরূপ দেখিতে পাই 'সানাই'এর 'যক্ষ' কবিতার ভিতরে। পূর্ণতার সহিত সৃষ্টির একটা ভেদ রহিয়াছে—এই বিরহের ব্যাকুলতাই সৃষ্টিকে জীবন-মরণের ভিতর দিয়া 'ভবিষ্যের তোরণে' পথিক করিয়া চালাইয়া দিতেছে। কবি বলিতেছেন—

ধন্য যক্ষ সেই

সৃষ্টির আগুন-জ্বালা এই বিরহেই।

প্রভুর শাপ পাইয়াই যক্ষ ধন্য হইয়াছে ; কারণ অপূর্ণতার বিরহ-বেদনাই তাহাকে নিরন্তর ছুটাইতেছে পূর্ণের পানে এবং মর্ত্য লোকের এই অপূর্ণতার বিরহ আসিয়া 'স্তব্ধ পূর্ণের দ্বারে' বার বার আঘাত করিতেছে এবং

স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হোতে

ছায়ায় বিচিত্র এই নানাবর্ণ মর্ত্যের আলোতে

উহারে আনিতে চাহে

তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।

'বিচ্ছেদ' কবিতায় কিন্তু কবি বলিয়াছেন যে আহ্বানের ভিতর দিয়া পূর্ণও আগাইয়া আসে অপূর্ণের দিকে—উহাই তাহার চলা। সে কথাটার উপরে কবি এখানে আর জোর দেন নাই।

হোথা বিরহিণী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়
দণ্ড পল গনি গনি মন্থর দিবস তার যায়।
সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তুক পান্থ লাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশা।
কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা।
তার তরে বাণীহীনা যক্ষপুরী ঐশ্বর্যের কারা
অর্থহারা
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্ত্য ভূমে
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।

রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার উপরে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যখানি। এই কাব্যখানির ভিতরে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের একটি অতি উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই পবিত্র আদর্শের সহিত কালিদাসের কবিমূর্তিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে একটা অপূর্ব মঙ্গলের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। চরম শিল্পকলার ভিতরে একটা মঙ্গলের উচ্চ আদর্শ রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের ভিতরেও। এই দুইখানি অমর কাব্য-সৃষ্টি হইতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস আসিয়াছিল

যে কালিদাস শুধু শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ‘শৈব কবি’। ধর্মবিশ্বাসেই কালিদাস শৈব ছিলেন না, তিনি শৈব ছিলেন কাব্যের আদর্শেও; সেখানেও সকল ললিত-কলা-সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার চিত্ত সমাহিত ছিল শিব বা মঙ্গলের চিন্তায়। তাঁহার রস-সাধনা এবং শিব-সাধনা তাঁহার কাব্যসৃষ্টির ভিতরে তাই গভীর সঙ্গতি লাভ করিয়াছে। ‘কালের যাত্রা’র ‘কবির দীক্ষা’ কবিতাটিতে দেখি—

বুঝলেম কথাটা।
মিলচে তত্ত্বানন্দস্বামীর সঙ্গে।
শিবমন্ত্র দেন তিনি প্রলয় সাধনায়।

শিবমন্ত্র দিই আমি ও।

অবাক করলে,
তুমিত জানি কবি,
কবে হ’লে শৈব।

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিরা।

‘প্রাচীন সাহিত্যে’র ভিতরেও কবি বলিয়াছেন—

“কালিদাসের সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য

সৌন্দর্য-বিলাসেই শেষ হইয়া যায় না—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।”

শকুন্তলা নাটকে তাই দেখিতে পাই, যৌবনের উগ্র চঞ্চল প্রেম প্রশান্ত পরিণতি লাভ করিয়াছে কঠোর তপস্যার ভিতর দিয়া। শকুন্তলার কিশলয়রাগের ন্যায় অধর, কোমলবিটপানুকারী বাহু এবং কুসুমের ন্যায় লোভনীয় যৌবন গভীর প্রশান্তি এবং উজ্জ্বল মহিমা লাভ করিয়াছে তাহার মলিনধূসরবসনা নিয়মচর্যায় শুষ্কমুখী ধৃতৈকবেণি বিরহব্রতচারিণী শুদ্ধশিলা মূর্ত্তিতে। যৌবনের প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে মাতৃত্বের মহিমায়।

‘কুমার-সম্ভবে’র ভিতরেও দেখিতে পাই, নব যৌবন-সমাগমে প্রতি অঙ্গে ‘বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী’ উমা তাহার দেহজ রূপ, অকাল বসন্ত এবং মদনকে সহায় করিয়াই লাভ করিতে চাহিয়াছিল শিবের মতন স্বামী—মদন সেখানে ভস্মীভূত—উমা সেখানে প্রত্যাখ্যাতা। উমার সেই প্রেম সার্থকতা লাভ করিয়াছিল যখন নিজের মনে মনে সে নিজের রূপকে নিন্দা করিয়াছিল এবং তপস্যা দ্বারাই অবন্ধ্যরূপতা লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ‘সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব’ উমার উজ্জ্বল মহিমা অক্ষমালাধারিণী তপস্বিনী উমায়।

‘কুমার-সম্ভবে’র অকালবসন্তের সমাগম, উমার ব্যর্থ অভিযান মদনের শোচনীয় পরাজয়—আবার উমার কঠোর তপস্যা এবং সুন্দরের কাছে প্রেমের কাছে যোগীশ্বর শিবের পরাজয়—এই সমস্তই ভাবে ভাষায়—দৃশ্যে গন্ধে গানে রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তকে বিভিন্ন কালে কেবলই দোলা দিয়াছে ; সেই দোলায় জাগিয়াছে যে স্পন্দন তাহাই রূপায়িত হইয়াছে কবির জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাহার বহু কাব্যের ভিতরে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের ভিতরে রূপজ মোহ যে কোথায়ও দেখা দেয় নাই তাহা নহে, কৈশোর এবং যৌবনের প্রেম-কবিতার ভিতরে এই দেহজ আকর্ষণও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতা সমগ্রভাবে বিচার করিলে মনে হয়, ইহার ভিতরে তীব্র হইয়া ওঠে নাই প্রবৃত্তির আলোড়ন, যাহাকে আধুনিক কালে গালভরা নাম দেওয়া হইয়াছে 'প্যাশান্'। রবীন্দ্রনাথের প্রেমকবিতা সম্বন্ধে এমন অভিযোগ শোনা গিয়াছে যে, তাঁহার প্রেমকবিতার ভিতরে 'বুকের টিপ্‌টিপানি' নাই। কিন্তু এ-সকল অভিযোগ দায়ের করিবার পূর্বেই মনে রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শৈবকবি। এই শৈবধর্ম যেমন তাঁহার শিল্পের ক্ষেত্রে—তেমনই তাঁহার প্রেমের ক্ষেত্রে। সুতরাং স্নায়ু-উত্তেজক লালসার উদ্রেককারী প্রেম রবীন্দ্রনাথের মূল কবি-ধর্মেরই বিরোধী; এবং এই মূল কবিধর্মে কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের গভীর মিল।

'কুমার-সম্ভব' কাব্যের স্পষ্ট প্রভাব প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে। 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্য-কাব্যের প্রথমেই দেখিতে পাই, তপস্বী ব্রহ্মচারী অর্জুনের চিত্ত জয় করিবার জন্য রাজ-কন্যা চিত্রাঙ্গদা বসন্ত ও মদনের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছে এবং পরে দেখিলাম এই বসন্ত এবং মদনের সহায়তায়ই রূপজমোহে চিত্রাঙ্গদা তপস্বী ব্রহ্মচারী অর্জুনের চিত্ত জয় করিয়াছে। ইহার পশ্চাতে অকাল বসন্ত এবং মদন সহায়ে গিরি-নন্দিনী উমার যোগীশ্বর শিবের চিত্তজয় করিবার আয়োজনের স্মৃতিটি কবিচিত্তে কাজ করিয়াছে। কিন্তু কিছু কাল পরেই দেখিতে পাই, দেহজ রূপের উপরে আসিয়াছে চিত্রাঙ্গদার ধিক্কার; কারণ দেহজ রূপের জন্য নরনারীর ভিতরে যে ক্ষণিক

আকর্ষণ তাহা প্রেম নহে—উহা প্রেমের তীব্র অপমান। তাই উমার ক্ষেত্রেও যেমন দেখিয়াছি—নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী! এখানেও তেমনি দেখিতে পাই,—

এই দু'টি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দু'টি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে ধরা, দুই হাতে ছিন্ন
ক'রে ফেলে' সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল প'ড়ে
নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ,
ক্ষণস্থায়ী।

তারপরে আমরা দেখিয়াছি, কালিদাস যে শকুন্তলার যৌবনের চঞ্চল প্রেমকে মাতৃত্বের প্রসন্ন পরিণতি দান করিয়াছেন, উমার প্রেম-সাধনাও যে গিয়া মাতৃত্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে এই আদর্শটি রবীন্দ্রনাথ অতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারি প্রভাবে হয়ত কবি চিত্রাঙ্গদার রূপজ প্রেমকে শুধু চঞ্চল ভোগবাসনার ভিতরেই নিবদ্ধ রাখেন নাই, পরিশেষে চিত্রাঙ্গদার মাতৃত্বের আভাসের ভিতরে কাব্য সমাপন করিয়াছেন।

ইহার পরেই 'কুমার-সম্ভবে'র প্রভাব সম্পর্কে 'সোনারতরী'র 'প্রতীক্ষা' কবিতাটির উল্লেখ করিতে পারি। 'উৎসর্গে'র 'মরণ' কবিতাটির ভিতরে এবং এইজাতীয় আরও দু'একটি কবিতার ভিতরে

কবি মরণ এবং নবজীবনের ভিতরে যে একটি শিব-পার্বতীর মধুর মিলন সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন তাহারি আভাস পাওয়া যায় এই 'প্রতীক্ষা' কবিতাটিতে। আমরা 'মরণের' আলোচনা প্রসঙ্গেই এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ইহার পরে উল্লেখ করা যাইতে পারে 'চিত্রা' কাব্যের সুপ্রসিদ্ধ 'বিজয়িনী' কবিতাটি। ইহার ভিতর দিয়া যে সত্যটি কবি রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন এবং বিরল সাফল্যের সহিত রূপায়িত করিয়াছেন তাহা এই যে, পরিপূর্ণ নারীসৌন্দর্য আমাদের চিত্তকে শুধু কামনার তরঙ্গ তুলিয়া বিক্ষুব্ধ করে না, পরিপূর্ণ নারীসৌন্দর্যের এমন একটা প্রশান্ত গম্ভীর মহিমা রহিয়াছে যে তাহা আমাদের চিত্তের ভিতরে আনে পরিপূর্ণ প্রশান্তি। মানুষের ভিতরে দেহজরূপলোলুপ মদন আছে—সে শুধু সুযোগ খোঁজে নারীর নগ্নরূপকে ভোগ করিবার; মানুষের ভিতরে আর একটি আছে প্রশান্ত শিব—সে খোঁজে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ভিতরে মূর্তিমান্ কল্যাণ—সেই শিবের নিকটে মদনের পরাভব পদে পদে। তাই চারিদিকে মত্ত বসন্তের সমাগমে যে মদন নির্জনে অচ্ছোদ সরসিনীরে একাকিনী সুন্দরীর স্নানের সময়ে

—সহাস্য কটাক্ষ করি'
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তা'র, নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।

সেই মদনই স্নান-পূতা কল্যাণময়ী পরিপূর্ণসৌন্দর্য-প্রতিমা রমণীর—

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমিপরে
জানুপাতি' বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

এখানকার যেটুকু সত্যানুভূতি তাহার উপরে রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতার দাবীই সমধিক। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় কালিদাসের কাব্যে নারী-সৌন্দর্যের পশ্চাতে যে প্রশান্ত মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কালিদাসের দান অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কারই বেশী। কবি নিজে যে সত্যের আভাস আবিষ্কার করিয়াছেন কালিদাসের কাব্যে তাহাই তাঁহার পরিণত মনে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে একটা কাব্যসত্যে—অর্থাৎ একটা রসানুভূতিতে। কিন্তু কাব্যের রূপায়ণে একটি সত্যের ক্ষীণ আভাসকে অবলম্বন করিয়া এখানে কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' ঘনীভূত সংক্ষিপ্ত রূপ লইয়া আসিয়া দেখা দিয়াছে পটভূমিকার রূপে। যে পাঠকের মনের পটভূমিকায়—অর্থাৎ তাঁহার বাসনার ভিতরে এইরূপ 'কুমার-সম্ভবে'র ঘনীভূত রূপ স্থিরবদ্ধ নাই তিনি কবিতা হিসাবে এই 'বিজয়িনী' কবিতাকে কিছুতেই সম্যক্ আস্বাদ করিতে পারিবেন না; কারণ কবিতা ত শুধু ফলের আঁঠিটি

মাত্র নয়—আঁঠির সংলগ্ন রসাবরণটিই এখানে প্রধান কথা। এখানকার স্নানলীলারত রমণীর নিরাবরণ অনিন্দ্যসুন্দর কান্তিকে ঘিরিয়া যে বসন্ত একটি মত্ত উদ্দীপনার আভাস বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে তাহা 'কুমার-সম্ভবে'র মদনসখা অকালবসন্তেরই একটি সংক্ষিপ্ত অভিনব রূপ। দু'এক স্থানে কবি ইচ্ছা করিয়াই কালিদাসের শ্লোক ভাঙ্গিয়া তাঁহার বর্ণনার ভিতরে বসাইয়া দিয়াছেন।

গুঞ্জরি' ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে ; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ নয়ন মৃগ ;

ইহা যে কালিদাসেরই—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

প্রভৃতিরই রূপান্তর মাত্র তাহাতে কোন সংশয় নাই। বর্ণনায় এতখানি মিল রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই রাখিয়াছেন সচেতন শিল্পীর মত—কালিদাসের পটভূমিটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ হয়ত কালিদাসের পটভূমিকা গ্রহণ না করিয়াও এই সত্যানুভূতিটিকে ভাষা দিতে পারিতেন ; কিন্তু অতীতের পটভূমিকায় ইহা এখানে যেরূপ রসঘন হইয়া উঠিয়াছে অন্যথায় ইহা সেইরূপ আস্বাদ্য হইয়া উঠিত কিনা সে বিষয়ে আমাদের সংশয় রহিয়াছে।

ইহার পরেই আমরা 'কল্পনা'র 'মদনভস্মের পূর্বে' এবং 'মদন-ভস্মের পর' কবিতা দুইটির উল্লেখ করিতে পারি। অনঙ্গ দেবতা যখন অঙ্গ ধরিয়া নব ভুবনে ঘোরা-ফেরা করে তখন সর্বত্রই জাগে প্রেমের চঞ্চলতা; মদন-সঞ্জাত সেই চঞ্চল প্রেম মানুষকে মত্ত করে—বিবশ করে—এবং বৃহত্তর জীবন-পরিধি হইতে সঙ্কুচিত করিয়া আনে

বাসর গৃহদুয়ারে
স্তিমিতশিখা-প্রদীপ-আলোকে।

প্রেমের এই বন্ধন বহির্বিশ্বে মুক্তি লাভ করে মদন-ভস্মের দ্বারা; মিলনে যাহার বন্ধন বিরহেই তাহার নিঃসীম মুক্তি। তাই—

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছে একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তা'রে ছড়ায়ে।

এখানেও কানে আসে কালিদাসের নেপথ্য-সঙ্গীতের ঝঙ্কার; সেই ঝঙ্কারই বিচিত্র ঝঙ্কার তুলিতেছে আমাদের রসপিপাসু পাঠকচিত্তে।

তারপরে উল্লেখযোগ্য 'উৎসর্গে'র 'মরণ'। মৃত্যু আমাদের বহির্দৃষ্টিতে যতই রুদ্র—যতই ভীষণ হোক তাহার একটি অনিন্দ্য-সুন্দর স্ময়মান প্রসন্ন বরমূর্তি রহিয়াছে—সেই প্রসন্ন বরমূর্তিতে সে মিলন-সূত্রে আবদ্ধ হয় নবজীবনের নববধূর সহিত। এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথের একটি মূল কবি-বিশ্বাস—এবং এই বিশ্বাসের বলেই তিনি মৃত্যুভয়কে জয় করিতে চাহিয়াছেন সমগ্র জীবনে। রবীন্দ্রনাথের জীবন-ধারার অখণ্ডতার পরিকল্পনা এবং সেই অখণ্ড প্রবাহের ভিতর দিয়া বিকাশমান 'জীবন-দেবতা'র পরিকল্পনার সহিত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কিত এই বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটা অজ্ঞাত রহস্যাবৃত তমসার ভিতর দিয়া নবজীবনের নবীন আলোতে আমরা

পরিচয় পাই মৃত্যুর এই কল্যাণতম রূপের। বহির্বিশ্ব তাহার অপ্রেমের মিথ্যাদৃষ্টিতে শিবের রুদ্রমূর্তিতে যতই ভীত-সন্ত্রস্ত হোক—নবজীবনের নববধূ উমা তাহাকে অভ্রান্ত দৃষ্টিতেই চিনিয়া লইতে পারে। তাই—

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি' রহি' গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি' জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে।
তাঁর ববম্বম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি' উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

শুনি' শ্মশানবাসীর কল কল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর হিয়া দুরু দুরু দুলিছে,

তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
ক্ষ্যাপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

'কুমার-সম্ভবে'ও দেখিতে পাই, মহাদেব সম্বন্ধে উমার চিত্তে কোন সংশয় বা বিভ্রমের লেশমাত্র ছিল না। ছদ্মবেশী বটু ব্রাহ্মণ আসিয়া যখন উমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য শ্মশানবাসী ভস্মভূষণ শিবের অসদাচার, সর্পবলয়িত হস্ত, শোণিতবিন্দুবর্ষি গজাজিন, বৃষবাহন প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছিল তখন উমা দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিল—'ন বেৎসি নূনং যত এবমাত্থ মাং'—'তুমি তাঁহাকে ভালভাবে জান না, সেই জন্যই এই সব কথা বলিতেছ। অথবা—

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া
তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে॥

'বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই, তুমি যেমন শুনিয়াছ সে ঠিক ঠিক সেই রূপই হোক; এখানে আমার মন 'ভাবৈকরস' রূপে অবস্থান করিতেছে; স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি কখনও লোকের কথা বিচার করে না।'

আমাদের নবজীবনের নববধূটিও এইরূপ 'ভাবৈকরস' হইয়াই অবস্থান করে,—তাই তাহার চোখে ধরা পড়িয়া যায় জটাধারী সর্পবলয়িত-বাহু বিভূতিভূষণ শ্মশানচারী মৃত্যুর অভিনব কান্তমূর্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি, 'সোনার তরী'র 'প্রতীক্ষা' কবিতার ভিতরে মরণের এই বরবেশের আভাস রহিয়াছে। সেখানেও কবি মৃত্যু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তুই কি বাসিস্ ভাল আমার এ বক্ষোবাসী
পরাণ-পক্ষীরে।
তাই এর পার্শ্বে এসে কাছে বসেছিস্ ঘেঁসে
অতি ধীরে ধীরে।
দিন রাত্রি নির্নিমেষে চাহিয়া মোদের পানে
নীরব সাধনা,
নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে
রুদ্র আরাধনা।

জীবনের প্রেয়সীকে লইয়া মৃত্যু তাহার অন্ধকার রথে শূন্যপথে যাত্রা করে, তারপরে নবজীবনের ভিতরে আসিয়া আবার—

কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন।

আসলে মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের নিকটে 'জীবন-দেবতা'রই একটা ক্ষণিক রুদ্র রূপ। এই 'জীবন-দেবতা'ই নটরাজ শিব; এক জীবন যখন পুরাতন হইয়া যায়, যখন বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, চুম্বন মদিরাবিহীন হইয়া যায় তখনই বৈচিত্র্যহীন জীবন বৈচিত্র্যপ্রয়াসী নটরাজ জীবন-দেবতাকে ডাকিয়া বলে—

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,

নূতন করিয়া লহ আর বার
চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে। (জীবন-দেবতা, চিত্রা)

তখন নটরাজ জীবন-দেবতা মৃত্যুর রুদ্রমূর্তি ধারণ করে; কিন্তু জীবন তাহাকে ঠিক চিনিতে পারে। 'প্রতীক্ষা' কবিতায়ও বলা হইয়াছে—

ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে ;
আমার পরাণবধূ ক্লান্তহস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেশে
ধরিবে তোমার বাহু ; তখন তাহারে তুমি—
মন্ত্র পড়ি' নিয়ো ;
রক্তিম অধরে তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।

এই কথাটিই রূপ পাইয়াছে 'বলকা'র 'সর্বনেশে' কবিতাটির ভিতরেও। রক্তমেঘের ঝিলিকের ভিতর দিয়া গহন-পারের বজ্রধ্বনির ভিতর দিয়া পাগল ভোলানাথের মরণের আহ্বান জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহার ভিতরে—

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না ?
চরণে তোর রুদ্রতালে
নূপুর বেজে উঠবে না ?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে

রক্তবাসে আয়রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো।
ঐ বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো॥

'বলাকার' 'দুই নারী' কবিতার ভিতরে যে দুই নারীর বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার পশ্চাতেও 'কুমার-সম্ভবে'র আদর্শকে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। নারীর একটি উর্বশী রূপ রহিয়াছে—যেরূপে সে পুরুষের 'তপোভঙ্গ' করে এবং

উচ্চ-হাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দু-হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

কিন্তু নারীর আর একটি কল্যাণময়ী মূর্তি রহিয়াছে—সে মাতৃত্বে উজ্জ্বল, সে—

··· ··· ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন-সাহিত্যে'র ভিতরেও 'কুমার-সম্ভব ও শকুন্তলা' সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার ভিতরেই আমরা কালিদাস-অঙ্কিত নারীর এই দুইটি রূপের চিত্র পাইয়াছি। বসন্ত ও মদন সহায়ে

শুধু মাত্র ভরা যৌবনের ভরসায় যে উমা মহাদেবের মন প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে গিয়াছিল, যৌবনের চঞ্চললীলায় যে শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্তের ভোগবাসনা বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল তাহারাই নারীর উর্বশী মূর্তি ; কিন্তু সে নারীরই কল্যাণময়ী প্রশান্তমূর্তি আমরা দেখিয়াছি তপস্যায়পূতা কুমার-জননী পার্বতীর ভিতরে, ভরত-জননী শকুন্তলার সৌম্য তপস্বিনী মূর্তিতে।

ইহার পরে আমরা উল্লেখ করিতে পারি 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতাটি। 'বলাকা' রচনার পরে রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছে, কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি ক্রমেই 'ধ্যানী' হইয়া উঠিতেছেন। 'ধ্যানে'র প্রধান কথাই 'প্রত্যাহার', বহির্বিশ্বের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—যাহা নিরন্তর চিত্তকে মুগ্ধ করে ও রস-চঞ্চল করিয়া তোলে তাহা হইতে চিত্তের প্রত্যাহার। রবীন্দ্রনাথেরও মনে হইয়াছে—এই বলাকার যুগটা যেন অনেকখানি প্রত্যাহারের যুগ—রূপলোক রসলোক হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া ধ্যানলোকেই বেশী অবস্থিতি। যৌবনে তিনি জগৎকে এবং জীবনকে যেমন করিয়া রূপে রসে গ্রহণ করিতে এবং ভোগ করিতে পারিতেন এখন যেন তেমন আর পারিতেছেন না। কবি অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার ভিতরে যেন একটি ভোলা-মহেশ্বর বাস করিতেছেন। অবশ্য কবি অনেকস্থলেই বলিয়াছেন,—'আমি নটরাজের চেলা' ; এই নটরাজ শিবই কবি রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'। এই শিবের দুইটি রূপ, একরূপে তিনি 'যোগীশ্বর'—যখন তিনি 'ভোলা সন্ন্যাসী', যখন—

চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হ'য়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হ'য়ে আসে। (তপোভঙ্গ, পূরবী)

অথবা কালিদাসেব ভাষায়—

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহ-
মপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা-
ন্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ (কুমার-সম্ভব, ৩।৪৮)

যখন 'তিনি বৃষ্টিহীন অম্বুবাহের (জলভরা মেঘ) মতন, তরঙ্গহীন বারিধির মতন, অন্তশ্চর বায়ুব নিরোধহেতু নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মতন।' কিন্তু তাঁহার আর একটি রূপ রহিয়াছে যে রূপে প্রেমের আহ্বানে—সুন্দরের আহ্বানে তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়—চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে বিশাল বারিরাশির মত তাঁহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে পরাজয় স্বীকাব করিতে হয় প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতিমা উমার নিকটে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবি-জীবনে অনেকবার এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন: কখনও কখনও তিনি বাহিরের জগৎ হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়াছেন—নিজেকে নিজের ভিতরে সংহরণ করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু এই আত্মসংহরণ—এই ধ্যান তাঁহাকে পরক্ষণে জগৎ এবং জীবনের দিকে আরও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে ও তপস্যার কঠোরতা চিত্তে আরও নবীন সরসতা আনিয়া দিয়াছে; তাই দেখিতে পাইতেছি, 'বলাকা'র 'তপোভঙ্গে'র পরেই আসিয়াছে 'পূরবী'র নবীন সরসতা। কবি বলিতে চান, মানুষের একান্তভাবে রূপ-রস-বিরূপ হইয়া আত্ম-সংহরণের ভিতরে ধ্যানস্থ থাকিবার উপায় নাই, কারণ মানুষের এই বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে সমস্ত সৃষ্টি জুড়িয়া চলিতেছে দেবগণের চক্রান্ত—তাহারা চক্রান্ত করিয়াছে সুন্দরের সঙ্গে—সেই সুন্দরই

সৃষ্টির কবি—রূপ-রস-বিরাগী মানুষের সন্ন্যাসী চিত্তকে সে ফিরাইয়া আনে এই রূপ-রসের জগতে—তাহাকে লুব্ধ করে—মুগ্ধ করে—প্রেমে সৌন্দর্যে মাধুর্যে ভরপূর করিয়া তোলে। তাই ধ্যানস্থ মানুষের আশ্রমের বহির্দ্বারের মূর্তিমান বারণের তর্জনীনির্দেশ অবহেলা করিয়াও মূর্তিমান সুন্দর আসিয়া বলে—

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, তাঁহার অন্তরস্থ শিবের এই ধ্যান-তপস্যা যেন একটি ছলনা মাত্র—সুন্দরের হাতে প্রেমের হাতে বার বার পরাজিত হইয়া নিত্য নূতন বৈচিত্র্যে ও মাধুর্যে নবীন হইয়া উঠিবার আয়োজন। যোগীশ্বর শিবের উমাপতি মূর্তি যোগের ভূমিকাতেই আরো রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আত্ম-সমাহিত চিন্তা ও ধ্যানের কঠোরতাই আনয়ন করে সুন্দরকে গ্রহণ করিবার নবীন উদ্যম।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম-রণ-বেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুন উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব ব'লে
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহ-তলে,
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখ-দাহে।
ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

রূপেরসে পরিপূর্ণযৌবনা পৃথিবীর মায়াই এখানে উমা, তাহাকেই আত্ম-সমাহিত তপস্যার ভিতর দিয়া বৈচিত্র্য এবং নবত্বে উজ্জ্বল করিয়া পাইতে চাহে আমাদের নটরাজ শিবের চেলা কবি-পুরুষ।

পৃথিবীর বুকে ষড়্ঋতুর আবর্তনের ভিতরেও কবি দেখিয়াছেন নটরাজের এই লীলা। শীতের কঠোরতার ভিতরে আছে নটরাজের রিক্ত সন্ন্যাসী বেশে কঠোর তপস্যা; কিন্তু বসন্ত আসিয়া বলে—

ভাঙব, তাপস, ভাঙব তোমার কঠিন তপের বাঁধন,
এই আমাদের সাধন।
চল কবি চল সঙ্গে জুটে,
কাজ ফেলে তুই আয়রে ছুটে,
গানে গানে উদাস প্রাণে জাগারে উন্মাদন॥
(সুন্দর-ঋতু-উৎসব)

সমগ্র বৎসর জুড়িয়া ধরণীর বুকে চলে নটরাজ ভোলা-মহেশ্বরের যে লীলা তাহা মধুরতম প্রকাশ লাভ করিয়াছে 'নটরাজ' কাব্যের

ভিতরে। এখানে দেখা যাইতেছে, কবির পরিণত চিন্তা—পরিণত রসবোধ মিলিয়া পৌরাণিক শিব, এমন কি কালিদাসের শিবকেও একটা গভীর পরিণতি দান করিয়াছে। অবশ্য নটরাজ শিবের পরিকল্পনা নূতন নহে; কিন্তু সেই পরিকল্পনার ভিতরে কবি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহার জীবন-দেবতা তথা তাঁহার বিশ্ব-দেবতার সকল তত্ত্ব। আর মূলতঃ নটরাজের পরিকল্পনা কোন দার্শনিক পরিকল্পনা নহে—শিল্পীর পরিকল্পনা। ধরণীর বুকে ঋতুরঙ্গ-শালায় নটরাজের যে নৃত্যাভিনয় হইতেছে তাহার ভিতরে প্রথমে বৈশাখে দেখি তাহার তপস্বী রুদ্র সন্ন্যাসী রূপ।

ধ্যান নিমগ্ন নীরব নগ্ন
নিশ্চল তব চিত্ত।
নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে
নিঃশেষ সব বিত্ত।
রসহীন তরু নির্জীব মরু,
পবনে গর্জে রুদ্র ডমরু,
ঐ চারিধারে করে হাহাকার
ধরা ভাণ্ডার রিক্ত॥ (বৈশাখ, নটরাজ)

কিন্তু কবি জানেন, তাঁহার কবি-জীবনে যেমন এই রুদ্র সন্ন্যাসী কঠোর তপস্যায় আত্মসংহরণ করে নিত্য নূতন করিয়া সুন্দরের কাছে পরাভব মানিবার জন্য, বহির্বিশ্বেও তাহার চলিতেছে সেই একই লীলা। তাই প্রার্থনা জাগে—

জাগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে
তাপস, লোচন মেল' হে।

... ...

পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,
ভীষণে মধুরে দিক্ ঝঙ্কার,
ধূলায় মিশাক যা কিছু ধূলার,
জয়ী হোক্ যাহা নিত্য। (ঐ)

সংসারে এই রুদ্র তপস্যার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই তপস্যার বহ্নি দূর করিয়া দেয় যাহা কিছু উমার রূপে এবং প্রেমে ছিল মূল্যহীন আবর্জনা, উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে তাহার সত্য এবং শাশ্বত রূপ এবং প্রেমকে। নটরাজের এই বৈশাখের রুদ্র তপস্যায়ও—

তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে।
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক্।

. .. ...

মুছে যাক্ সব গ্লানি, ঘুচে যাক্ জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক্ ধরা।
(বৈশাখ-আবাহন, ঐ)

কিন্তু এই অগ্নি-তপস্যার মাঝখানে একটি গভীর ব্যঞ্জনা রহিয়াছে—সে ব্যঞ্জনা হইল সুন্দরের জন্য রুদ্র সন্ন্যাসীর গোপন আহ্বান।—

শুনিতে কি পাস্
এই যে শ্বসিছে রুদ্র শূন্যে শূন্যে সন্তপ্ত নিঃশ্বাস
এরি মাঝে দূরে বাজে চঞ্চলের চকিত খঞ্জনী,
মাধুরীর মঞ্জরীর মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত ধ্বনি ?

রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে
অর্ঘ্য-মাল্য সাঙ্গ হয় সঙ্গোপনে সুন্দরের লাগি।
(ব্যঞ্জনা, ঐ)

রুদ্র তপস্যার ভিতরে নটরাজের একটি 'মাধুরীর ধ্যান' রহিয়াছে; সেই মাধুরীর ধ্যানটাই আসল কথা, সেই মাধুরীকে আরও মধুর করিয়া পাইবার জন্য ধূলিধূসরিত পিঙ্গল জটাজালে শুষ্ক তপস্যার কঠোরতা। তাই মধ্যদিনে যখন পাখী গান বন্ধ করে এবং রাখাল বাঁশী বাজায় তখন—

শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি; (মাধুরীর ধ্যান, ঐ)

বৈশাখের রুদ্রমূর্তি নটরাজ তাহার সকল বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া আকাঙ্ক্ষা করে ধরণীর শ্যামলী প্রিয়াকে; তাই আষাঢ়ের আকাশে যখন প্রথম গুরু গুরু ডমরু বাজিয়া ওঠে তপস্বীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া ওঠে সেই শ্যামলী প্রিয়ার সহিত মিলন-সম্ভাবনায়। তাই

তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল-আঁধার মাতালো তোমার হিয়া
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে ওঠে চমকিয়া।

চির জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চির জনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া ॥
(আষাঢ়, ঐ)

তারপরে সেই বিরহিণী প্রিয়া তাহার বৃষ্টি-ছলছল আঁখি দুইটি লইয়া গৃহকোণে যখন নীপের অঞ্জলি রচনা করে এবং রুদ্র সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয়ের সকল ব্যাকুলতার সহিত সেই অঞ্জলি ঢালিয়া দেয়, তখন—

মল্লার রাগে গর্জিয়া ওঠ গাহি,
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে। (ঐ)

শ্রাবণের মধুর বর্ষণ, শরতের প্রশান্ত উজ্জ্বল মুক্তি, ফলভারাবনত হেমন্তের অন্নপূর্ণা মূর্তি—ইহার ভিতরে নটরাজ প্রেমে সৌন্দর্যে বিভোল; কিন্তু আবার—

উত্তর বায় জানায় শাসন,
পাতলো তপের শুষ্ক আসন,—
(আসন্ন শীত, ঐ)

কিন্তু বসন্তে আবার সে দেখা দেয় 'ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন' সুন্দরের বেশে—'ভুবন-মোহন নব বরবেশে।' এই শিব-সুন্দরের জন্য ধরণীর তপস্বিনী উমাও কতই না তপস্যা করিয়াছে।

তারি লাগি' তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,

ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে ॥
সূর্য প্রদক্ষিণ করি' ফিরে সে পূজার নৃত্যতালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্র ভালে আঁকে তা'র প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মি-টীকা।
সমুদ্র-তরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্রপাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিক দিগন্তরে
রচে মরীচিকা ॥
আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুণে' গুণে'।
সার্থক হ'লো যে তা'র বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।

(বসন্তে, ঐ)

এখানে কবি সুন্দরের মিলন-প্রত্যাশিনী ধরণীর উমার বিরহ-তপস্যার যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা অভিনব এবং অদ্ভুত। এ-বিরহের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ ই কবির নিজস্ব,—অথচ তাহার সহিত কালিদাসের উমার বিরহ-তপস্যার রহিয়াছে কি সুকুমার যোগ। ধরণীর উমা—

তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,

কালিদাস বলিয়াছেন,—'তপো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে'। ধরণীর উমা 'আপনারে তপ্ত করে'; কালিদাসের উমা 'নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা'; সে 'হুতজাতবেদসং', সে—

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং
শুচিস্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভা-
মনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত॥ (কু ৫।২০)

'গ্রীষ্মকালে শুচিস্মিতা সুমধ্যমা সেই উমা প্রজ্বলিত চারিটি অগ্নির মধ্যে গিয়া নেত্রপ্রতিঘাতিনী প্রভাকে জয় করিয়া (অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিয়া) অনন্যদৃষ্টি হইয়া সূর্যকে দেখিতে থাকে'।

ধরণীর উমা তপস্যার জন্য আপনাকে 'ধৌত করে'; কালিদাসের তপস্বিনী উমাও 'কৃতাভিষেকা', 'উদবাসতৎপরা'; ধরণীর উমা 'ছাড়ে আভরণ,' কালিদাসের উমা—

বিমুচ্য সা হারমহার্যনিশ্চয়া
বিলোলযষ্টি-প্রবিলুপ্তচন্দনম্।
ববন্ধ বালারুণবভ্রু বল্কলং
পয়োধরোৎসেধবিশীর্ণসংহতি॥ (৫।৮)

'অনিবার্যনিশ্চয়া সেই উমা যে বিলোল হারযষ্টির দ্বারা বুকের চন্দন বিলুপ্ত হইত সেই হারকে পরিত্যাগ করিয়া বালার্ক-পিঙ্গল বল্কল দেহে বন্ধন করিয়াছে—পয়োধরের উচ্ছ্রায়ের হেতু সে বল্কল ভিন্ন হইয়াছে।'

ধরণীর উমা 'সূর্য প্রদক্ষিণ করি' ফিরে', এবং—

নম্রভালে আঁকে তা'র প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মি-টীকা।

কালিদাসের বর্ণনায় আছে—

তথাতিতপ্তং সবিতুর্গভস্তিভি-
র্মুখং তদীয়ং কমলশ্রিয়ং দধৌ।

'সূর্যের কিরণের দ্বারা অতিতপ্ত তাহার মুখ কমলশ্রী ধারণ করিল।' ধরণীর উমা—

সমুদ্র-তরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্রপাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে, ;

কালিদাসে আছে—

উপান্তবর্ণে চরিতে পিনাকিনঃ
সবাষ্পকণ্ঠস্খলিতৈঃ পদৈরিয়ম্।
অনেকশঃ কিন্নররাজকন্যকা
বনান্তসঙ্গীতসখীররোদয়ৎ ॥ (৫।৫৬)

'শিবের চরিত্র গীত হইতে আরম্ভ হইলে উমা সবাষ্পকণ্ঠ হেতু স্খলিত পদে (গানের পদ) বনান্তসঙ্গীতসখী কিন্নরকন্যাগণকে অনেকবার কাঁদাইয়া ছিল।'

ধরণীর উমার—

বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা ॥

কালিদাসের উমাও ত্রিভাগশেষ নিশান্তে মুহূর্তের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া যেন কাহার ছায়ামূর্তি দর্শন করিয়া 'কোথায় নীলকণ্ঠ' বলিয়া প্রলাপোক্তি করিত (৫।৫৭)।

ধরণীর উমা—'আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ'; কালিদাসের উমারও—

কৃতোঽক্ষসূত্রপ্রণয়ী তথা করঃ ॥ (৫।১১)

আরও দেখি—

অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলী
সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম্। (৫।৬৩)

উপরে রবীন্দ্রনাথের এবং কালিদাসের যে কাব্যাশংগুলি পাশা-পাশি সাজাইয়া দেওয়া হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে, কালিদাসের প্রতিভার সহিত গভীর যোগে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কত মহৎ এবং স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। উমা-মহেশ্বর এবং তাঁহাদের তপস্যা ও প্রেম রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুরঙ্গশালা'র বর্ণনায় যে নবরূপ গ্রহণ করিয়াছে কালিদাসের কবি-কল্পনায় তাহার কোথায়ও কোন আভাস নাই। কিন্তু কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথের চিত্তে একান্তভাবে দৃঢ়বদ্ধ থাকার ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যস্বাদের ক্ষেত্রে তাহা কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। কালিদাসের কাব্যসম্বন্ধে কবিচিত্তে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল অনেক 'প্রমুষ্টতত্ত্বাকস্মৃতি'—সেই স্মৃতিগুলি রসানুভূতির 'সামরস্যে'র ভিতর দিয়া কবির মানস-ছবিগুলির সহিত অতি সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

ইহার পরে 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের একটি নবতমরূপের সহিত আমরা সাক্ষাৎ লাভ করি রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যে। 'মহুয়া' প্রেমের কাব্য, কিন্তু নবযৌবনা উমার দেহরূপের মত্ততার উপরে প্রতিষ্ঠিত লঘুভোগের চঞ্চল প্রেম নহে, এ প্রেম উমার তপশ্চর্যার পরবর্তী প্রেম। যৌবনে রবীন্দ্রনাথের চিত্তে প্রেম আসিয়াছিল, সে প্রেম মর্তের প্রেম, চঞ্চল ভোগবাসনার সহিত জড়িত দেহজ আকর্ষণ। প্রথমদিকের কবিতায় তাই রূপের মোহজাল কল্পনার জালকে আচ্ছন্ন

করিয়া রাখিয়াছে। তারপরে আসিয়াছিল মধ্যজীবনে আর একটি যুগ যখন মর্ত্যের এই রূপ ও রূপজ প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার মন একটু একটু করিয়া বিরাগী হইয়া উদাসীন হইয়া উঠিল; তিনি প্রেম খুঁজিলেন অরূপ-লোকে; 'গীতাঞ্জলি,' 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' প্রভৃতির ভিতর দিয়া তিনি মত্ত হইয়া উঠিলেন অরূপের প্রেমে, অরূপের টানে, অসীমের অধ্যাত্ম প্রেমে। তারপরে আসিল 'বলাকা'র তত্ত্বপ্রধান যুগ; 'গীতাঞ্জলি' হইতে 'বালাকা' পর্যন্ত মদন-ভস্মান্তে প্রেমের একটা তপশ্চর্যার যুগ; এই তপশ্চর্যার ভিতর দিয়া লাভ হইল নবীন বলিষ্ঠ ভাস্বর প্রেম। কিছু দিন যেন কবি মর্ত্যের দেহধারী মদনকে একেবারে ভস্ম করিয়া অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু এই অধ্যাত্মযোগ এবং ধ্যানযোগের ভিতর দিয়া মর্ত্যের প্রেম যেন পুড়িয়া নিখাদ উজ্জ্বল সোনা হইয়া দেখা দিয়াছে। এই সময়কার রচিত 'তপতী' নাটকের ('রাজা ও রাণী' নাটকের পরিবর্তিত নাট্যরূপ) ভিতরেও সুমিত্রার প্রেমে শৈবমন্ত্রের স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। এই সময়কার 'যোগাযোগ' উপন্যাসের প্রেমের সকল তিক্ত বিরোধও প্রশান্তি লাভ করিয়াছে 'কুমার-সম্ভব'-এর ভিতরে। এই শৈবমন্ত্রে পরিশোধিত প্রেম উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছে এ-যুগের 'মহুয়া' কাব্যে। তাই কবি আবার মর্ত্যের মাটিতে ফিরিয়া আসিয়া মদনের 'উজ্জীবন' করিয়াছেন।—

ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র-বহ্নি হতে লহ জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক্‌ ম'রে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধ'রে।

যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু॥

'মহুয়া'র কবিতাগুলি মূলতঃ কবি বিবাহের উপযোগী করিয়াই রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু 'বিবাহে'র কবিতা হইলেও ইহার একটা অনন্যসাধারণতা রহিয়াছে, সেই অনন্যসাধারণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে 'কুমার-সম্ভবে'র পঞ্চমসর্গের প্রেম-সাধনার আদর্শে। এ-প্রেম শুধু বসন্তের চপল প্রণয় নয়, 'দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ' জীবনের সেই দুর্গম বন্ধুর পথেই চলিবে বীর্যের মহিমায় এই প্রেমের জয়যাত্রা। এখানে 'তুচ্ছ লজ্জা ত্রাসে'র কোন স্থান নাই, এখানে বিশ্ববিমুখ আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাসনার স্থান নাই, এ-প্রেম জীবনের পথে দুর্জয় শক্তি—এ প্রেম আত্ম-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া বিশ্বজীবনের সহিত করে নিবিড় যোগসাধন; এই বীর্যদীপ্ত কল্যাণতম প্রেমই হইয়া উঠিয়াছে 'শিবে'র গ্রহণযোগ্য।

এই 'উজ্জীবন' কবিতাটি যে 'মহুয়া'র প্রথম কবিতা এ জিনিসটাকে সম্পূর্ণ একটা আকস্মিক জিনিস বলিয়া মনে হয় না। প্রচ্ছন্নভাবে এই কবিতাটিই কাব্যখানির ভূমিকা-স্বরূপ; ইহার ভিতরে যে প্রেমের বর্ণনা রহিয়াছে তাহার সর্বত্রই প্রেমের একটা 'জ্বলদর্চি'তনুর আদর্শ গূঢ় হইয়া রহিয়াছে, ত্যাগ সাধনার বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই মিলনের মহিমা। এইজন্যই কবি এখানে প্রেমের যতই বিচিত্ররূপের বর্ণনা করুন, তাহার ভিতর দিয়া একটা তপশ্চর্যা এবং বীর্যের দীপ্তিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 'নাগরী'র বর্ণনায়ও তাই কবি বলিয়াছেন,—

আপন তপস্যা লয়ে যে-পুরুষ নিশ্চল সদাই
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভ'রে।

এই মূল ভাবরস ব্যতীত এই কাব্যের অনেক কবিতাতে আমরা **'কুমার-সম্ভব'** অবলম্বনে কতগুলি অর্থালঙ্কারও লাভ করি; এই অর্থালঙ্কারগুলিও মূল ভাবরসকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যেমন—

তুমি যেন মহাকাল সমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যানমাঝে উমার ভৈরবী।
(বরণ, মহুয়া)

অথবা—

যেন তার চক্ষুমাঝে
উদ্যত বিরাজে
মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনী।
(জয়তী, ঐ)

কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি'
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।
(সাগরিকা, ঐ)

'মহুয়া'র পরে 'কুমার-সম্ভব'কে আবার দেখিতে পাই 'বিচিত্রিতা'র 'ছায়াসঙ্গিনী' কবিতায়। পরিণতবয়স্কা নারীর সমস্ত দেহমন ঘিরিয়া একটি 'ছায়াসঙ্গিনী' বিরাজ করিতেছে। এই 'ছায়াসঙ্গিনী' কাহার ছায়া? একদিন এই নারীর জীবনে যৌবনের প্রথম ফাল্গুনী আসিয়াছিল; সেই ফাল্গুনীর পায়ের ধ্বনি শুনিয়া 'কম্পিত কৌতুকে' নারী আপনার হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; সেদিন 'আম্র-মঞ্জরীর গন্ধে'র ভিতর দিয়া এবং 'মধুপগুঞ্জনে'র ভিতর দিয়া এই নারীর হৃদয়-স্পন্দন মিলিয়া গিয়াছিল বনমর্মরের সঙ্গে,—'অশোকের কিশলয়স্তর' বিস্তার করিয়া দিয়াছিল তাহার যৌবনের নবীন রক্তিমা। কিন্তু তারপরে নারী সসঙ্কোচে সেই উৎসুক হৃদয়দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, 'উচ্ছৃঙ্খল সমীরণে উদ্দাম কুন্তলভার' সংযত করিয়া লইল,—আর—

> অশান্ত তরুণ প্রেম বসন্তের পন্থ অনুসরি'
> স্খলিত কিংশুক সাথে
> জীর্ণ হোলো ধূসর ধূলাতে।

কিন্তু জীবনের সেই প্রথম ফাল্গুনী নিঃশেষে নিজেকে হারাইয়া ফেলে নাই,—তাহারই ছায়া আজ ফিরিতেছে এই নারীর দেহমন ঘিরিয়া সঙ্গিনীর মত।

> তুমি ভাবো সেই রাত্রিদিন
> চিহ্নহীন
> মল্লিকা-গন্ধের মতো,
> নির্বিশেষে গত।

জানো না কি যে-বসন্ত সম্বরিল কায়া
তারি মৃত্যুহীন ছায়া
অহর্নিশি আছে তব সাথে
তোমার অজ্ঞাতে।
অদৃশ্য মঞ্জরী তার আপনার রেণুর রেখায়
মেশে তব সীমন্তের সিন্দূর লেখায়।
সুদূর সে ফাল্গুনের স্তব্ধ সুর
তোমার কণ্ঠের স্বর করি' দিল উদাত্ত মধুর।
যে চাঞ্চল্য হ'য়ে গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ শান্ত সুগভীর॥

'শেষ সপ্তকে'র সাঁইত্রিশ সংখক কবিতায় আবার 'ঋতুরঙ্গশালা'র সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বলক্ষ্মী বৈশাখে একদিন বসিয়াছিল দারুণ তপস্যায় রুদ্রের চরণতলে; উপবাসে তাহার তনু হইয়াছিল শীর্ণ, পিঙ্গল হইয়াছিল কেশপাশ। এই দুঃখের দহনে

ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হোলো
ত্যাগের হোমাগ্নিতে।

এই কঠোর তপস্যার ভিতর দিয়া—

দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা
ঘোষণা করলে মেঘগর্জন,
অবনত হোলো দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।

মরুবক্ষে তৃণরাজি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার 'পরে ॥

'শেষ সপ্তকে'র পরিশিষ্টে (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড) 'আষাঢ়' নামক কবিতাটির ভিতরেও এই সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতারই রূপান্তর দেখিতে পাই।

'বীথিকা'র 'সন্ন্যাসী' কবিতার সহিত 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গে'র মিল রহিয়াছে। গম্ভীর সন্ন্যাসী মহেশ্বরকে নিরন্তর চঞ্চল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে মন্দাকিনীর কত নির্ঝর ধারা; তাহারা 'উৎক্ষিপ্ত শীকর-বাষ্পে বাঁধা ইন্দ্রধনু' রচনা করিয়া মহেশ্বরের শুভ্রতনু বর্ণে-বর্ণে বিচিত্রিত করিয়া দিতেছে। 'নন্দীর রুষ্ট তর্জনী' এবং 'ভৃঙ্গীর ভ্রূকুটি' তাহাদের এই চপলতাকে যতই শাসন করিতে চেষ্টা করুক, এই চাপল্যের প্রতি মহেশ্বরে একটি মৌন স্মিত সম্মতি রহিয়াছে। তাই—

এদের প্রশ্রয় দিলে, তাই যত দুর্দামের দল
চরাচর ঘেরি' ঘেরি' করিছে উন্মত্ত কোলাহল
সমুদ্র তরঙ্গতালে, অরণ্যের দোলে,
যৌবনের উদ্বেল কল্লোলে।

এই কবিতাটিতেও দুই একটি এমন চরণ আছে যাহা স্পষ্টই 'কুমার-সম্ভবে'র সহিত যুক্ত; এখানকার প্রসঙ্গের সহিত 'কুমার-সম্ভবে'র সেই যোগ কাব্যার্থকে বুদ্ধিগ্রাহ্যত্বের ভিতরেই সীমাবদ্ধ না করিয়া পরম আস্বাদ্য করিয়া তুলিয়াছে। যেমন—

'উদ্ধত নন্দীর রুষ্ট তর্জনীরে করে পরিহাস',—

ইহার সহিত 'কুমার-সম্ভবে'র বর্ণনা মিলাইয়া পড়ুন—

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী
বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ (৩।৪১)

শিবের তপস্যাভূমির লতাগৃহদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন নন্দী, বামহস্তে তাঁহার হেমবেত্র; মুখার্পিত একটি অঙ্গুলি-সঙ্কেতের দ্বারা তিনি সকলকে চপলতা প্রকাশ করিতে বারণ করিতেছিলেন।

'নব জাতকে'র 'ক্যাণ্ডীয় নাচ' কবিতায় তপোভঙ্গের পরে মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যের পরিচয় রহিয়াছে। 'ক্যাণ্ডীয় নাচে'র ভিতরে একটা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; সে

নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পিছন-ফেরা,
নহে আবেগ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা,
নহে মৃদু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন;
আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন।

এ নৃত্য মানুষ শিখিয়াছিল সৃষ্টির ভিতরে মহাদেবের যে একটা তাণ্ডব নৃত্য আছে তাহা হইতে; সমুদ্রের ঢেউ দিয়াছে রক্তে ছন্দের দোলা, ঝঞ্ঝা দিয়াছে মঞ্জীরে প্রলয় নাচের ঝঙ্কার, শূন্যে উত্তোলিত বাহুতে আছে রাহুর হাঁ। সৃষ্টির এই নৃত্য মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য—যে নৃত্য আনন্দের নাচে মোহ-মদিরকে নিঃশেষে দাহন করে—

মহাদেবের তপোভঙ্গে যেন বিষম বেগে
নন্দী উঠল জেগে,
শিবের ক্রোধের সঙ্গে

উঠল জ্বলে দুর্দাম তার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
নাচের বহ্নিশিখা
নিদয়া নির্ভীকা।
খুঁজতে ছোটে মোহ-মদের বাহন কোথায় আছে
দাহন করবে এই নিদারুণ আনন্দময় নাচে।

কালিদাসের কাব্যগুলি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সে কবিকে কত ভাবে দোলা দিয়া কত রসানুভূতি ও চিন্তা জাগ্রত করিয়াছে আমরা তাহার বিশদ আলোচনা করিলাম। কালিদাসের 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা' এবং 'কুমার-সম্ভব' কবিচিত্তকে এমনভাবে অধিকার করিয়াছিল যে বহুস্থানে অর্থালঙ্কার রূপে এই কাব্যগুলির ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার কবিতার ভাবার্থকেও সম্প্রসারিত করিয়াছেন, রসানুভূতিকেও গভীর করিয়া তুলিয়াছেন। যেমন—

এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,

ভাষায় অতীততীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
(শা-জাহান, বলাকা)

এখানে এই 'মেঘদূতে'র রূপক গ্রহণের ফলে, শা-জাহানের বিদেহী প্রিয়া বিশ্বের অন্তর্নিহিতা সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ প্রতিমার সহিত একযোগে একটি কবিচিত্তের মানস-প্রতিমা হইয়া উঠিয়াছে ; তাহার ভিতর দিয়াই আবার শা-জাহানের প্রেমিক হৃদয় একটি সর্বজনীন কবিচিত্তের মর্যাদা লাভ করিয়াছে, আর এই বিরহি-বিরহিণীর ভিতরকার প্রেম একটা সূক্ষ্ম মহিমা লাভ করিয়াছে মধ্যবর্তী এই সৌন্দর্যের মেঘদূতের দৌত্যে।

'মহুয়া'র 'দূত' কবিতাটির ভিতরে—

ছিনু আমি বিষাদে মগনা
অন্যমনা
তোমার বিচ্ছেদ-অন্ধকারে।
হেনকালে নির্জন কুটীর দ্বারে
অকস্মাৎ
কে করিল করাঘাত,
কহিল গম্ভীর কণ্ঠে, অতিথি এসেছি দ্বার খোলো ;

প্রভৃতি দুষ্যন্তের ধ্যানে মগ্না বিরহিণী কুটীর-প্রাঙ্গণে নিষণ্ণা শকুন্তলা এবং অতিথি দুর্বাশাকেই স্মরণ করাইয়া দিবে। এই দৃশ্য-রচনা কবি যে-কথা বলিতে চান তাহার পটভূমি রূপে সুকুমার ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে।

এখানে-সেখানে গানের ভিতরেও এই জাতীয় রূপক রূপ ও রস উভয় দিক দিয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। যেমন—

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে,—

... ...

হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তা'র মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

(ফাল্গুনী)

রবীন্দ্রনাথের উপরে কালিদাসের 'মেঘদূত' এবং 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের প্রভাবই মুখ্য হইলেও কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের প্রভাবও নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের উপরে কাজ করিয়াছে। কালিদাস ছিলেন ষড়্ঋতুর কবি। এই ষড়্ঋতুর বর্ণনা প্রসঙ্গক্রমে রহিয়াছে অনেক কাব্যের ভিতরে ছড়ান,—আবার একত্রে সাজান রহিয়াছে 'ঋতু-সংহার' কাব্যের ভিতরে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কালিদাসের এই 'ঋতু-সংহারে'র কবি হিসাবে যে একটি বিশেষ রূপ রহিয়াছে সেই 'যৌবনের যৌবরাজ্যে' আসীন যুবরাজ রূপটিও রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায় নাই। 'চৈতালি'র 'ঋতু-সংহার', কবিতার ভিতর দিয়াই কালিদাসের এই বিশেষ রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন এই ষড়্-ঋতুর কবি। এই ষড়্-ঋতুর বর্ণনা এবং বন্দনা যে তাঁহার কাব্য, কবিতা, নাটক, গানগুলির ভিতরেই ছড়াইয়া আছে তাহা নহে, কালিদাসের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও গোটা কাব্য রচনা করিয়া ঋতুর গান করিয়াছেন। 'প্রবাহিণী'র

ভিতরকার 'ঋতু-চক্রে'র এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য এখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের চোখে ষড়্-ঋতুকে দেখেন নাই, সমস্ত বর্ণনার ভিতরেই প্রকাশিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন দৃষ্টি এবং বিচিত্র স্বতন্ত্র রসানুভূতি। কিন্তু তাহা হইলেও এই 'ঋতু-চক্রে'র বর্ণনার ভিতরেও কালিদাস যে রবীন্দ্রনাথের মনের কোণে উঁকি দেন নাই এ-কথা বলা যায় না। তাই দেখি—

বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষণে॥
যে-মিলনের মালাগুলি
ধূলায় মিশে হ'ল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে॥
সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।
মালবিকা অনিমেখে
চেয়ে ছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে॥

(ঋতু-চক্র, প্রবাহিণী।)

কিন্তু সৃষ্টির বুকে এই ঋতু-আবর্তনের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরে একটা নূতন ভাবদৃষ্টি গড়িয়া উঠিতেছিল; ঋতু-বিবর্তন ক্রমে নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দের রূপ পরিগ্রহ করিল। এই ভাবদৃষ্টিরই পূর্ণ পরিণতি রবীন্দ্রাথের 'নটরাজ—ঋতুরঙ্গশালা'য়। এখানে আসিয়া ঋতু-আবর্তনের ভিতর দিয়া পৃথিবী এবং নটরাজ যে কি করিয়া 'কুমার-সম্ভবে'র উমা-মহেশ্বরের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার বিশদ

আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। এই 'ঋতুরঙ্গশালা'র নটরাজের আভাস রহিয়াছে 'ঋতু-চক্র' কাব্যের ভিতরেই। 'ঋতুরঙ্গশালা'র বৈশাখের বর্ণনার সহিত 'ঋতু-চক্রে'র বৈশাখের নিম্নলিখিত বর্ণনাটি মিলাইয়া লইলেই কথাটি স্পষ্ট হইবে।

বৈশাখে হে, মৌনী তাপস কোন্ অতলের বাণী এমন
কোথায় খুঁজে পেলে ?
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি এলো
গভীর ছায়া ফেলে ॥
রুদ্র তপের সিদ্ধি একি ঐ যে তোমার বক্ষে দেখি ?
ওরি লাগি আসন পাতো হোমহুতাশন জ্বেলে।
নিঠুর তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো তোমার
রক্ত নয়ন মেলে।
ভীষণ তোমার প্রলয়সাধন প্রাণের বাঁধন যত যেন
হানবে অবহেলে।
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এযে আশার ভাষা উঠ্‌লো বেজে,
দিলে তরুণ শ্যামলরূপে করুণ সুধা ঢেলে ॥

কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকখানির —বিশেষ করিয়া ইহার চতুর্থ অঙ্কটির (গ্রন্থের প্রথমভাগ দ্রষ্টব্য) রবীন্দ্রনাথেরও মনের উপরে একটা গভীর রেখাপাত করিতে পারিত এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা কালিদাসের এই সার্থক সৃষ্টির আর একটা যুগোপোযোগী রূপান্তর আশা করিতে পারিতাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টিতে কেন যে এ-জিনিসটি ঘটে নাই তাহা আমাদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র 'উর্বশী' কবিতাটিতে আমরা এই

'বিক্রমোর্বশী'র কিছু প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। নারী-সৌন্দর্য এবং বিশ্বসৌন্দর্যের ভিতরে যে স্পষ্ট কোন বিরোধ নাই, বরং নিগূঢ় একটা যোগ রহিয়াছে এ-কথাটি রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার একটা প্রধান কথা। কথাটা কবি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, উর্বশীর অঙ্কনের ভিতর দিয়া ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈদিক যুগের কবিগণের মনে উর্বশীর আদিম পরিকল্পনার ভিতরেই যেন কথাটি নিহিত ছিল। কালিদাস তাহার উপরেই কল্পনার রং চাপাইয়াছেন। রাজা পুরূরবা যে কি করিয়া প্রকৃতির সর্বত্র উর্বশীর রূপ রং এবং চপল লীলাবিভ্রম দর্শন করিয়াছিলেন আমরা পূর্বে তাহার বিশদ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর বর্ণনা

> সুর-সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
> হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী।
> ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
> শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
> তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
> ... ...
> দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
> অয়ি অসংবৃতে।

প্রভৃতি মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে, প্রাচীনের পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথ কত উজ্জ্বল।

উপরে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গির উপরে কালিদাসের যে প্রভাবের কথা বিশদভাবে আলোচনা করিলাম

তাহার ভিতর দিয়া পাঠকের মনে হঠাৎ একটা ভ্রান্তি আসিতে পারে; সে ভ্রান্তি এই যে, দেশ বিদেশের বড় বড় কবিগণের নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যদি এত জিনিস গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাঁহার স্বকীয়তা কোথায় এবং কতটুকু। এই জাতীয় একটা ভ্রান্তির সম্ভাবনা এইজন্য যে, আমরা এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার বিশেষ একটা দিক লইয়াই আলোচনা করিতেছি, কিন্তু তাঁহার সমগ্র প্রতিভার পরিচয় ইহার ভিতরে ফুটিয়া ওঠে নাই, ফুটিয়া উঠিবার কথাও নয়।

পূর্বের আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে, কালিদাসের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহার সংখ্যা অনেক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র প্রতিভার দান লইয়া বিচার করিলে তুলনায় এই পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। অধিকন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষ দিকের আলোচনা তাঁহার 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত সমগ্র কবি-প্রতিভাকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার উপরে কালিদাসের ভাবধারার যে প্রভাবের কথা উপরে আলোচনা করিলাম, ইহার ভিতরেও একটু লক্ষ্য করিলেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য আমরা আবিষ্কার করিতে পারিব। স্বাতন্ত্র্যটুকু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইলে কালিদাসের প্রতিভার সহিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পার্থক্য কোথায় সেই কথাটি একটু বুঝিতে হইবে।

আমরা বাল্মীকি ও কালিদাসের কবি-প্রতিভা লইয়া যখন আলোচনা করিয়াছি তখন দেখিয়াছি, উভয় কবির প্রতিভার ভিতরে একদিকে যেমন ছিল কতগুলি সাধর্ম্য, অপরদিকে আবার ছিল

কতগুলি প্রকাণ্ড ব্যবধান। কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সেই কথা। আমরা এতক্ষণ কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার ঘনিষ্ঠতার কথা আলোচনা করিতে গিয়া উভয় কবির সাধর্ম্যের কথাটাই নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু এই সাধর্ম্য এবং তজ্জনিত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও উভয় কবির প্রতিভার ভিতরে ছিল একটা প্রকাণ্ড মৌলিক ব্যবধান।

আমরা গ্রন্থের পূর্বার্ধে এবং উত্তরার্ধে প্রসঙ্গক্রমে কালিদাসের কাব্য সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছি তাহার ভিতরে দেখিয়াছি, কালিদাস ব্যক্তি-জীবন ও বিশ্ব-জীবনের সহিত যোগ স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন বিশ্ব-জীবনকে যতখানি সম্ভব ব্যক্তি-জীবনের কাছে টানিয়া। বহির্বিশ্বকে তাই তিনি প্রধানতঃ দেখিয়াছেন তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ঘরোয়া দৃষ্টি লইয়া, তাহাকে বর্ণনাও করিয়াছেন এই ব্যবহারিক জীবনের ভাষায়। রবীন্দ্রনাথও এই ব্যক্তি-জীবন ও বিশ্ব-জীবনের ভিতরে নিগূঢ় যোগ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কালিদাসের অনেকখানি বিপরীত উপায়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনটাকেই যতখানি পারিয়াছেন টানিয়া লইয়াছেন বিশ্ব-জীবনের ভিতরে। কালিদাস অসীমকে যতটা পারেন সীমার ভিতরে বাঁধিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সীমাকে যতটা পারেন অসীমের ভিতর মুক্তি দিয়াছেন। সমগ্র বিশ্ব-জগৎকে মানুষের বাস্তব সুখদুঃখ, মিলন-বিরহ, আশা-নিরাশার রঙে রাঙাইয়া দিয়া দূরের জিনিসকে একান্ত কাছের করিয়া তোলাই কালিদাসের বৈশিষ্ট্য; অপরদিকে তথাকথিত বাস্তব জীবনের ছোট খাট যাহা কিছু সকলকে শুধু বিশ্ব-জীবনের নিঃসীমতার রহস্যালোকে

টানিয়া লইয়া তাহাকে অনির্বচনীয় মহিমা দান করাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

কথাটা অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' লইয়া আলোচনা করিলে। কালিদাসের 'মেঘদূতে'র বর্ণনায় দেখিতে পাই, বাহিরের বিরাট্ বিশ্বটা চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসিয়াছে একটি যক্ষ এবং যক্ষবধূর বিরহকে কেন্দ্র করিয়া। সেখানে আকাশ-মেঘ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখী, গন্ধর্ব-কিন্নর সকলই আমাদের অতি কাছে চলিয়া আসিয়াছে ব্যক্তি-জীবনের সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভের লীলাচঞ্চল রূপে। 'কুমার-সম্ভবে'র ভিতরে দেখিতে পাই, বিরাট্ হিমালয়ও আমাদের কত কাছের জিনিস—আপন জিনিস। কখনও বাৎসল্যের ধারা বুকে করিয়া পিতারূপে, কখনও নবযৌবনা 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' উমার প্রেমচাঞ্চল্যের লীলাভূমিরূপে। 'ঋতু-সংহারে'র ভিতরেও দেখি, ষড়-ঋতুর সকল আবর্তন লইয়া বহির্বিশ্ব চলিয়া আসিয়াছে অনন্তযৌবন মানুষের বাসর কক্ষে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভিতরে দেখিতে পাই, তিনি ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিয়া কেবলই মুক্তি খুঁজিয়াছেন; তাই রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূতে'র ভিতরে সবচেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে এই মুক্তির বাণী—প্রেমের মুক্তি এবং তাহার ভিতর দিয়াই ব্যক্তি-জীবনের মুক্তি। তিনি 'মেঘদূতে'র দিন বলিয়াছেন তাহাকে যে-দিনটা মেঘেমেঘে অন্ধকার হইয়া শুধু নিশ্চল হইয়া বসিয়া নাই, যে-দিনটা শুধু উদ্দাম উধাও চলে—আর তাহার চলার সঙ্গে চালাইয়া লয় আমাদের প্রেম, যে-প্রেম তাহার অভিসারে চলিয়াছে 'মানস লোকের অগমপারে' অবস্থিত দয়িতের পানে,—অপূর্ণ হইতে পরিপূর্ণতায়, সীমা হইতে অসীমে।

এই যে সীমার ভিতরে অসীমের আকুতি রবীন্দ্র-প্রতিভার এইখানেই বৈশিষ্ট্য। কালিদাসের ভিতরে আবার এই জিনিসটিই কদাচিৎ মিলিবে। এই বৈশিষ্ট্যের পথেই স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা—শৈশব হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। কালিদাস তাঁহার কবি-প্রতিভার সকল বিরল মাধুর্য এবং চাতুর্য লইয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ বিকাশের পথটি কখনও অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়ান নাই, কালিদাসের সকল দানও কবির এই পথেরই পাথেয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা গ্রন্থের প্রথম ভাগে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশ্ব-প্রকৃতির বর্ণনা লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সেই আলোচনার ভিতর দিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈদিক-সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের কবিগণ সকলের প্রাকৃতিক বর্ণনার ভিতর দিয়া একটি বিশেষ ভারতীয় মনের পরিচয় পাই। বিভিন্ন যুগের সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা সেই একই মনের নানা বিবর্তন বা পরিণতি দেখিতে পাই। আমাদের মনে হয়, এই ক্রম-পরিণতির ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অখণ্ড গতিতেই চলিয়া আসিয়াছে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনও বিশেষ কবিদ্বারাই যে বেশী বা সাক্ষাৎভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন তাহা বলা যায় না, এখানে বৈদিক কবি, উপনিষদের কবি বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতি সম্মিলিত ভাবে রবীন্দ্র-নাথের কবিমানসে বাসা বাঁধিয়াছেন। কথাটি অন্যরূপ করিয়া বলা

যাইতে পারে, অতীতের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবি-পুরুষের যে গভীর যোগ তাহার পরিচয় রহিয়াছে রবীন্দ্র-নাথের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাবদৃষ্টির ভিতরেও।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টিটি তাঁহার জীবন-দর্শনের সঙ্গেই নিবিড়ভাবে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের প্রধান কথা একটা অখণ্ডবোধ। কালের কোন্ অন্ধকার গহন গহ্বর হইতে যে এই জীবনের ধারা প্রথম উৎসারিত হইয়াছে তাহা কিছুই বলা যায় না,—কিন্তু কবি একথাটা গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন যে এ-জীবন তাহার সকল জন্ম-জন্মান্তরের অতীত ইতিহাস, তাহার বর্তমানও ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনার ভিতর দিয়া অখণ্ড। ব্যক্তি-জীবনের এই অখণ্ডতাবোধের সহিতই যুক্ত রহিয়াছে বিশ্ব-জীবনের অখণ্ডতা বোধ। বিশ্বজীবনের তুচ্ছতম বস্তু বা ঘটনাটিও একান্ত বিচ্ছিন্ন কোন সত্তা বা ক্রিয়া নহে; সকল সত্তা ও ক্রিয়া জুড়িয়া চলিয়াছে বিশ্বজীবনের একটি অখণ্ড পরিণতি নিরন্তর প্রকাশের পথে। এই ভাবদৃষ্টি লইয়া প্রকৃতির দিকে তাকাইলে প্রকৃতির ভিতরে শুধ্ যে জড় ও চেতনের কোন ব্যবধানের প্রশ্ন ওঠে না তাহা নহে,—'আমি'র সহিত 'অপরে'রও কোন ভেদের প্রশ্ন থাকে না,—এইখানেই বিশ্বজীবনের ভিতরে অদ্বয়যোগ।

বিশ্ব-জীবন সম্বন্ধে এই যে অদ্বয়দৃষ্টি ইহাকে আমি পূর্বে বলিয়া বলিয়া আসিয়াছি বিশেষরূপে ভারতীয় দৃষ্টি। সেই বৈদিক যুগ হইতে আমরা জানি—প্রকৃতির যাহা কিছু সকলের পশ্চাতে রহিয়াছেন দেবতা, উপনিষদ্ বলিয়াছেন 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'—যে এখানে নানাকেই দেখে—অর্থাৎ সৃষ্টির যাহা কিছু

সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়াই দেখে, সে মৃত্যুর লোক—মৃত্যুকেই পায়। রামায়ণে আমরা এই অদ্বয়দৃষ্টির একরূপ দেখিয়াছি, কালিদাসের কাব্যে আর এক রূপ দেখিয়াছি—আর এই সকলের একটি বিশেষ পরিণতি আসিয়া দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের ভিতরে। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপেও একটা রোম্যান্টিক অদ্বয়বাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল,—তাহার সহিতও রবীন্দ্রনাথের মনের মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই অদ্বয়বাদের সহিত আশৈশব এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত যে এখানে পাশ্চাত্য-প্রভাবের প্রশ্ন গৌণ হইয়া যায়। ভারতীয় মনে এই অদ্বয়যোগের সত্যটি যুগে যুগে এতরূপে আবর্তিত হইয়া আসিয়াছে যে আজ আর লেখক বা পাঠক কাহারও নিকটে এ-কথাটা একটা নূতনের আলোক আনে না, আমরা ইহাকে গ্রহণ করি অতি সহজভাবে।

এই অদ্বয়দৃষ্টির ফলে পৃথিবী দেখা দিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে সত্যকারের এক 'ধরিত্রী' মূর্তিতে—'নিত্য-নিদ্রাহীন মহাজননী'রূপে। 'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় এই ধরিত্রীকে দেখিতে পাই—

দিবা রাত্রি অহরহ
লক্ষ কোটি পরাণীর মিলন, কলহ,
আনন্দ-বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জন,
অযুত পন্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ—

ইহার সকলকে বুকে করিয়া এক মাতৃমূর্তিতে; এই জননী বিরাজ করেন পত্রপুষ্পজালে বিবিধবর্ণে বিচিত্রিত যবনিকার অন্তরালে; এবং

—তারি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্যম্পশ্য, নিত্য চুপে চুপে
ভরিছে সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে ;—

এই ধরিত্রীর বুকে 'অহল্যা' যে কন্যার মত পাষাণরূপে এক হইয়া গিয়াছিল—সে যে ধরিত্রীর বুকে বুক মিলাইয়া দিয়া দীর্ঘ দিবানিশি জননীর বিচিত্র অনুভূতিকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল ইহা ত অতি সহজ কথা। আবার শাপান্তে অহল্যা যেদিন পুনরায় মানবী রূপে দেখা দিল সেদিন সে 'ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মত সুন্দর সরল শুভ্র'। এই যে মানবীর পাষাণীরূপে ধরণীর বুকে মিশিয়া যাওয়া এবং সেখান হইতে পাষাণীর মানবী রূপে ফিরিয়া আসা আমাদের কাছে ইহার ভিতরে কোথায়ও কোন কষ্ট-কল্পনা নাই ; কারণ আমরা বহু পূর্বে ধরণী-কন্যা সীতাকে মানবী রূপেই সহজভাবে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইয়াছি ; পাষাণ হিমালয়ের কন্যা উমার লীলা-চাঞ্চল্য এবং প্রেম-তপস্যায় মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি। বাল্মীকির সীতার সহিত রবীন্দ্রনাথের এই অহল্যার সোদরত্ব অতি স্পষ্ট ; সীতাকেও বাল্মীকি-রামায়ণে আমরা পাইয়াছিলাম 'ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মত সুন্দর সরল শুভ্র'। অহল্যা ধরিত্রী হইতে যখন পৃথক হইয়া মানবী রূপ ধারণ করিয়াছে তখনও সে ধরিত্রী হইতে অনেক দূরে সরিয়া যায় নাই,—তখনও—

যে শিশির প'ড়েছিলো তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।

যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যাম শোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হ'তে—পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ, সরস, ঘন—এখনো তাহারা
লগ্ন হ'য়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

বাল্মীকির রামায়ণেও দেখিতে পাই, সীতা যেদিন প্রথম মেদিনী ভেদ করিয়া হলক্ষতমুখে জাগিয়াছিল সেদিন তাহার সমস্ত দেহে বিকীর্ণ হইয়াছিল মাঠের শুভ ধূলিকণা,—যেমন করিয়া শিশু বালিকার দেহে মাখান থাকে শুভ পদ্মরেণু।—

পদ্মরেণুনিভৈঃ কীর্ণৈঃ শুভৈঃ কেদারপাংশুভিঃ ॥

'মানসী' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সহিত মানুষের এই নিবিড় নাড়ী-বন্ধনের কথা প্রাচীন উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া কিছুটা কল্পনার আশ্রয়ে বলিয়াছেন; কিন্তু 'সোনার তরী'তে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিজের ব্যক্তি-পুরুষটিই এই জননীর সহিত তাঁহার যোগকে স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই অনুভূতির সহিত কোন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিরোধ নাই; সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যকে স্বীকার করিয়াই তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট্ জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে

মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবন-স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি
দিক্ হ'তে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি'।

(সমুদ্রের প্রতি, সোনার তরী)

'বসুন্ধরা' কবিতার ভিতরে পৃথিবীর সহিত কবির ঘনিষ্ঠতম যোগের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ধূলিমাটির পৃথিবীর সহিত কবির ত শুধু একদিনের এক জীবনের পরিচয় নয়, এই পৃথিবীর ধূলিকণার সঙ্গে—তাহার অন্তর্লীন প্রাণশক্তির সঙ্গে—কবির দেহ-প্রাণ বিলীন হইয়াছিল একটা অজ্ঞাত সম্ভাবনা রূপে,—সেই সম্ভাবনা রূপে ধরণী মায়ের সহিত এক হইয়া কবি ত পৃথিবীর সহিত অনন্ত গগনে কত দিন কত রাত্রি বিরাট্ সবিতৃমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন; পৃথিবীর দেহ-প্রাণের সহিত অভেদরূপে জড়িত কবির সেই দেহ-প্রাণের উপরেই কত দিন উঠিয়াছে কত তৃণ, ফুটিয়াছে কত ফুল—তরুরাজিপত্র-ফুলদলের সহিত ছড়াইয়াছে কত গন্ধরেণু,—

তাই আজি
কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি'
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে

কী জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ, ...
... ...
তাই আজি কোনো দিন, শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র 'পরে,
নারিকেল দলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিলো মোর সর্বব্যাপী হ'য়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লব নিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়।

'চৈতালি'র 'মধ্যাহ্ন' কবিতায়ও দেখি সেই একই স্মরণ—

ফিরিয়া এসেছি যেন আদিজন্মস্থলে
বহুকাল পরে, ধরণীর বক্ষতলে
পশুপাখিপতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে, জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ॥

এই সকল কথাই রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার 'ছিন্নপত্রে'র অন্তর্গত দু'একখানি চিঠিতে।—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলুম,

যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য-কিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাকত—আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত ক'রে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে প'ড়ে থাকতুম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনী শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্রে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠচে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর ক'রে কাঁপ্‌চে।"

মাটির সহিত এই যে তাঁহার প্রত্যেকটি অণুপরমাণুর—প্রত্যেকটি প্রাণস্পন্দনের যোগ তাহাকে কবি এত নিবিড় করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, মাটির সঙ্গে এই বিচ্ছেদ তাঁহাকে বহুসময়ে বেদনায় পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে; তিনি ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিয়াছেন, মানুষের জীবন তাঁহাকে পৃথিবীর স্নেহময় কোল হইতে নানাপাকে বহুদূরে সরাইয়া আনিয়াছে; মানব-জীবন তাঁহাকে মাটির কোল হইতে যত দূরে টানিয়া লইতে চাহিয়াছে কবি ততই বেদনা বোধ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক মুহূর্তে তাঁহার মনে হইয়াছে—

> বাঁধন ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
> সইবে না এই ছাড়াছাড়ি, (মাটির ডাক, পূরবী)

এবং কবিও এই জন্য সারাজীবনই ফিরিয়া ফিরিয়া আপন মাকে চাহিয়াছেন। ধরণীর দুহিতা সীতাও একবার এমনই করিয়াই নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষের সংসারে আসিয়াছিল ; কিন্তু সে বেশীদিন এই বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে নাই ; সে হয়ত দেখিয়াছিল, প্রকৃতির কোল হইতে মানুষ তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতির নামে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছে ; সে তাই আবার লুটাইয়া পড়িয়াছে মায়ের বুকে—ফিরিয়া গিয়াছে ধরণীর অন্তঃপুরে। সীতার ধরণীর সহিত এই নাড়ীর যোগের কথা বিংশ শতাব্দীতে আমাদের কাছে যেন কাহিনী-রূপে পর্যবসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সত্য আবার জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ; তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন গভীর বেদনায়—

বাঁধন ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,—।

এই জন্যই দেখিতে পাই, পৃথিবীর প্রত্যেকটি পরিবর্তন, তাহার সকল বেশ-বদল—ঋতু-পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তাহার প্রাণস্পন্দন নিরন্তন দোলা দিয়াছে কবির চিত্তকে—সেই দোলার ভিতর দিয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন ধরণীর আকর্ষণ—তিনি শুনিতে পাইয়াছেন ধরণীর স্নেহময় অন্তঃপুরে কবির সাদর আহ্বান। তাই—

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত ক্ষেপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগতো পুলক কি মন্তরে

কচি পাতার প্রথম কল-কথায়,
সেদিন মনে হ'তো কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়-কুঞ্জ-ছায়ে ;
তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে।
আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-ক্ষেতে
সূর্য-ওঠার রাঙা-রঙীন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠতো দুলে
কচি ধানের খাম-খেয়ালি খেলায়
সেদিন আমার হ'তো মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবী ;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তা'রি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি !

(মাটির ডাক, পূরবী)

পৃথিবীর এই মাতৃমূর্তির আমরা প্রথম দেখা পাইয়াছি বেদের ভিতরে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ঋক্‌বেদের বহু ঋকে দ্যাবা-পৃথিবীর স্তব রহিয়াছে এবং সেখানে পৃথিবীকে মাতা বলিয়াই সর্বত্র বর্ণনা করা

হইয়াছে। অন্যত্রও প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাৎ'—মাতা পৃথিবী যেন আমাদিগকে নিগ্রহ বুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন (৫।৪২।১৬)। পৃথিবীর এই মাতৃমূর্তি সর্বাপেক্ষা পূর্ণ এবং সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে অথর্ববেদের পৃথিবী-বর্ণনায়। সেখানে বলা হইয়াছে—

সত্য, বৃহৎ, ঋত, উগ্র, দীক্ষা, তপঃ, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে; সেই পৃথিবী যাহা কিছু ভূত—যাহা কিছু ভব্য—সকলের অধীশ্বরী (পত্নী)—সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করুক।[১] এই পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছে কত উচ্চতা—কত গমনশীলতা—কত সমতল,—নানাবীর্য কত ওষধি (১২।১।২); ইহার ভিতরে আছে সমুদ্র—আছে সিন্ধু—আছে জল—আছে অন্ন—আছে কৃষিভূমি; ইহার ভিতরে কর্মচঞ্চল হইয়াছে তাহারা যাহারা প্রাণবন্ত—যাহারা চলে; সেই ভূমি আমাদিগকে প্রথম পেয় দান করুক (১২।১।৩)। এই পৃথিবীতে আমাদের পূর্বজনগণ পূবকালে নিজেদের বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল (যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে, ১২।১।৫); এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা, বসুন্ধরা—ইহাই প্রতিষ্ঠাস্থল; ইহা সুবর্ণবক্ষা, যাহা কিছু চলমান তাহাদের নিবেশনী; এই ভূমি বৈশ্বানর অগ্নিকে বহন করে; ইন্দ্র ইহার ঋষভ—এই ভূমি আমাদিগকে সম্পদ্ দান করুক।[২] এই পৃথিবীর অমৃত হৃদয় পরম ব্যোমে সত্যের

(১) সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তী।
স নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু॥ (১২।১।১)

(২) বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু॥ (১২।১।৬)

দ্বারা আবৃত রহিয়াছে (যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্ সত্যেনাবৃতমমৃতং পৃথিব্যাঃ, ১২।১।৮)। এই পৃথিবীর উপরে জলধারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রিদিন সমানে অপ্রমাদে ক্ষরিত হইতেছে—সেই ভূমি আমাদিগকে দুগ্ধ দান করুক—আমাদিগকে ভাস্বর করিয়া তুলুক (১২।১।৯)। এই ভূমি আমাদিগকে সেই ভাবেই দুগ্ধ দান করুক যেমন মাতা দুগ্ধ দান করে তাহার পুত্রকে (স নো ভূমির্বি সৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ, ১২।১।১০)। হে পৃথিবি, যাহা তোমার মধ্যদেশ, যাহা নাভী—যাহা কিছু বল তোমার দেহ হইতে জাত হইয়াছে—তাহাতেই আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর, আমাদিগকে পবিত্র কর—হে মাতা ভূমি, আমি পৃথিবীর সন্তান।[১] বিশ্বের প্রসবিত্রী—ওষধিগণের মাতা ধ্রুবা ভূমি এই পৃথিবী, ধর্মের দ্বারা ধৃতা এই পৃথিবী—শিবা এবং সুখদা এই পৃথিবী—এই পৃথিবীতে আমরা সুখে বিচরণ করিব।[২] যে গন্ধ তোমা হইতে সম্ভূত, ওষধি যে গন্ধকে বহন করে, জল যে গন্ধকে বহন করে—যে গন্ধ গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণ ভোগ করে,—সেই গন্ধের দ্বারা হে পৃথিবী, তুমি আমাকে সুরভি করিয়া তোল, কেহ যেন আমাদিগকে দ্বেষ না করে।[৩] তোমার যে গন্ধ পুষ্করে (নীলোৎপলে)

---

(১) যৎ তে মধ্যং পৃথিবী যচ্চ নভ্যং যাস্ত উর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ।
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ॥
(১২।১।১২)

(২) বিশ্বস্বং মাতরমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।
শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্বহা॥ (১২।১।১৭)

(৩) যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সম্বভূব যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ ভেজিরে তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥ (১২।১।২৩)

প্রবেশ করিয়াছে, সূর্যের বিবাহে যে গন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল—অমর্ত্যগণ প্রথমে যে গন্ধ (গ্রহণ করিয়াছিল), হে পৃথিবি, সেই গন্ধের দ্বারা আমাকে সুরভিত কর,—আমাদিগকে কেহ যেন দ্বেষ না করে।[১] এই পৃথিবীতে আছে শিলা, আছে ভূমি, আছে প্রস্তর—আছে ধূলি; হিরণ্যবক্ষ সেই পৃথিবীকে করি নমস্কার (১২।১।২৬)। হে পৃথিবি, তোমার গ্রীষ্ম, তোমার বর্ষা সকল, তোমার শরৎ-হেমন্ত, শিশির-বসন্ত—এই তোমার সুনিয়ত ঋতুগুলি—এই তোমার দিনরাত্রি—ইহারা সকলেই আমাদের উপর রস বর্ষণ করুক। যাহাতে সকল অন্ন,—যাহাতে ব্রীহিযব,—যাহার এই পঞ্চ মানব—পর্জন্যপত্নী বর্ষা-পুষ্ট সেই ভূমিকে নমস্কার (১২।১।৪২)। তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য তোমার ভূমিতে যে সভা, যে মিলন, যে সমাবেশ—আমরা সে সম্বন্ধে চারু বাক্যই বলিব (১২।১।৪৬)। যাহা বলিব তাহা মধুময় বলিব; যাহা কিছু দেখিব তাহাই আমার চিত্ত জয় করিবে (১২।১।৫৮), হে মাতা পৃথিবি, তুমি মঙ্গল সহ আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, দ্যুলোকের সহিত, হে কবি, আমাকে শ্রী এবং সম্পদে প্রতিষ্ঠিত কর।

এই বৈদিক গাথা হইতে রবীন্দ্রনাথের গাথা কত পৃথক্—আবার কত এক! বেশ বোঝা যায়, একটি মনই বহু যুগের বিবর্তনের ভিতর দিয়া পুরাতনের বৃন্তে কত নূতন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে!

---

(১) যস্তে গন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ যং সঞ্জভ্রুঃ সূর্যায়া বিবাহে।
অমর্ত্যাঃ পৃথিবি গন্ধমগ্রে তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥ (১২।১।২৪)

(২) গ্রীষ্ম স্তে ভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।
ঋতবস্তে বিহিতা হায়নীরহোরাত্রে পৃথিবি নো দুহতাম্॥ (১২।১।৩৬

রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগের কাব্যের ভিতরে দেখিতে পাই, সৃষ্টির সকল রূপমুগ্ধতা, রসমাধুর্য, সকল রহস্যবোধ একটা অধ্যাত্ম অনুভূতি এবং বিশ্বাসের সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছে; তাহার ফলেই কবি নিজের ভিতরে অনুভব করিয়াছেন 'জীবন-দেবতা'কে, আর সমগ্র বিশ্বে অনুভব করিয়াছেন এক বিশ্ব-দেবতার লীলা। পূর্বেই বলিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের এই অধ্যাত্মদৃষ্টি এবং তাঁহার কবিদৃষ্টি এই উভয়ের ভিতরে কোথাও কোন অমিল বা বেসুর নাই; কারণ তাঁহার জীবনের যাহাকিছু সমস্তেরই মূল উৎস ছিল এক, তাই তাঁহার কবিজনোচিত রসানুভূতি এবং তাঁহার ঋষিজনোচিত অধ্যাত্ম অনুভূতিও ছিল এক। এই অধ্যাত্ম দৃষ্টি লইয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আর মানুষের সঙ্গে কোথাও যে একটুকু অমিল নাই তাহার কারণ, ইহারা সকলেই সেই পরম এক হইতে জাত—সেই পরম একের লীলা-বিভূতিরূপে সেই একেরই প্রকাশ।

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গ-মালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে;—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাঁটায়। (নৈবেদ্য)

রূপের ভিতরে সৃষ্ট হইবার পূর্বে বস্তুর রূপহীন একটা অখণ্ড সত্তা আছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে একটি ব্যক্তিজীবনে রূপ লইবার পূর্বে তাঁহারও এইজাতীয় একটি রূপহীন সত্তা ছিল, সেই সত্তায় তিনি মিলিয়া ছিলেন বিশ্ব-সৃষ্টির সহিত—ইহাই কবির 'প্রাগ্‌ভাব'। আবার এই বিশ্বসৃষ্টি জুড়িয়া চলিয়াছে এক অদ্বয় প্রাণ-শক্তি বা সৃজনী-শক্তির অনাদি অনন্ত লীলা। কবি এ জীবনে অনুভব করিতেছেন, এই বিশ্বব্যাপী সৃজনী-শক্তির সহিত তাঁহার ব্যক্তিপুরুষের যে লীলা তাহা শুধু কোনও একটি বিশেষ জীবনের নহে;—তাহা শুধুমাত্র জন্মজন্মান্তরেরও নহে—তাঁহার 'প্রাগ্‌ভাবে'র ভিতরেও কতযুগ ধরিয়া চলিয়াছে এই লীলা।

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

(উৎসর্গ)

এই যে বিশ্বব্যাপী এক প্রাণ-শক্তি বা সৃজনী-শক্তির লীলা ইহার অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের মূল অনুভূতি এবং এই অনুভূতির প্রকাশ রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ় জীবনের সকল গদ্য রচনায়—কবিতায় এবং নাটকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ কথাটা এতই প্রধান যে তাহা লইয়া কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বাল্মীকি-কালিদাস প্রভৃতির ভিতর দিয়া একটা অদ্বয়দৃষ্টিই যে ভারতীয় মনে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অদ্বয়দৃষ্টির উপরে প্রত্যক্ষ প্রভাব উপনিষদের। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ কোনও যুক্তিতর্কের উপরে গ্রথিত দার্শনিক মতবাদ নহে, সমস্ত ব্রহ্মবাদের এবং সেই ব্রহ্মবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত অদ্বয়বাদের পশ্চাতে একটি গভীর কবিদৃষ্টি রহিয়াছে, সেইখানেই উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথেরও গভীর যোগ। উপনিষদের বাণীই একদিন

> তপোবন-তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
> ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
> অগ্নিতে, জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
> বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
> অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য।
>
> (নৈবেদ্য)

> যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
> যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ।
> য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
> তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

এই উপনিষদ্ই বলিয়াছেন,

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।

'একদেব সর্বভূতের মধ্যে গূঢ় হইয়া আছেন, সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা।' ঈশা ব্যাস্তমিদং সর্বং—'যাহা কিছু সবই সেই পরম পুরুষের দ্বারা ব্যাপ্ত'; তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং—তিনিই প্রকাশিত হইতেছেন, তাঁহার ভাস বা দীপ্তি লইয়াই আর সকলে তাঁহার পরে প্রকাশিত হইতেছে; তাঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, ইন্দ্র, বায়ু, যম প্রভৃতি তাঁহার ভয়েই ধাবিত হইতেছে; যতো বা ইমানি ভূতানি যায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জাত হইতেছে, যাহা দ্বারা জাত সকল বাঁচিয়া আছে—যাহাতে আবার প্রত্যাগমন করিয়া অভিপ্রবিষ্ট হইতেছে।

এতস্মাজায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুজোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

ইহা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি জাত হয়, ইহাতেই আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের 'ধারিণী' পৃথিবী জাত হয়।

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষং
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।

ইহার ভিতরে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং মন ও সমুদয় প্রাণ আশ্রিত রহিয়াছে। এই পুরুষই 'সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি'—সকলকে আবৃত করিয়া ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান।

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্॥

বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া স্বমহিমায় অবস্থান করিতেছেন সেই এক;

সেই পুরুষের দ্বারাই ইহা সব পূর্ণ। উপনিষদের ঋষিকবিগণের এই উদার বাণী রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে গভীর প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল, ঋষিকবিগণের সুরে তিনিও তাই নিজের সুর মিলাইয়া দিয়াছিলেন।

মধ্য জীবনে কোথায়ও কোথায়ও এই সর্বব্যাপী 'এক'কে কবি স্পষ্ট ব্রহ্মরূপেই স্বীকার করিলেও প্রৌঢ় জীবনে এবং বৃদ্ধ জীবনে এই 'এক'কে কবি আর কোনও স্পষ্ট ধর্মবিশ্বাসের কোঠায় টানিয়া আনেন নাই—'এক' সেখানে বিশ্বসৃষ্টির গূঢ় রহস্যের অন্তরালে একটি লীলা-চঞ্চলা সৃজনী-শক্তি সৃষ্টি-প্রবাহের ভিতর দিয়া নিরন্তর নিজেকে প্রকাশিত করিয়া যাওয়াই তাহার স্বভাব—অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় সেই সৃজনী-শক্তির রূপ এবং স্বরূপ উভয়ই।

প্রকৃতির সহিত কবির দেহ-মন-অন্তরাত্মার এই গভীর যোগ আবার ঘনীভূত রূপে-রসে দেখা দিয়াছে কবির 'বনবাণী'র ভিতর দিয়া। কবির চিত্তে ধরা দিয়াছিল বনের যে বাণী, তাহারই প্রকাশ এই 'বনবাণী'। বনের প্রাণী হইল মুখ্যতঃ বৃক্ষগুলি তাহারা ধরণীর প্রাণ-রসেরই মূর্ত বিগ্রহ, তাই তাহারা প্রাণী ; তাহারা বোবা থাকে তাহাদের নিকট—জীবন রসের গম্ভীর রহস্য যাহারা বুঝিতে পারে না—তাহাদের বাণী অমোঘ রূপে দেখা দেয় জীবনের রসবেত্তার কানে ও প্রাণে। 'বনবাণী'র ভূমিকায় তাই কবি বলিয়াছেন,—

"আমার ঘরের আশে পাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীব জগতের আদিভাষা, তা'র ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে ; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয় ;

মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়, তা'র কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।

"ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা'হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।"

গাছের এই বাণী যে প্রথম কান পাতিয়া শুনিয়াছিলেন ভারত-বর্ষের আরণ্যক ঋষিরা এ-কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এই ভূমিকায়। সেই আরণ্যক ঋষিরাই বলিয়াছিলেন, গাছের এই ফুলে ফলে পল্লবে দেখা যায় "এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি।" তাঁহারাই প্রথম পাইয়াছিলেন গাছের বাণী—"যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"—যাহা কিছু সকল প্রাণে অধিষ্ঠিত হইয়া চলিতেছে—প্রাণ হইতেই সকল নিঃসৃত! সেই আরণ্যক ঋষিরা "গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, "কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ"—প্রথম-প্রাণ তা'র বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি সেই বেগ থাম্‌তে চায় না, রূপের ঝর্‌না অহরহ ঝরতে লাগলো, তা'র কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা!"

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁহার বাস-ভবন, উপাসনা-মন্দির, বিদ্যালয় যাহা কিছু সমস্তরই চারিদিকে গাছ দিয়া ভরিয়া দিয়াছেন; তাহার কারণ, তিনি শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনকে। এই তপোবনের বাণী গাছের বাণী —সর্বব্যাপী প্রাণ-লীলার অফুরন্ত নিত্য নূতন বাণী। এই বাণীর সন্ধান হয়ত একদিন পাইয়াছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যিনি বীরভূমের

একটা মরুপ্রান্তর সদৃশ মাঠের ভিতরে তাঁহার ধ্যানের আসন পাতিয়াছিলেন একটি ছাতিম বৃক্ষের তলে। গাছের ভিতরে মৌন-মুখরতায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে যে প্রাণের ভাষা—উহাই প্রাণময়ের ভাষা, এই ভাষাই মহর্ষির প্রাণে আনিয়াছিল মুক্তির বাণী—এই ভাষার ভিতরেই রবীন্দ্রনাথও লাভ করিয়াছেন মুক্তির বাণী। যাহাতে এই বাণী স্পর্শ করে প্রত্যেকটি বালকের প্রাণ এই জন্যই তিনি ছাত্রদের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন শালবনে-ঘেরা তাম্রকুঞ্জে।[১] এই শালবনের মর্মর—তাম্রকুঞ্জের মুকুল-গন্ধ, রৌদ্রতপ্ত ঘাসের গন্ধের সঙ্গে 'মাটির মেঠো সুর'—আর তারই সঙ্গে পাখীদের কাকলী—যাহাতে শুধু সুর আছে—ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসানের অর্থ-ভরা কথা নাই—এই সকল মিলিয়া বিশ্বজীবনের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি জীবনের গভীর যোগ আনয়ন করে, সেই গভীর যোগই বহন করে 'একে'র বাণী, সেই 'একে'র উপলব্ধিতেই চিত্তের মুক্তি। শান্তি-নিকেতনের আম্রবনের সঙ্গে কবির ছিল তাই একটা আশৈশব আত্মীয়তা সেই আত্মীয়তাকেই তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন জীবনের অপরাহ্ণে 'আম্রবন' কবিতায়।...

(১) আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতি মাঝে, উর্ধ্বে তুলি' ব্যগ্র শাখা তার
শরৎ প্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে; লভিল মজ্জার মাঝে
সে মহা আনন্দ যাহা পরিব্যাপ্ত লোক লোকান্তরে,
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে, ফুটোন্মুখ
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে স্বত উৎসারিত।
(প্রান্তিক)

স্থদূর জন্মের যেন ভুলে-যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর
গন্ধে তব র'য়েছে সঞ্চিত,
ওগো আম্রবন।
যেন নাম-ধ'রে কোন্ কানে কানে গোপন মর্মর
তাই মোরে করে রোমাঞ্চিত
আজি ক্ষণে ক্ষণ।
আমার ভাবনা আজি প্রসারিত তব গন্ধ সনে
জনম মরণ-পরপার,
ওগো আম্রবন,
যেথায় অমরাপুরে স্থন্দরের দেউল-প্রাঙ্গণে
জীবনের নিত্য আশা সন্ন্যাসিনী, সন্ধ্যারতি-ক্ষণে
দীপ জ্বালি' তা'র
পূর্ণেরে করিছে সমর্পণ।

'বনবাণী'র অন্তর্গত 'বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে'র ভিতরে বৈদিক ঋষিগণ এবং প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নূতন মন্ত্র এবং সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। প্রথমেই দেখি 'বর্ষা-মঙ্গল গান'—সে বর্ষামঙ্গল গানের স্থরে অথর্ববেদের 'বর্ষা'র গানের স্থরের ঝঙ্কার লাগে নাই এমন নহে (অথর্ব ৪।১৫ ; এই গ্রন্থের প্রথমভাগে ১১২-১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানে যে কবি বলিলেন—

দহন-শয়নে তপ্ত ধরণী প'ড়েছিলো পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃত বারির বার্তা।

ইহার আভাস ঋক্‌বেদের ইন্দ্রস্তবেও বহুস্থানে দেখিতে পাই।[১] তারপরে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম প্রভৃতির নিকটে শিশুবৃক্ষের জন্য যে প্রার্থনা জানান হইয়াছে সে প্রার্থনা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছড়াইয়া আছে বেদের বহু গাথায়। আশ্রম-প্রাঙ্গণে তরুণ অতিথি বালক-তরুদলকে সাদর আহ্বান জানান হইয়াছে—

আয় আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে
চল আমাদের ঘরে চল্‌।
শ্যাম-বঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কল-সঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল॥

আশ্রম-তরুর এই শিশুরূপের মধুর পরিচয় আমরা পাইয়া আসিয়াছি রামায়ণে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে (প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য), কালিদাসের রঘুবংশে, কুমার-সম্ভবে এবং শকুন্তলা নাটকে।

পৃথিবীর সহিত নাড়ীর বন্ধন এবং বৃক্ষের সহিত সোদর আত্মীয়তা কবি তাঁহার শেষদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই; নানাভাবে সেই আকর্ষণকে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার গোধূলির কাব্য-সমূহের ভিতরেও। 'পরিশেষে'র 'সান্ত্বনা,' 'বোবার বাণী' প্রভৃতি কবিতার ভিতরেও রহিয়াছে ইহার মধুর পরিচয়।

(১) ঋক্‌ (১।৩৩।১১; ১।১৬৭।৩)।

পশ্চিম গগনে হেলিয়া-পড়া রবির দীপ্তি উজ্জ্বল মহিমা লাভ করিয়াছিল 'পত্রপুটে'। সেখানে কবি তাঁহার সেই চিরপরিচিত পৃথিবীর সমগ্র পরিচয় একসঙ্গে স্মরণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার
তোমার যে-মাটির তলায়
তাকে আজ স্পর্শ করি, উপলব্ধি করি সর্ব দেহে মনে।
(পত্রপুট, তিন)

সেই উপলব্ধি লইয়াই 'অবনত দিবাবসানের বেদীতলে' কবি শেষ প্রণাম রাখিয়া গিয়াছেন পৃথিবীর পদপ্রান্তে -

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি॥ (ঐ)

উপনিষদের ঋষিগণের 'দর্শন' বা উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত হইয়া এই গ্রন্থে কবির 'দর্শন' গভীরতার সহিত একটা বলিষ্ঠতাও লাভ করিয়াছে। এই বলিষ্ঠতার পরিচয় শুধু ভাবে নয়, এখানকার ভাষাতেও। রবীন্দ্রনাথের বহু সময়কার বহু লেখার ভিতরে একটা বৈদিক বিশ্বাস প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে,—আলোই সৃষ্টির বাহন; এই আলোর পাখায় ভর করিয়া ভাসিয়া আসিতেছে সৃষ্টির স্বপ্ন—সেই আলো-বাহিত স্বপ্ন বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে অসংখ্য বস্তুসত্তায়। সেই আলো চেতনার ভিতর দিয়া লাভ করিতেছে জ্যোতির্ময় রূপ; তখন তিরোহিত হয় স্থূল দেহভার, অপসৃত হয় 'অন্ধকার রাতের

নানা ব্যর্থ ভাবনার অত্যুক্তি,' তখন অনুভবে আসে নিজের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুর তেজোময় অগ্নিকণার রূপ—এই তেজোময় রূপের ভিতর দিয়া বিশ্ব-সবিতার সঙ্গে ও পৃথিবীর সঙ্গে অদ্বয়যোগ।

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম-সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তা'র উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ ক'রে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।

... ...

তখন মনে পড়ে, সবিতা,
তোমার কাছে ঋষি-কবির প্রার্থনা মন্ত্র,—
যে মন্ত্রে বলেছিলেন,—হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত কর সেই আবরণ।
আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ,
বলি,—হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন,—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু পরমাণু,
তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।
আমার অন্তরতম সত্য

আদিযুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে—
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন
সেই সত্য তোমারি।[১] (পত্রপুট, দশ)

ধর্মের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে 'ব্রাত্য, জাহিহারা'; বিধান-বাঁধা মানুষ তাঁহাকে মানুষ করে নাই, শাস্ত্রের প্রাচীর-ঘেরা শাণ-বাঁধান পথে তাঁহার গতি ছিল না, পূজামন্দিরের রুদ্ধদ্বারে তিনি সত্যের সন্ধান করেন নাই, মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই কোন আচারশীল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কাছে; মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন পৃথিবীর নিকট হইতে—

সকল বেড়ার বাইরে
নক্ষত্রখচিত আকাশতলে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর-জনার মিলন-বিরহের
বেদনা-বন্ধুর পথে।

পৃথিবীর সেই মন্ত্র অগ্নির মন্ত্র—আলোর মন্ত্র—প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্র;—এই আলোর মন্ত্র লইয়া রীতিবন্ধনের বাহিরে সারা জীবন চলিয়াছে কবির আত্ম-বিস্মৃত পূজা,—তাই তিনি ব্রাত্য, তিনি জাতিহীন—পংক্তিহীন।

---

(১) হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মান্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,
যো ২সাবসৌ পুরুষঃ সো ২হমস্মি॥ (ঈশ, ১৫-১৬)

বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে—
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারিকেল শাখার ঝালর-ঝোলা
আমার বাগানটিতে,
ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি
শুনেছি আমার রক্ত-চাঞ্চল্যে।
সেই ধ্বনি আমার অনুসরণ করেছে
জন্মপূর্বের কোন পুরাতন কালযাত্রা থেকে।

(পত্রপুট, পনেরো)

এই যে বিশ্বময় আলোর মন্ত্র বা অগ্নিমন্ত্র ভারতবর্ষে তাহা প্রথম উদ্গীত হইয়াছিল বৈদিক ঋষি-কবির কণ্ঠে। অথর্ববেদের পৃথিবী-সূক্তে বলা হইয়াছে—

অগ্নির্ভূম্যামোষধীষ্বগ্নিমাপো বিভ্রত্যগ্নিরশ্মসু।
অগ্নিরন্তঃ পুরুষেষু গোষ্বশ্বেষ্বগ্নয়ঃ॥
অগ্নির্দিব আ তপত্যগ্নের্দেবস্যোর্বন্তরিক্ষম্।
অগ্নিং মর্তাস ইন্ধতে হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্।
অগ্নিবাসাঃ পৃথিব্যসিতজ্ঞূস্ত্বিষীমন্তং সংশিতং মা কৃণোতু॥
(১২।১।১৯-২১)

"অগ্নি ভূমিতে, ওষধিতে,—জল সমূহ অগ্নিকেই বহন করে,—পাষাণের মধ্যেও অগ্নি; পুরুষগণের মধ্যে অগ্নি—অগ্নি গাভীর মধ্যে—অশ্বের মধ্যে। দ্যুলোক হইতে অগ্নি তাপ দান করে, অগ্নিদেবেরই এই বিশাল অন্তরিক্ষ; হব্যবাহ এবং ঘৃতপ্রিয় অগ্নিকে মর্ত্যবাসীরা ইন্ধনের দ্বারা প্রজ্বলিত করে। অগ্নিবাসা অসিতজাণু পৃথিবী আমাকে ভাস্বর এবং তীক্ষ্ণ করিয়া তুলুক।"[১]

(১) তুলনীয়—আত্মাঽসি বায়োর্জ্বলন শরীরমসি বীরুধাম্।
যোনিরাপশ্চ তে শুক্র যোনিস্তমসি চাম্ভসঃ॥
... ...
সর্বমগ্নে ত্বমেবৈকস্ত্বয়ি সর্বমিদং জগৎ।
ত্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনং ত্বং বিভর্ষি চ॥
মহাভারত—পি. পি. এস্. শাস্ত্রীর সংস্করণ,
আদিকাণ্ড—(২১৭।২৫, ৩০)

হে জ্বলন, তুমি বায়ুর আত্মা, লতাসমূহের শরীর; তোমা হইতেই জলের উৎপত্তি, তোমারই শুক্র, আকাশের তুমিই উৎপত্তিস্থল।·····তুমি এক হইলেও সকলই তুমি, এই নিখিল জগৎ তোমাতেই (বিধৃত) আছে। তুমিই ভূতগণকে ধারণ কর, তুমিই সকল ভুবনকে ভরণ কর।

আলোচনার সমাপ্তিতেও কবির গান মনে পড়িতেছে, —

'পূর্বাচলের পানে তাকাই
অস্তাচলের ধারে আসি'।

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির পূর্বাচলে তাকাই,—কতদূরে রহিয়াছেন সেই সবিতার জ্যোতির ধ্যানকারী, জননী পৃথিবীর স্তবগানকারী প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ—তারপরে সেই উপনিষদের দ্যুলোক-ভূলোক ব্যাপিয়া একের বাণী—তারপরে রামায়ণ-মহাভারতের যুগের বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত ঐকাত্ম্যযোগের সেই সরল বিশ্বাস, আর তাহার সহজ প্রকাশ—শৈব কালিদাসের মণ্ডনশ্রী-সুশোভিত সৃষ্টি-স্রষ্টা পার্বতী-পরমেশ্বরের মিলন—তাহার পরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত কবিমনের ভিতর দিয়া সেই ভারতীয় মনের অদ্বয়-বিশ্বাসের প্রকাশ,—তাহার বহু পরে বহু শতাব্দীর অতীত-প্রবাহের স্রোতমুখে বিরাট কবিদৃষ্টি লইয়া রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব!

কবির কণ্ঠে পুরাতন গানে কি বিচিত্র সুর—নিত্য নূতন কত তাহাতে ঝঙ্কার। এইখানেই শেষ নহে—'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে' এই ঝঙ্কারই নিজেকে রূপায়িত করিবে নব নব পরিণতিতে। আমরা যদি এই যোগকে স্বীকার করি, সমগ্র দেহ-প্রাণ দিয়া বরণ করি,—আমরা বলিষ্ঠ হইব। বড় দানকে গ্রহণ করিতে চাই বড় অধিকার—নিজেদের ক্ষুদ্রতাকে লইয়া এই দানের সম্মুখে আমরা যেন বিমূঢ় হইয়া না পড়ি—ইহাকে এড়াইয়া চলিবার দুর্বলতার যেন জয় লাভ না ঘটে; ইহাকে দুই হাতে গ্রহণ করিবার ভিতরে আছে যে বীর্যের পরিচয় তাহাতেই লাভ হইবে আমাদের প্রতিষ্ঠা।

—শেষ—